INTERNATIONAL BESTSELLER

মোসাদ ২

কায়কোবাদ মিলন

মুসলিম দেশগুলোই কি ইহুদীদের টার্গেট?



মোসাদ ২

মোসাদ ২

মাইকেল বার-জোহর এবং নিসিম মিশাল

অনুবাদ : কায়কোবাদ মিলন



আবিষ্কার

মোসাদ ২

লেখক	❑	মাইকেল বার-জোহর এবং নিসিম মিশাল
অনুবাদ	❑	কায়কোবাদ মিলন
প্রকাশক	❑	এসডি হাসান
প্রকাশনা	❑	আবিষ্কার ২৫৩-২৫৪, কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫
প্রকাশকাল	❑	কার্তিক, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ, নভেম্বর, ২০১৭
প্রচ্ছদ	❑	এ.এম. শিপন
সত্ত্ব	❑	আবিষ্কার
ছাপাকল	❑	কেয়ার প্রিন্টার্স, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫
মূল্য	❑	৩৯০ টাকা

Mossad 2

Writer	Michael Bar-Zohar and Nissim Mishal
Translat	Kaikobad Milan
Publisher	ABISHKAR CES Complex, Kantabon, Dhaka-1205 Phone : +88-02-9674099, 01762562090 E-mail : abishkarpublicationdhaka@gmail.com
Published	November 2017
Cover	A.M. Shipon
Price	Tk 390 Or US $ 20.00 Printed in Bangladesh
ISBN	978-984-92982-1-2

পরিবেশক

রকমারি.কম, ঢাকা ॥ বাতিঘর, চট্টগ্রাম ॥ মুক্তধারা, আমেরিকা
সঙ্গিতা লিমিটেড, যুক্তরাজ্য ॥ এটিএন বুক এন্ড ক্রাফটস্, কানাডা

উৎসর্গ

ইসলামের জন্যে
আত্মোৎসর্গীকৃত
বিশ্বের সকল
শহীদদের

লেখকের অন্যান্য বই

একাত্তরে পরাশক্তির যুদ্ধ
মোসাদ

ভূমিকা

ইহুদিদের ইতিহাস, আরব ভূখণ্ডে ইসরাইল রাষ্ট্র গঠন এবং কার্যকলাপ অন্তহীন জল্পনার বিষয়। ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ কয়েক দশক ধরে বিশ্বজুড়ে পরিচিত ভয়ঙ্কর হিসেবে নাম। বিশ্বের সেরা গোয়েন্দা সংস্থা হিসেবেও এটি বিবেচিত। সেই মোসাদের নেপথ্যের কাহিনী নিয়ে বই লিখেছেন মিশায়েল বার-জোহার এবং নিসিম মিশাল। মোসাদের ষাট বছরের সবচে ভয়ংকর, নিন্দিত, বিতর্কিত ও সংকটাপন্ন মিশনগুলো নিয়ে এই বই। এর প্রতিটি ঘটনাই সত্য ও বাস্তবিক। ইন্টেলিজেন্স যুদ্ধ সম্পর্কে যাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ রয়েছে তাদের কাছে এই বই এক অমূল্য সম্পদ। প্রথমোক্ত লেখক জোহার চারটি ইসরাইল – আরব যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। মিশাল টিভি ব্যক্তিত্ব এবং ইসরাইলের সরকার নিয়ন্ত্রিত টিভির মহাপরিচালক। ২০১০ সালে মোসাদ বইটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন এক নাগাড়ে ৭০ সপ্তাহ বইটি ছিল বিশ্বে বেষ্ট সেলার। এরই মাঝে বেশ কয়েকটি ভাষায় মুদ্রিত হয়েছে মোসাদ।

ভারতীয় উপমহাদেশে ইহুদিদের উপস্থিতির কথা জানা যায় আড়াই হাজার বছর আগে। তারা এখনো নামে বেনামে ব্যবসাসহ নানা পেশায় কাজ করছে। বাংলাদেশে কোনো ইহুদি পরিবার রয়েছে এমন তথ্য অজানা। ইতিহাস বলে রেডিও পাকিস্তান ও পাকিস্তান টেলিভিশনে ইংরেজি সংবাদ পাঠক Mordechai Cohen ছিলেন ইহুদি। তিনি থাকতেন রাজশাহীতে। ১৯৬০ সালে তিনি ভারতে চলে যান।

ভারতের ট্রেনে মোসাদ বইয়ের কয়েকটি পাতা পড়ার পর মনে হল বাংলা ভাষার, বিশেষ করে বাংলাদেশের পাঠকের বইটি পড়া উচিত। তাই এই প্রয়াস। আমাদের দেশে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীতে কয়েক লক্ষ সদস্য রয়েছেন। সত্যিকার গোয়েন্দা কাহিনী ও ইতিহাসের উপাদান জানার আগ্রহ কোটি লোকের। তারা এই বইটি পড়তে যে আগ্রহী হবেন তা হলফ করেই বলা যায়। তাছাড়া কূটনৈতিক এবং গোয়েন্দা পেশা কত ঝুঁকিপূর্ণ তাও উঠে এসেছে বইয়ের পাতায় পাতায়। সত্যিই মানুষ সন্ধানী, সত্যিই মানুষ অ্যাড্‌ভেন্‌চার প্রিয়। আবিষ্কার থেকে প্রকাশিত আমার লেখা একাত্তরে পরাশক্তির যুদ্ধ বইটি খুব নাম করেছিল। সেই বইয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ- কালের বিভিন্ন দেশের মোস্ট সিকরেট চিঠিগুলা ফাঁস করেছিলাম। আর মোসাদ আরও অনন্য সাধারণ। এমন বই বাংলায় সত্যিই আর হয়নি।

১৯৪৮ সালে প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের নিজস্ব বাসভূমি ইসরায়েল রাষ্ট্র স্থাপনের পর থেকে সারা বিশ্বে এদের ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থ ও ব্যাংকিং, শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি, প্রচার-মাধ্যম এবং সামরিক গোয়েন্দা ও সন্ত্রাসী তৎপরতা বিস্ময়করভাবে নজরে আসছে। বিশ্বের তাবৎ পরাশক্তির সঙ্গে রয়েছে এদের গোপন আতাত। ইহুদি

ব্যতীত অন্য যে কোনো ধর্মের অনুসারীকেই এরা মনে করে পৌত্তলিক বা বিধর্মী। মুসলমান এবং খ্রিস্টান সম্পর্কে এদের মন্তব্য Gentile, Goi এবং Sheketz। Latin এই শব্দগুলোর অর্থ বিধর্মী, পশুবীর্য ও শুকর। বলতে দ্বিধা নেই যারা এগুলো বলে তাদের আচরণ ও কার্যকলাপ সভ্য সমাজের মানুষের সঙ্গে তুল্য নয়। যে জেরুজালেম বিশ্বের সবচেয়ে বর্ণাঢ্য ও আন্তর্জাতিক নগরিই শুধু ছিলো না যা ছিলো মুসলমান খ্রিস্টান ও ইহুদিদের মহাপবিত্র নগরী সেই নগরি এখন ভয়াবহ আতংকের নগরি। আর এর জন্যে সবচেয়ে দায়ি ইহুদিরা। তবে এ কথাও সত্য ভূমধ্যসাগর ও জর্ডান নদীর তীরে সভ্যতা ইতিহাস এবং তিন হাজার বছরের মহাকাব্যিক জীবনধারায় মিশে আছে বিশ্বের শ্রেষ্ট ধর্ম ও জাতি সমূহের বিজয় গৌরবের কাহিনী।

এই বই অনুবাদ করতে পারার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই পীরসাহেব আলহাজ্ব মঞ্জিল মোরশেদ, মিডিয়া জগতের শীর্ষ নেতা ও সম্পাদক রিয়াজ উদ্দিন আহমদ, ইত্তেফাকের সাবেক জেনারেল ম্যানেজার ও পূর্বানী সম্পাদক খোন্দকার শাহাদাৎ হোসেন, জাতীয় মহিলা সংস্থার সাবেক চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী) মাসুদা হোসেন, চ্যানেল আই এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর, মামা ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ হাবিবুর রহমান, বন্ধুবর অধ্যক্ষ আবদুস সালাম হাওলাদার, অধ্যাপিকা শিরীন আফরোজ, আন্টি মমতাজ বেগম রোজী, সিনিয়র অ্যাডভোকেট আশিক আল জলিল, মোশতাক মোরশেদকে। বইয়ের ব্যাপারে তারা উৎসাহ দিয়েছিলেন। আমার অসুস্থ আম্মা আলহাজ্ব সাজেদা রহমান, তাঁকে আমরা বলি 'বরিশালের বেগম রোকেয়া'। বর্তমানে তিনি খুবই অসুস্থ। তাঁর জন্য দোয়া চাই। আমার স্ত্রী অধ্যাপিকা দিলরুবা জলিল দিনকে দিন আমাকে তার গুণমুগ্ধ করে তুলছেন। এক বিচারপতির মেয়ে, আরেক বিচারপতির বড় বোন এই ভদ্রমহিলা অনেকের কাছেই অনুকরণীয় এবং দশভূজা। তাদেরও ঐকান্তিক সহযোগিতা ছাড়া এতেঠ অল্প সময়ে অনুবাদের কাজ সম্ভব হতো না।

ইত্তেফাকের আমার দীর্ঘদিনের সহকর্মী ফজলুল হক, সাংবাদিক-সম্পাদক শাহজাহান আলি ও ওয়াহিদ মুরাদ জাতীয় প্রেসক্লাব লাইব্রেরিয়ান ইমরান খান, সাহিদউল্লাহ, সোনারগাঁওয়ের সাংবাদিক কাজী ফরিদ, অনুজ গীতিকার জুলফিকার চমন ও জিএম সরোয়ার মোহনকে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। পুত্র ইভান ও সুমাইয়াকে ধন্যবাদ পরামর্শের জন্যে।
হাজারও সালাম হাক্কোননূরে।

বি. দ্র.: ইসরাইল, জেরুজালেম ও ইহুদি সম্পর্কে কিছু তথ্য 'টিকা' অনুচ্ছেদ সংযুক্তি পাঠকের ভালো লাগবে বলেই আমার বিশ্বাস।

কায়কোবাদ মিলন
kaikobadmilan1955@gmail.com

সূচিপাতা

টিকা

আজ আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধবে

১৯৭৩ সালের ৫ অক্টোবর গভীর রাতে মোসাদ এজেন্ট যার কোড নাম ডুবি মিসরের রাজধানী কায়রো থেকে একটি ফোন পায়। সিনিয়র কেস অফিসার ডুবি লন্ডনের সেফ অফিসে বসে তার গোয়েন্দা কার্যক্রম চালায়। এই ফোন কলটি ছিল ভূমিকম্পের ন্যায় মহাআতঙ্ক জাগানোর মতো। ফোনের অপর প্রান্তে যিনি ছিলেন তিনি মোসাদের সবচেয়ে দামী গোপন এজেন্ট। তিনি যে সত্যি সত্যি মোসাদের গোয়েন্দা এই কথাটা ইসরাইল সরকারেরও খুব কম লোক জানত। মোসাদের যারা তাকে জানত তারা এঞ্জেল নামে চিনত। ইতোপূর্বে কোনো কোনো রিপোর্টে তার নাম 'রাশাশ' অথবা 'হোটেল' বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

ফোনে এঞ্জেল মাত্র কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু একটি শব্দ শুনে মোসাদ গোয়েন্দা ডুবি এবং তার চেয়ার কেঁপে উঠেছিল। শব্দটি হল 'কেমিক্যালস'। ডুবি তাৎক্ষণাৎ অবিলম্বে ইসরাইলের মোসাদ সদর দফতরে ফোন করে কোড ওয়ার্ডটি জানাল। এ সময় মোসাদের প্রধান ছিলেন যভি জামির। তার কানেও কথাটি গেল। যভি জামির সঙ্গে সঙ্গে তার স্টাফ অফিসার ফ্রেডিয়ে ইনিকে বললেন, আমি এখুনি লন্ডন যাচ্ছি। রাত তখনো শেষ হয়নি।

যভি জামির জানতেন, এখন আর এক মুহূর্ত সময় নষ্টের অবকাশ নেই। 'কেমিক্যালস' কোড শব্দটি একটি ভয়ঙ্কর অশুভ বার্তা। আর এর ভাবার্থ হল ইসরাইলের ওপর অবিলম্বে আক্রমণ করা হচ্ছে।

১৯৬৭ সালের ছয়দিনের যুদ্ধের পর থেকেই ইসরাইল প্রতিবেশী আরব দেশগুলো থেকে যে কোনো মুহূর্তে যুদ্ধের আশংকা করে আসছিল। ঐ ছয়দিনের যুদ্ধে ইসরাইল বেশ কয়েকটি আরব দেশের ভূখণ্ড দখল করেছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূখণ্ড হল, মিসরের সিনাই বদ্বীপ এবং গাজা প্রণালী, সিরিয়র গোলান হাইটস, জর্ডানের পশ্চিম তীর ও জেরুজালেম। ইসরাইলের সামরিক বাহিনী বর্তমানে গোলান হাইটসে মোতায়েন রয়েছে। এটি সুয়েজ খালের পূর্বাঞ্চলীয় কূল। আরব দেশগুলো প্রায়শই এসব অঞ্চলে ইসরাইলের সঙ্গে ইঁদুর দৌড়ে শামিল হয়। তারা প্রতিশোধ নেয়ার কথা সব সময় বলে থাকে। মাঝে-মধ্যে সামরিক শক্তিও বৃদ্ধি করে থাকে। ইসরাইল অবশ্য সুবিধেজনক অবস্থায় রয়েছে। অধিকৃত এসব অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসরাইলি প্রস্তাব আরব দেশগুলো সব সময়ই প্রত্যাখ্যান করে আসছে। ইতিমধ্যে মিসরের অগ্নিশর্মা

প্রেসিডেন্ট নাসের ইন্তেকাল করেছেন। তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন আনোয়ার সাদাত। ইসরাইলি পর্যবেক্ষকদের দীর্ঘ দিনের প্রাপ্ত তথ্যের মতে, আনোয়ার সাদাত ক্যারিশমেটিক নেতা নন, দূর্বল, অস্থিরচিত্ত ও তরলমতি। মিসরের জনগণের পক্ষে একটি যুদ্ধ পরিচালনায় তিনি সমর্থ হবেন না।

এদিকে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী এশকলের মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন ক্যারিশমেটিক নেতা মিসেস গোল্ডা মেয়ার। তিনি একাধারে টাফ এবং ক্ষমতাধর প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর সহকারী হিসেবে রয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোশে দায়ান। তাকে বিশ্বখ্যাত প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে অভিহিত করা হয়। সেক্ষেত্রে সহজেই অনুমেয় ইসরাইলের নিরাপত্তা এখন সবচে সুরক্ষিত।

সবচে' দামী গোয়েন্দা এঞ্জেলস– এর ফোনের কিছুদিন আগে জর্ডানের বাদশাহ হোসেইন অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে ইসরাইল সফর করেন। এবং গোল্ডা মেয়ারকে সতর্ক করে যান। তার সতর্কবার্তা ছিল মিসর ও সিরিয় ইসরাইলকে আক্রমণের পরিকল্পনা করছে। হোসেইন ইসরাইলের গোপন মিত্রে পরিণত হয়েছিলেন এবং গোল্ডা মেয়ারের দূতের সঙ্গে ব্যাপকভিত্তিক সমঝোতামূলক আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু গোল্ডা মেয়ার বাদশাহ হোসেইনের সতর্কবার্তায় তেমন মনোযোগ দিতে সমর্থ হননি। গোল্ডা মেয়ার আসন্ন নির্বাচন নিয়েই সে সময় অতিশয় ব্যস্ত ছিলেন। তার লেবার পার্টিকে জিতিয়ে আনাই তার ধ্যান-জ্ঞানে পরিণত হয়েছিল এবং তার নির্বাচনী প্রচারণার প্রধানতম শ্লোগানই ছিল 'অল ইজ কোয়াইট অন দ্য সুয়েজ ক্যানেল'।

ইয়োম কিপ্পুর যুদ্ধ শুরুর ১৮ ঘন্টা আগে অবশ্য বলা সম্ভব ছিল না সুয়েজ ক্যানেলের কোনো কিছুই আর শান্ত নয়। মোসাদ-প্রধান যভি জামির এঞ্জেল-এর সতর্ক বার্তাকে খুবই সিরিয়সলি নিয়েছিলেন। কেননা যে গোপন বার্তাটি তিনি পেয়েছেন, এর চেয়ে ভয়ংকর কোনো বার্তা আর তার দেশের জন্য হতে পারে না। ফলশ্রুতিতে মোসাদ-প্রধান তার লন্ডনের এজেন্টের সঙ্গে কথা বলাকে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় মনে করলেন। আর করলেনও তাই।

প্রথম ফ্লাইটেই মোসাদ-প্রধান জামির লন্ডনে পৌঁছলেন। ব্রিটিশ রাজধানীতে ডরচেস্টার হোটেলের কাছেই একটি ভবনের ছয়তলায় মোসাদের সুরক্ষিত এবং সু-সজ্জিত টিপটপ একটি সেফ হাউসে তিনি উঠলেন। মোসাদ গোয়েন্দারা এই ভবনে তাদেয় এ্যাপার্টমেন্টটির নিরাপত্তায় সব সময়ই বিশেষ ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। এই এ্যাপার্টমেন্টটি নেয়াই হয়েছে শুধুমাত্র এ্যাঞ্জেল-এর সঙ্গে বৈঠক করার জন্য। এ্যাপার্টমেন্টটির ভেতরের আয়োজনও তেমনি সুরক্ষিত।

মোসাদ-প্রধান জভি জামির এই ভবনে আসামাত্র দশজন মোসাদ গোয়েন্দা বিচ্ছিন্নভাবে নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করল। কায়রো মোসাদ-প্রধানকে অপহরণ কিম্বা আহত করতে পারে এই আশংকায় বাড়তি নিরাপত্তা নেয়া হল। আর এর দায়িত্বে ছিলেন প্রবাদ প্রতিম গোয়েন্দা জভি মালকিন। আর্জেন্টিনায় আইচম্যানকে গ্রেফতারে মালকিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।

মোসাদ-প্রধান জামিরের সারাটা দিনই অস্থিরতার মধ্যে কাটল কখন আসবে বিখ্যাত গোয়েন্দা এঞ্জেল। এঞ্জেল অবশ্য কায়রো থেকে রওয়ানা দিয়ে রোমে যাত্রা বিরতি করেন। ফলে লন্ডনে আসতে তার বেশ দেরি হয়ে যায়। দুই দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা অবশেষে আলোচ্য সেফ হাউজে পরদিন রাত ১১টায় তাদের বৈঠক শুরু করেন।

এদিকে ইয়োম কাপ্পুর হল ইসরাইলিদের জন্য একটি পবিত্র দিন। এদিন ইহুদিরা প্রার্থনা ও প্রায়শ্চিত্ত করে এবং উপবাস করে তাদের দিন কাটায়। এদিন ছুটির দিন। ফলে কেউ কোনো কাজ করবে না। এমনকী রেডিও টেলিভিশনও বন্ধ। রাস্তায় বন্ধ গাড়ি চলাচলও। ইহুদি এই রাষ্ট্রের সীমান্তেও অল্পসংখ্যক সৈন্য প্রহারারত।

মোসাদ-প্রধান জামির ও এঞ্জেলের মধ্যে দু'ঘণ্টা ধরে বৈঠক হয়। ডুবি বৈঠকে আলোচিত প্রতিটি শব্দের নোট নেন।

রাত একটায় বৈঠক শেষে ডুবি এঞ্জেলকে পৃথক আরেকটি কক্ষে নিয়ে যান। সেখানে তাকে প্রথাগত নিয়মানুযায়ী এক লক্ষ মার্কিন ডলার দেয়া হয়। জামির দ্রুততার সঙ্গে একটি টেলিগ্রাম কম্পোজ করে ইসরাইলে পাঠালেন। কিন্তু এই মূল্যবান বার্তাটি দূতাবাসের এনকোডারের মাধ্যমে পাঠাতে তারা ব্যর্থ হন। জামির চটে যাচ্ছিলেন এবং তার স্টাফ অফিসার এইনির বাড়িতে ফোন করতে বাধ্য হন। কিন্তু এইনি ফোন ধরছিল না।

কেউ ফোন না ধরার কথা অপারেটর তাকে জানাল। সে আরও বলল, আজ হয়তো ইসরাইলে বড় কোনো ঘটনায় ছুটি দেয়া হয়েছে। জামির অপারেটরকে ফোন করেই যেতে বললেন।

অবশেষে জামির তার স্টাফ অফিসারকে ফোনে পেলেন। এইনি আধা ঘুমন্ত অবস্থায় ফোন ধরল। জামির তাকে বললেন, আগে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে হাত-মুখ ধোও। তারপর কাগজ-কলম নাও। ফ্রেডি এইনি তার বসের নির্দেশ মতো ডিকটেশন নিতে প্রস্তুত। জামির সাংকেতিক ভাষায় যে বার্তাটি দিলেন তা

এরকমঃ আজ দিনের শেষে কোম্পানি চুক্তি সই করবে।
অতএব মোসাদ-প্রধান জামির তার স্টাফ অফিসারকে কাপড়-চোপড় পরে রেডী হয়ে সদর দফতরে গিয়ে সবাইকে ঘুম থেকে জাগানোর নির্দেশ দিলেন। ফ্রেডি এইনি জামিরের নির্দেশ মোতাবেক ইসরাইলের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতাদের বৈঠকে ডাকলেন। নেতাদের কাছে জামিরের এই বার্তার মর্মকথা হল, আজ ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হবে।

মোসাদ-প্রধান জামিরের টেলিগ্রাম অনুযায়ী মিসর ও সিরিয় আজ অপরাহ্ন ইসরাইল আক্রমণ করতে যাচ্ছে। এই পরিকল্পনা চূড়ান্ত।

কেননা তারা জানে আজ ইসরাইলে ছুটি। ফলে সন্ধ্যার আগেই তারা সুয়েজ ক্যানেলের ইসরাইল প্রান্তে পৌঁছে যেতে পারবে। এঞ্জেলের ভাষায় মিসরের প্রেসিডেন্ট সাদাতের পক্ষে অপেক্ষা সম্ভব নয়। কেননা তিনি অন্য আরব রাষ্ট্রগুলোকে এরকমই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ফলে সাদাতের পক্ষে আর পেছানোর সম্ভাবনা নেই। অবশ্য সাদাতের মধ্যে দ্বিধা কাজ করলেও ইসরাইল আক্রমণের সম্ভাবনা ৯৯.৯ ভাগ। কেননা তারা যুদ্ধে জিতবে বলে বিশ্বাস করে। আর রাশিয়া এই অভিযানে অংশ নেবে না।

মোসাদ-প্রধানের এই নাটকীয় বার্তা ফেসভ্যালু হিসেবে ইসরাইলের সব নেতারা মেনে নিয়েছে এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই। ইসরাইলের আরেকটি গোয়েন্দা সংস্থা 'আমান' প্রধান জেনারেল এলি জেইরা নিশ্চিত ছিলেন, যুদ্ধের মতো কোনো ঘটনা ঘটবে না। সুদর্শন, আত্মবিশ্বাসী এই জেনারেল অবশ্য বিভিন্ন গোয়েন্দাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টগুলো দিল। সেসব বার্তায় ইসরাইলের বিরুদ্ধে যেকোন সময়ই যুদ্ধ শুরুর আশংকা ছিল। জেনারেল এলি জেইরার বিশ্বাস, সুয়েজ ক্যানেলের আফ্রিকার অংশে মিসরীয় সৈন্যদের ব্যাপক সমাবেশ একটা কৌশলমাত্র।

মোসাদ-প্রধান জামির এবং আমান প্রধান জোনারেল জেইরা মুখোমুখি কথাও বলেন। এখানে প্রসঙ্গ উঠে, ৮৪৮ নং ইউনিটের একটি গোপন বার্তা নিয়ে। এই ইউনিটটি এক বার্তায় বলে, সিরিয় ও মিসরে নিযুক্ত রুশ সামরিক উপদেষ্টাদের পরিবারগুলো জরুরি ভিত্তিতে এই দুই দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আর এই চলে যাওয়া যুদ্ধ শুরুর ইংগিত বহন করে। মোসাদ-প্রধান জামির আমান প্রধানকে এই বার্তার মর্মকথা জিজ্ঞেস করেন। আমান প্রধান জেনারেল এলি বলেন, এর কোনো ব্যাখ্যা তার কাছে নেই। তবে বিষয়টি সন্দেহের।

গোয়েন্দা সংস্থা আমান প্রধানসহ প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কর্মকর্তারা উপসংহারে

আসেন যে, দুটি কারণে মিসর ইসরাইল আক্রমণ করতে পারে। তাদের এই ধারণা হওয়ার মূলে যে তত্ত্ব তা হল, যদি মিসর সোভিয়েত ইউনিয়নের ফাইটার জেট বিমান পায় যা ইসরাইলি যুদ্ধবিমানকে প্রতিহত করতে সক্ষম তাহলেই মিসর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে। আরেকটি হল, মিসর যুদ্ধে আসতে রাজি হতে পারে যদি অন্য আরব রাষ্ট্রগুলো ধ্বংসযজ্ঞ ও হত্যালীলায় মিসরের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেয়। উপরোক্ত দুটি শর্ত যতদিন না পূর্ণ হবে ততদিন মিসর ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবে না। আমান প্রধান ও উপরোক্তদের মতে, যুদ্ধে নামা নয়, মিসর ইসরাইলকে ভয় দেখাতে পারে, উস্কানি দিতে পারে, বিপুল সংখ্যক সৈন্য চলাচল করাতে পারে কিন্তু ইসরাইল আক্রমণ করবে না।

সমস্যা হল, মিসরের ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব ১৯৬৭ সালে ভুল বলে প্রতীয়মান হয়। ১৯৬৭ সালে মিসরের সেনাবাহিনীর বিশাল একটা অংশ ইয়েমেনে ঢুকে রাজকীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এক বছর স্থায়ী যুদ্ধ করে। ইসরাইলের নেতারা নিশ্চিত করে আরও বলেন যে, মিসর কোনো প্রকার উস্কানিমূলক আচরণ অথবা আগ্রাসী রণকৌশল তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করবে না। কেননা তাদের সেনাবাহিনীর একটা অংশ ইয়েমেনের জলাশয়ের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। যদিও ১৯৬৭ সালের ১৫ মে মিসরের সেনাবাহিনীর এলিট ইউনিট আকস্মিকভাবে সিনাই অতিক্রম করে ইসরাইলি সীমান্ত পর্যন্ত চলে এসেছিল। এই সময় মিসরের প্রেসিডেন্ট নাসের জাতিসংঘের পর্যবেক্ষকদের বহিষ্কার করেছিলেন এবং লোহিত সাগরের সবগুলো প্রণালীতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ইসরাইলি জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ইসরাইলি নেতাদের সেই ব্যর্থতার কথা স্মরণ করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে ছয় দিনের সেই ত্রুটি বা ব্যর্থতার কথা সবাই ভুলে গেছে।

মিসর কোনো যুক্তিতেই এই দফায় আক্রমণ করতে পারে না এই ধারণা নিয়েই ১৯৭৩ সালের ৬ অক্টোবর খুব সকালে ইসরাইলি মন্ত্রিসভার একটা বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। গোয়েন্দা সংস্থা আমান প্রধান জেনারেল জেইরসহ মন্ত্রিসভার বেশ কয়েকজন সদস্য মিসরের আসন্ন আক্রমণের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন। এবার যেমন স্বনামধন্য গোয়েন্দা এঞ্জেল যুদ্ধের আশংকার কথা বলেছেন, অতীতেও তিনি দু'বার ভুল বার্তা দিয়েছিলেন। তখন তো ইসরাইল আক্রান্ত হয়নি। যেমন এঞ্জেল ১৯৭২ সালের নভেম্বরে এবং ১৯৭১ সালের মে মাসে ইসরাইলের আক্রান্ত হওয়ার বার্তা দিয়েছিলেন। যদিও শেষ মুহূর্তে তিনি তার সতর্ক বার্তা প্রত্যাহার করেছিলেন। কিন্তু ১৯৭১ সালের মে মাসে ইসরাইলের অসংখ্য রিজার্ভ সৈন্যকে জরুরিভাবে বিভিন্ন স্থানে মোতায়েন করা হয়েছিল। আর সেই সময় সৈন্য মোতায়েনসহ অন্যান্য খাতে ইসরাইলের ব্যয়

হয়েছিল সাড়ে চৌত্রিশ মিলিয়ন ডলার।

মন্ত্রিসভার সকালের বৈঠকে সকলেই পরিস্থিতির ভয়াবহতার ব্যাপারে সতর্ক হলেন। তবে, ইসরাইলের রিজার্ভ সৈন্যের একটি অংশকে মোতায়েনের সিদ্ধান্ত হল। মন্ত্রীরা আরও সিদ্ধান্ত নিলেন, মিসর যে বিপুল সংখ্যক সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছে তা প্রতিহত করতে ইসরাইল আগ বাড়িয়ে কিম্বা তা ঠেকাতে কোনো অভিযান চালাবে না।

মোসাদ-প্রধান জামির লন্ডন থেকে ইসরাইলে ফিরে বললেন, যুদ্ধ অত্যাসন্ন। তিনি এঞ্জেলের সতর্কবার্তা অনুযায়ী বললেন যে, সূর্যাস্তের আগেই মিসর ও সিরিয় ইসরাইল আক্রমণ করবে।

বেলা দুইটার দিকে আমান প্রধান জেনারেল জেইরা যুদ্ধ বিষয়ক সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে বললেন, যুদ্ধ বেধে যাওয়ার আশংকা সামান্যই। তিনি কথা বলেই যাচ্ছিলেন এমন সময় এক অধঃস্তন কর্মী এসে তার হাতে একটি চিরকূট দেয়। জেইরা চিরকূটটি পড়লেন। তার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল এবং দ্রুত তিনি রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বিমান আক্রমণের সাইরেন বিলাপের ধ্বনিতে বেজে উঠল। ইয়োম কিপ্পুরের নীরবতা উবে গেল। তারপর শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ।

অন্যরকম যুদ্ধ

যুদ্ধ শেষে গোয়েন্দা সংস্থা আমানের সিনিয়র কর্মকর্তারা গোয়েন্দা এঞ্জেলকে ক্রোধান্বিত স্বরে দোষারোপ করতে লাগল। এঞ্জেল মোসাদ-প্রধান জামিরকে বিভ্রান্ত করেছেন। কেননা যুদ্ধ শুরু হয়েছে দুপুরে অথচ তার রিপোর্ট বলে যুদ্ধ শুরু হবে সন্ধ্যায়। পরে অবশ্য জানা গেছে, শেষ মুহূর্তে মিসর যুদ্ধ শুরুর সময় পরিবর্তন করেছে। মিসর ও সিরিয়র প্রেসিডেন্টের মধ্যকার টেলিফোন কথোপকথনের পর এই সময় পরিবর্তিত হয়। ততক্ষণে এঞ্জেলতো লন্ডনের পথে বিমানে।

আমানের প্রধানরা এঞ্জেলের ভুল বার্তায় বিরক্ত হন। তার পূর্ববর্তী সতর্কবার্তায় আমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলেও প্রতীয়মান হয়। প্রকৃতপক্ষে আমানের শীর্ষ কর্মকর্তারা এঞ্জেলকে কোনো গোয়েন্দা সূত্র বলতে বা ভাবতে নারাজ। তাদের মনোভাব এঞ্জেল হলেন মিসরের প্রেসিডেন্টের অফিসে মোসাদের প্রতিনিধি। তার কাজ হল, সেখানে যা যা ঘটছে তার পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রদান। বিস্তারিত। আমান কর্মকর্তারা বিস্মৃত হয়েছেন যে, সিনিয়র পদ মর্যাদার কারণে এঞ্জেল

শুধুমাত্র একজন গোয়েন্দা নন, তিনি চমৎকার চমৎকার সব রিপোর্ট দিচ্ছেন। তাছাড়া তিনি সব সময় সব খবর জানবেন এমনটিও ভাবা সংগত নয়।

যেদিন যুদ্ধ শুরু হল সেদিনও গোয়েন্দা এঞ্জেল ইসরাইলকে ভালো ভালো গোয়েন্দা তথ্য দিয়ে যেতে লাগলেন। মিসর ইসরাইলের সেনাবাহিনীর ওপর দুটি স্কাড ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছিল। ইসরাইল এর পাল্টা হামলা নিলে পরিস্থিতি অনেক ভয়াবহ হত। কিন্তু গোয়েন্দা এঞ্জেল ইসরাইলকে জানান, মিসর আর হয়তো ইরসাইলের ওপর ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করবে না। একথা শুনে ইসরাইল কিছুটা রাশ টেনে ধরে। এঞ্জেল আরও জানান, মিসর ধীরে ধীরে ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিস্তৃতি ঘটাতে চায় না।

ইয়োম কিপ্পুর যুদ্ধ অক্টোবরের ২৩ তারিখে শেষ হয়। গোলান হাইটে সিরিয় সেনাবাহিনী নাস্তানাবুদ হয়ে পড়ে। ইসরাইলের কামান দামেস্ক থেকে মাত্র ২০ কিলোমিটার দূরে পৌছে গিয়েছিল। দক্ষিণে মিসর পাঁচ মাইলব্যাপী একটা ইসরাইলি প্রণালী দখল করে বটে কিন্তু ইসরাইল মিসর ভূখণ্ডে আক্রমণের এমন একটা পটভূমি তৈরি করে যা কৌশলগত দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এদিকে মিসরের তৃতীয় সেনাবাহিনী পুরোপুরি ইসরাইলি বাহিনী দ্বারা ঘেরাও হয়ে যায়। মিসরের প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেঙে পড়ে এবং মিসরের রাজধানী কায়রো থেকে ইসরাইলি সেনাবাহিনীর দূরত্ব ছিল মাত্র ৬৩ কিলোমিটার। এটিও ছিল ইসরাইলের অনুকূলে এক বিরাট অর্জন। তড়িৎ এই যুদ্ধ জয়ের পরেও বিজয় উৎসব থেকে বিরত থাকে ইসরাইল। কেননা তাদের ২ হাজার ৬৫৬ লোকের প্রাণহানি ঘটেছে। আহত ৭ হাজার ২৫১ জন। একই সাথে ইসরাইলের শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা এই যুদ্ধে ভূলুণ্ঠিত হয়।

যুদ্ধ শেষে ইসরাইল ও মিসরের মধ্যে সমঝোতা বৈঠক শুরু হয়। প্রথমে আটক ব্যক্তিদের বিনিময় এবং দুই জাতির মধ্যে স্থায়ী শান্তির লক্ষ্যে বৈঠক বসে। সিরিয় শান্তি আলোচনায় যোগ দিতে অসম্মতি জানায়।

মোসাদ-প্রধান যভি জামির সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং তার স্থলাভিষিক্ত হন জেনারেল হোকি। জামিরের ব্যাপক প্রশংসা হয়। ইসরাইলের গোয়েন্দা ইতিহাসে জামির একমাত্র ব্যক্তি যিনি সিরিয় ও মিসরের আক্রমণের খবর জেনে ইসরাইলের সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইসরাইলি নেতারা যদি জামিরের রিপোর্টের প্রেক্ষিতে আরও সতর্ক হতেন ও যথাযথ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিতেন, তাহলে যুদ্ধের ফলাফল ইসরাইলের পক্ষে আরও বহুগুণ ভালো হত।

কয়েকজন মন্ত্রী বলেন, ইসরাইল প্রথমে আক্রমণ না করে ভালোই করেছে। ফলে ইসরাইলকে কেউ আর আক্রমণকারী হিসেবে দোষারোপ করছে না।

ইসরাইল প্রথমে আক্রমণের মতলব না করে ভালো করেছে কী না এ প্রশ্নে অনেকে বলেছেন, এটা একটা অদূরদর্শী ভাবনা। ইসরাইল বদনামী না হওয়ার জন্য বসে বসে তামাক খাবে, না তার যথাসাধ্য শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে, না নিজেকে প্রতিহত করবে এনিয়ে বিতর্ক ছিল।

ইসরাইলি ঐতিহাসিক ড. ইউরিবার ইয়োসেক বলেন, স্বনামধন্য গোয়েন্দা এঞ্জেলের সতর্ক বার্তার কারণেই ইসরাইল গোলান হাইটস রক্ষা করতে পেরেছে। এই ঐতিহাসিকের মতে, এঞ্জেলের রিপোর্টের ভিত্তিতে ৬ অক্টোবর জরুরি ভিত্তিতে ট্যাংক বাহিনী অপরাহ্নে গোলানে পৌঁছতে সক্ষম হয় এবং নাকাহ্ সেক্টরে সিরিয়র আগ্রাসন প্রতিহত করতে সমর্থ হয়।

ইয়োম কাপ্পুর যুদ্ধের পর জনগণের চাপের মুখে ইসরাইল সরকার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি আগরানাটের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠনে বাধ্য হয়। এই কমিটির কাছে তদন্তাধীন বিষয় ছিল, যুদ্ধের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে ইসরাইলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিষয়ক প্রক্রিয়ায় কোনো গলদ ছিল কী না। কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অবিলম্বে আমান প্রধান জেনারেল জেইরাসহ বেশ কয়েকজন কর্মকর্তাকে বরখাস্তের আদেশ দেয়া হয়। মোসাদ-প্রধান জামিরের চীফ অব স্টাফ ডেভিডকেও বরখাস্ত করা হয়।

এখন প্রশ্ন হল, কে এই এঞ্জেল? তাকে নিয়ে বই ছাপা হতে লাগল। সারা বছর ধরে পত্র-পত্রিকায় অসংখ্য গল্প, প্রতিবেদন ছাপা হতে লাগল। তার পরিচয় নিয়ে কত প্রশ্ন। তবে একটা বিষয় খুব স্পষ্ট, এঞ্জেল যেই হোন, মিসরের নীতিনির্ধারক মহলের একজন কেউ হবেন তিনি। নিশ্চয়ই মিসরের সামরিক বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডেও তার ব্যাপক প্রভাব। এতদসত্ত্বেও তার প্রকৃত পরিচয় কেউ উদঘাটনে সমর্থ হল না। সাংবাদিক ও যুদ্ধবিশারদরা তাকে নানা কোড নামে অভিহিত করতে লাগল। তার প্রবাদ প্রতিম মেধা ও প্রতিভা নিয়ে কল্পকাহিনীতে ইসরাইল ছেয়ে গেল। গোয়েন্দা বাহিনীর নায়ক বানিয়ে এঞ্জেলকে কেন্দ্র করে বহুল প্রচারিত বেশ কয়েকটি বইও প্রকাশিত হল।

গোয়েন্দা বাহিনী আমান থেকে বরখাস্ত হওয়ার পর জেনারেল জেইরা গভীর হতাশায় নিমজ্জিত হলেন। তিনি যে নির্দোষ তা প্রমাণের জন্য তিনি একটা বই লিখলেন। বইয়ে তিনি নিজে নিজে অনেকগুলো প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন এবং নিজেই তার উত্তর লিপিবদ্ধ করেন। তার প্রথম প্রশ্ন ছিল, কেন তিনি স্বনামধন্য

গোয়েন্দা এঞ্জেলের রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

জেনারেল জেইরা বইয়ে লেখেন, এঞ্জেল একজন ডাবল এজেন্ট। কূটবুদ্ধিসম্পন্ন মিসর সরকার ইসরাইলকে নানা বিষয়ে বিভ্রান্ত করার জন্য তাকে মোসাদ বাহিনীতে কায়দা করে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

কয়েকজন সাংবাদিক জেনারেল জেইরার বক্তব্য প্রসঙ্গে লিখলেন, এঞ্জেল ডাবল এজেন্ট হলেও তার মধ্যে চরম উৎকর্ষতার উপস্থিতি লক্ষণীয়। তিনি দীর্ঘকাল ধরে ইসরাইলকে সত্য ও প্রকৃত গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করে আসছিলেন। আর এসবই তিনি করছিলেন, মোসাদের আস্থাভাজন হওয়ার জন্য। মোসাদ এঞ্জেলকে বিশ্বাস করে সব তথ্যই গ্রহণ করে আসছিল। কিন্তু এমন তথ্যও এঞ্জেল দিতে পারতেন যার ফলে ইসরাইল কোনো একদিন সর্বনাশা পদক্ষেপও নিয়ে ফেলতে পারত। যা হত চরম ধ্বংসাত্মক ইসরাইলের।

প্রশ্ন হল, জেনারেল জেইরা এবং তার অনুগামীরা ইনিয়ে-বিনিয়ে যে আঘাতই করার চেষ্টা করুন না কেন, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এঞ্জেলের তথ্য প্রদান প্রকৃতপক্ষেই নির্ভুল। তাহলে এঞ্জেল মিথ্যাচারটা করলেন কীভাবে!

এঞ্জেলতো সাম্প্রতিক যুদ্ধের ব্যাপারে মোসাদকে উল্টো তথ্য দিতে পারতেন। তিনিই তো কেমিক্যালস শব্দটি উল্লেখ করে ইসরাইলের আক্রান্ত হওয়ার খবর দিয়েছিলেন। এটা কী কোনো ডাবল এজেন্টের কাজ?

কিন্তু জেনারেল জেইরা থেমে থাকলেন না। ১৯৭৪ সালে তিনি যখন তার বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ বের করলেন সেখানে তিনি গোয়েন্দা এজেন্টের নাম-ধাম পরিচয় সব পাবলিকের কাছে প্রকাশ করলেন। অসংখ্য সাক্ষাৎকার এবং বিশিষ্ট টিভি সাংবাদিক মারগ্যালিতকে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারেও জেনারেল জেইরা এঞ্জেলের বিস্তারিত পরিচয় তুলে ধরলেন।

কে এই যুবক?

তার প্রকৃত নাম আশরাফ মারওয়ান। এই নামটা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মিসরে ঝড় বয়ে গেল। শীর্ষ রাজনীতিকরা পর্যন্ত স্তম্ভিত। অনেকেই বললেন, অসম্ভব! আশরাফ মারওয়ান কিছুতেই ইসরাইলের গুপ্তচর হতে পারেন না।

এখন প্রশ্ন হল, কে এই মাস্টার গোয়েন্দা, কে এই আশরাফ মারওয়ান? কি তার পরিচয়? ১৯৬৫ সালে মিসরে সুইট ও লাজুক একটি মেয়ের সঙ্গে সুদর্শন ও হ্যান্ডসাম এক তরুণের পরিচয় হয় হেলিওপোশি টেনিস কোর্টে। মেয়েটির নাম মোনা এবং সে তার পরিবারের তৃতীয় মেয়ে। প্রকৃতপক্ষে মোনা অতবেশী সুন্দরী নয়। তার বোন হুদ হল প্রকৃত সুন্দরী এবং মিশরের গির্জা হাই স্কুলের এ লেভেলের ছাত্রী। তবে মোনাও কিউট, চার্মি এবং তার পিতার প্রিয় সন্তান। এদিকে তরুণটি স্বচ্ছল ও অভিজাত পরিবারের সন্তান। তরুণটি সদ্য গ্রাজুয়েট। বিষয় রসায়ন এবং সামরিক বাহিনীতে যোগদান করেছে। এখন এই তরুণের জন্য মোনা মরীয়া। প্রেমে হাবুডুবু।

এই পরিচয় ও প্রণয়ের সূত্র ধরে মোনা তার পরিবারের সঙ্গে তরুণের পরিচয় করিয়ে দেয়। তরুণের সঙ্গে পরিচয় হয় মোনার বাবার।
আর মোনার বাবা হলেন মিসরের প্রেসিডেন্ট গামাল আবদুল নাসের।

প্রেসিডেন্ট নাসের ঠিক বুঝতে পারছিলেন না যে, তার মেয়ের পছন্দ উপযুক্ত ও যথার্থ হচ্ছে কী না। কিন্তু মোনা কিছুতেই অন্য কাউকে বিয়ে করবে না। অবশেষে প্রেসিডেন্ট নাসের মোনার প্রেমিকের বাবাকে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বললেন। তরুণের বাবা প্রেসিডেন্টেরই গার্ড রেজিমেন্টের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা। দু'জনে আলোচনা করে মোনা ও তার প্রেমিকের বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করলেন। এক বছর পর ১৯৬৬ সালে জুলাইয়ে তাদের বিয়ে হয়।

মোনার তরুণ স্বামীকে রিপাবলিক গার্ডের কেমিক্যাল বিভাগে বদলী করা হয়। ১৯৬৮ সালের শেষার্ধে তাকে প্রেসিডেন্টের বিজ্ঞান বিভাগে বদলী করা হয়।

প্রেসিডেন্ট নাসেরের মেয়ের জামাতার নামই আশরাফ মারওয়ান।

প্রেসিডেন্টের জামাতা আশরাফ মারওয়ান তার নতুন কর্মস্থলের ব্যাপারে সন্তুষ্ট ছিলেন না। আশরাফ মারওয়ান উচ্চ শিক্ষার জন্য লন্ডনে যেতে চেয়ে তার শ্বশুরকে জানাল। শ্বশুর প্রেসিডেন্ট তা অনুমোদন করেন। লন্ডনে অবস্থিত মিসরীয় দূতাবাসের তত্ত্বাবধানে একাই লন্ডনে সেটেল্ করেন আশরাফ মারওয়ান।

আশরাফ মারওয়ানের ব্যাপারে দূতাবাসের নজরদারি কঠোর ছিল না। আশরাফ মারওয়ান অ্যাড্‌ভেন্‌চারপ্রিয় পার্টি টার্টি খুব পছন্দ করেন। আর ষাটের দশকে যার যা চাই তা সরবরাহে লন্ডন ছিল সিদ্ধহস্ত। রাতভর পার্টিতে প্রচুর খরচ হয় মারওয়ানের। এই বাড়তি ব্যয় সামাল দিতে নতুন একটা আয়ের সংস্থান হয়ে গেল আশরাফ মারওয়ানের।

এ রকম একজন মহিলার নাম সাওদা। কুয়েতী শেখ আবদুল্লাহ মুবারক আল সাবাহ্ তার স্বামী। আশরাফ সাওদাকে মন্ত্রমুগ্ধ করলে ঐ মহিলা দুই হাতে তাকে টাকা দিকে লাগলেন। কিন্তু এই আয়োজন বেশি দিন চলল না। তাদের ভালোবাসা ও সম্পর্কের কথা মিসরের প্রেসিডেন্টের গোচরীভূত হলে তিনি তার মেয়ের জামাতাকে দেশে ফিরিয়ে আনলেন। মিসরের প্রেসিডেন্ট নাসের তার এই ব্যভিচারী জামাতাকে তালাক দিতে মেয়ে মোনাকে নির্দেশ দিলে মোনা তাতে অস্বীকৃতি জানালেন। নাসের অবশেষে জামাতাকে মিসরেই রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন। জামাতা আশরাফ মারওয়ানকে শুধুমাত্র তার কাগজপত্র প্রফেসরকে দেয়ার জন্য লন্ডনে যেতে দিতে নাসের রাজি হন। সাওদ আল সাবাহ্'র কাছ থেকে নেয়া সব টাকা-পয়সাও আশরাফ মারওয়ান ফেরত দেন। নাসেরের অফিসেই আশরাফ মারওয়ানের আবার চাকরি হয়। এখানে অবশ্য তার বড় কোনো দায়িত্ব ছিল না।

১৯৬৯ সালে আশরাফ মারওয়ান একটি লেখা জমা দিতে আবার লণ্ডনে যান। কিন্তু এই দফায় তিনি তার শ্বশুরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা শুরু করেন। শ্বশুর প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে অমর্যাদাকর আচরণ তাকে হতাশ ও বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। তিনি ইসরাইলি দূতাবাসে ফোন করে মিলিটারী এটাচীর সঙ্গে কথা বলতে চান। এক কর্মকর্তা তার ফোন ধরলে আশরাফ মারওয়ান তাকে তার প্রকৃতই নামটাই বলেন। ইসরাইলের পক্ষে তিনি কাজ করতে চান বলেও জানান। ইসরাইল দূতাবাস থেকে তাকে জানান হয়, সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করা হবে। প্রকৃতপক্ষে ইসরাইলি দূতাবাসের ঐ কর্মকর্তা বিষয়টি সিরিয়সলি নেননি এবং ঐ কর্মকর্তা দফতরকে তিনি কিছু জানাননি। আশরাফ মারওয়ান আবার যে একই বিষয়ে ফোন করেন তাও কেউ ধরেনি। বিষয়টি কীভাবে যেন মোসাদের লোকজন জেনে ফেলে। মোসাদের ইউরোপীয় বিভাগের প্রধান শমুয়েল গোরেনের সঙ্গে মারওয়ানের ফোনে কথা হয়। গোরেন জানতেন মারওয়ান কে, জানতেন তার গুরুত্বপূর্ণ পজিশনের কথা। গোরেন মারওয়ানকে দূতাবাসে আর ফোন করতে নিষেধ করেন। গোরেন তালিকাহীন একটি নম্বরে আশরাফ মারওয়ানকে ফোন করতে বলেন এবং তার

কয়েকজন সহকর্মীকে বিষয়টি জানিয়ে রাখেন।

গোরেনের টপসিক্রেট রিপোর্টটি মোসাদ-প্রধান জামির এবং গোয়েন্দা নিয়োগ সংস্থার প্রধান রেহাভিয়া ভার্দির কাছে গিয়ে পৌঁছে। তারা মারওয়ানের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে একটা বিশেষ টিম গঠন করেন। তবে সহজেই অনুমেয় যে, শত্রু দেশের শীর্ষ পর্যায়ের কেউ যখন নিজের থেকে গোয়েন্দা হিসেবে নিয়োগ পেতে আগ্রহ দেখায় তাকে নিতে আপত্তি কোথায়। তবে বিষয়টি সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। তাছাড়া এই পর্যায়ের লোকেরা ডাবল এজেন্টও হয়ে থাকে। দেখা গেল মিসরই প্রলোভন দেখিয়ে তাকে প্ররোচিত করেছে।

আবার এর উল্টো চিত্রও রয়েছে। শত্রু দেশের সংক্ষুব্ধ কেউ এজেন্ট হতে আগ্রহী হতেই পারে। তবে এই পর্যায়ের লোকদের হাতে অনেক গোপন ও স্পর্শকাতর তথ্যাদি থাকে যা অনেকের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। আর সারা বিশ্বের গোয়েন্দা বিভাগের লোকদের কাছেই এ ধরনের এজেন্ট সর্বাধিক কাঙ্ক্ষিত।

পাশাপাশি, ভার্দির লোকেরা জেনে গেছে আশরাফ মারওয়ান কে। প্রথমত তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী, টাকাটা খুব ভালো করে চেনেন এবং ভালোবাসেন। একই সঙ্গে সবরকম আনন্দময় জীবনই তাকে ব্যাপকভাবে টানে। ফলে মোসাদ তাকে গোয়েন্দা হিসেবে তালিকাভুক্ত করতে পেরে যারপরনাই খুশী।

ইসরাইল থেকে লন্ডনে উড়ে এসে গোরেন মারওয়ানকে তার সঙ্গে সাক্ষাতের আহ্বান জানান। ধীমতি মারওয়ান চমৎকার পোশাকাদি পরে গোরেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি প্রকাশ্যে গোরেনকে বলেন যে, ১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধে ইসরাইলের কাছে মিসরের হেরে যাওয়াটা তার ভালো লাগেনি। এবার তিনি বিজয়ীদের দলে যোগ দিতে আগ্রহী। যাহোক, এই আদর্শিক উদ্দেশ্যের পাশাপাশি আশরাফ মারওয়ান প্রতি মিটিংয়ের জন্য এক লক্ষ ডলার দাবি করলেন। এই রকম সভায় আশরাফ মারওয়ান মোসাদকে একটি করে রিপোর্ট দেবেন।

বিশাল অংকের টাকার ব্যাপারটি নিয়ে গোরেন দ্বিধান্বিত ছিলেন। কেননা মোসাদ এতেঠ বেশি পরিমাণ টাকা ইতিপূর্বে আর কোনো গোয়েন্দাকে দেয়নি। কিন্তু মারওয়ানের কথা ও কাজের একটা বাস্তব পরীক্ষা নেয়া গোরেনের কাছে জরুরি। মারওয়ানকে গোয়েন্দা তথ্যের কিছু নমুনা দিতে বললেন গোরেন। যাহোক, অবশেষে মারওয়ান ইসরাইলি গোয়েন্দা হলেন। মিসরের দৃষ্টিভঙ্গিতে এটা রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং শত্রু দেশের গোয়েন্দা। আশরাফ মারওয়ানের রিপোর্ট

দেখে মোসাদের খুশীর সীমা রইল না। ১৯৭০ সালের ২২ জানুয়ারি মিসরের প্রেসিডেন্ট নাসেরের সঙ্গে সাক্ষাতে সোভিয়েত নেতাদের যে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয় তা সবিস্তার বিবরণ আশরাফ মারওয়ান ইসরাইলিদের হাতে তুলে দেন। ঐ বৈঠকে নাসের সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে আধুনিক ও দূরপাল্লার জেট বিমান চান। কেননা এই বিমান হাতে পেলে ইসরাইলের অনেক ভেতরে ঢুকে বোমা ফেলা সম্ভব হবে।

এই গোপন রিপোর্ট ইসরাইলের যেসব নেতা দেখলেন তারা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এতো গোপনীয় প্রমাণাদি অতীতে তারা কখনো দেখেনি। আর এ সব তথ্যের সত্যাসত্য নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এখন মোসাদের কর্তাব্যক্তিরা নিশ্চিত হলেন যে, তাদের হাতে অগনিত গোপন তথ্যাদি বিদ্যমান। মোসাদ ডুবিকে আশরাফ মারওয়ানের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের জন্য লন্ডনে নিয়োগ দিল। আশরাফ মারওয়ান নাম বদলে হয়ে গেলো এঞ্জেলা। এঞ্জেলের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য মোসাদের পক্ষ থেকে লন্ডনে অফিস ভাড়া করা হল। সেই অফিস অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজানো হল। লন্ডনের এই অফিসকে বেশ কিছু টাকা দিয়ে রাখা হল এই তারকা গোয়েন্দাদের কখন কী প্রয়োজন হয় তার জন্যে।

সিদ্ধান্ত হল, তারকা গোয়েন্দা এঞ্জেল তার সুবিধামত লন্ডনের অফিসে মিটিং করবেন। মিটিং করার সময় হলে এঞ্জেল তৃতীয় কাউকে ফোন করবেন। অনেকের মতে, লন্ডনের ইহুদি এক নারী ছিলেন তৃতীয় ব্যক্তি। অতঃপর তা ডুবিকে জানানো হবে। আর এভাবেই মোসাদকে সতর্ক করা হবে। আশরাফ মারওয়ান মোসাদকে অসংখ্য টপসিক্রেট তথ্য ও সামরিক ডকুমেন্ট দিতে লাগলেন। গোয়েন্দা সংস্থা আমানের মিসরীয় আর্মি বিষয়ক কর্মকর্তা কর্নেল মেইর উল্লেখিত গোয়েন্দা তথ্যের সত্যতা স্বীকার করেন। কেননা তিনি বেশ কয়েকটি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। লন্ডনের উল্লেখিত সেফ হাউসে মারওয়ানের সঙ্গে মেইরের সাক্ষাৎও হয়েছে। মেইর বলেছেন, আশরাফ মারওয়ানকে তার অসুখী মানুষ বলে মনে হয়েছে। আশরাফ তার দিকে প্রথম অবজ্ঞাভরে তাকিয়ে ছিলেন। এক পর্যায়ে মারওয়ান মেইরের ব্যাপারে সহনশীল হয়ে উঠেন। কেননা মেইরের পান্ডিত্য তাকে মুগ্ধ করেছিল। মোসাদের কর্মকর্তারা একবার আশরাফ মারওয়ানকে একটি ব্রিফকেস দিতে বলেন মেইরকে। মেইর জানতে চান এর ভেতর কী আছে। তাকে বলা হয় এর মধ্যে বিপুল অংকের টাকা রয়েছে। মোসাদের হিসাব অনুযায়ী আশরাফ মারওয়ান যতদিন তাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সেই সময়ে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইল তাকে ৩০ লক্ষ মার্কিন ডলার দিয়েছে।

১৯৭০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট নাসের মারা গেলে আনোয়ার সাদাত মিসরের প্রেসিডেন্ট হন। প্রফেসর শিমন সামির ইসরাইলের একজন বিশিষ্টতম ব্যক্তি এবং মিসর বিষয়ে অভিজ্ঞ। মোসাদ তার কাছে আনোয়ার সাদাতের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কিছু তথ্য চায়। শিমন সামির আনোয়ার সাদাতকে অতি দুর্বল ও নিস্প্রাণ চরিত্রের একজন মানুষ বলে উল্লেখ করেন। তিনি জোর দিয়ে উল্লেখ করেন যে, আনোয়ার সাদাত খুব বেশি দিন মিসরের সিংহাসনে থাকতে পারবেন না আর পারলেও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বেন। সামিরের মতো মিসরের অনেক লোকই সাদাত সামিরের অনুরূপ মনোভাব পোষণ করত। কিন্তু আশরাফ মারওয়ান নিঃশর্তভাবে আনোয়ার সাদাতকে পৃষ্টপোষকতা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। আশরাফ মারওয়ান তার স্ত্রীর কাছ থেকে প্রয়াত প্রেসিডেন্ট নাসেরের ব্যক্তিগত কেবিনেটগুলোর চাবি নিয়ে নেন। সেখানে যত গোপন ফাইল ও ডকুমেন্ট ছিল তা আনোয়ার সাদাতকে দিয়ে দেন।

১৯৭১ সালের মে মাসে মিসরের কতিপয় রাজনীতিক মস্কোর লাইনে সাদাতের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটানোর পরিকল্পনা করেন। এরা সকলেই মিসরের বিখ্যাত ব্যক্তি। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট আলি সাবরী, সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী মাহমুদ ফাওজি, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুমাসহ বেশ কয়েকজন মন্ত্রী ও এমপি। তাদের পরিকল্পনা ছিল আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সফরকালে সাদাতকে হত্যার। কিন্তু সাদাত ষড়যন্ত্রকারীদের চেয়েও এগিয়ে। তিনি চক্রান্তকারীদের গ্রেফতার করে ফেলেন। এ সময় আশরাফ মারওয়ান সাদাতের পক্ষাবলম্বন করেন। প্রকৃতপক্ষে আরও আগে থেকেই সাদাতের সঙ্গে ছিলেন মারওয়ান।

ফলশ্রুতিতে মিসরের শীর্ষমহলে আশরাফ মারওয়ানের পদ-পদবি ও মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পায়। তিনি প্রেসিডেন্ট সাদাতের তথ্য বিষয়ক প্রেসিডেন্টের সচিব এবং প্রেসিডেন্টের বিশেষ উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পান। সাদাতের সঙ্গে বিভিন্ন আরব দেশ সফরের সুযোগ ঘটে তার। শুধু তাই নয়, শীর্ষ পর্যায়ের রাজনৈতিক বৈঠকগুলোতেও মারওয়ান উপস্থিত ছিলেন।

মারওয়ানের মর্যাদা বৃদ্ধিতে তার প্রেরিত রিপোর্টের গুরুত্ব ইসরাইলের কাছে আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। সাদাত বেশ কয়েকবার সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করেন। ইসরাইলকে আক্রমণ করে কাবু করার জন্য সাদাত সোভিয়েত ব্রেজনেভকে দাবিকৃত অস্ত্রের একটা তালিকা দেন। এ তালিকার মধ্যে ছিল মিগ ২৫ বিমান। আশরাফ মারওয়ান কিনতে চাওয়া অস্ত্রের পুরো তালিকা মোসাদকে সরবরাহ করেন। মোসাদ অতঃপর সাদাত ও ব্রেজনেভের মধ্যকার

বৈঠকের কার্যবিবরণী চান মারওয়ানের কাছে। কয়েকদিনের মধ্যে মারওয়ান তাও ইসরাইলকে সরবরাহ করেন।

মোসাদ-প্রধান যভি জামির মারওয়ানের ব্যাপারে খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে মারওয়ানের সঙ্গে সাক্ষাতও করেন। মারওয়ানের প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট মোসাদ-প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মেয়ারসহ গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী ও গোয়েন্দাদের সরবরাহ করে।

আশরাফ মারওয়ান প্রদত্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট ইসরাইলের বাইরের কয়েকটি দেশের গোয়েন্দা প্রধানের হাতেও পৌঁছে যায়। মারওয়ান ইটালীর গোয়েন্দা বিভাগের হয়েও কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। একটি সূত্র মতে, মারওয়ান ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা এম সিক্সটিনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন। ৫ অক্টোবর যেদিন ইসরাইল আক্রমণের খবর দিতে মারওয়ান লন্ডনে যাচ্ছিলেন মাঝে তিনি রোমে যাত্রাবিরতি করেন। ইটালীর গোয়েন্দাদেরও তিনি ইসরাইল মিসর আসন্ন যুদ্ধের কথা জানিয়ে ছিলেন।

আশরাফ মারওয়ানের একটি রিপোর্ট ইটালী কর্তৃপক্ষের হাতে পৌঁছেছিল। প্রকৃতপক্ষে এটি মোসাদের জন্যই হয়তো তিনি পাঠিয়েছিলেন। ইয়োম কিপ্পুর যুদ্ধের এক মাস আগে লিবিয়া মিসরের কাছে একটা ক্ষেত্রে সহযোগিতা চায়। ফিলিস্তিনীরা লিবিয়ার নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফীর অনুকূলে ইআই আল বিমান বন্দর থেকে টেকঅফ করার সময় এটি ধ্বংসের পরিকল্পনা করেছিলেন। বিষয়টি যে ইসরাইলের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসাবশত হচ্ছে তা বলাই বাহুল্য। যা হোক, ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভুল করে একটি বেসামরিক বিমানকে বিধ্বস্ত করা হয় সিনাই অঞ্চলে। মোসাদের কাছে খবর ছিল ফিলিস্তিনীরা একটি বিমান ছিনতাই করে তাতে ব্যাপক বিস্ফোরক ভর্তি করে ইসরাইলের কোনো বড় শহরে বিধ্বস্ত করবে। সিনাই থেকে লিবিয়ার একটি বিমান উড্ডয়ন করে ইসরাইলের আকাশে উড়তে থাকে। ইসরাইলি বিমান বাহিনীর নিয়ন্ত্রকরা মনে করল এটি একটি আত্মঘাতী বিমান। ইসরাইলের বেশ কয়েকটি যুদ্ধবিমান লিবিয়ার বিমানটিকে আকাশে ঘিরে ধরল। এক পর্যায়ে ঐ বিমানটি গুলি করে ভূপাতিত করল। পরে বলা হল, বিমানটি পথভ্রষ্ট হয়ে ইসরাইলে ঢুকে পড়েছিল। কেননা সিনাইতে ঐ সময় ব্যাপক ধূলিঝড়ের সৃষ্টি হয়েছিল। যাহোক ইসরাইলি চিকিৎসকরা ঐ বিধ্বস্ত ধূমায়িত বিমান থেকে ১০৮টি মৃতদেহ উদ্ধার করে।

গাদ্দাফী এই ঘটনার প্রতিশোধ নিতে শপথ করলেন। ফাতাহর পাঁচ কর্মীকে নিয়ে একটি অপারেশন টিম করা হল। এর প্রধান হলেন আমিন আল সিদ্দিকী।

মিসরের প্রেসিডেন্ট সাদাত লিবিয়াকে সাহায্য করতে মনস্থ করলেন। তিনি মারওয়ানকে, ফাতাহ'র লোকদের রুশ নির্মিত স্ট্রেলা ক্ষেপণাস্ত্র দিতে বললেন। মারওয়ান ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপণযোগ্য দুটি ক্ষেপণাস্ত্র কূটনৈতিক প্রক্রিয়ায় রোমে পাঠালেন। রোমে মারওয়ান ক্ষেপণাস্ত্র দুটি তার গাড়িতে তোলেন। তিনি সেখানে আল হিন্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং বিশ্বখ্যাত কার্পেটের দোকানে ঢুকলেন। সেখান থেকে বিশাল আকারের দুটি কার্পেট কিনলেন। অতঃপর সেই কার্পেটে ক্ষেপণাস্ত্র দুটি মুড়িয়ে সাবওয়ের মাধ্যমে ফিলিস্তিনীদের সেফ হাউজে পাঠালেন। ফাতাহ'র লোকজন সেই ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার প্রস্তুতি সমাপ্ত করেছে। কিন্তু মারওয়ান এই তথ্য মোসাদকে জানিয়ে দেন। ইটালী কর্তৃপক্ষকেও বিষয়টি তিনি অবহিত করেন। সেপ্টেম্বরের ৬ তারিখ রোমের সন্ত্রাস বিরোধী পুলিশ তাদের বিমান বন্দর সন্নিহিত একটি ফ্লাটের দরজা ভেঙে ঐ ক্ষেপণাস্ত্র আটক করে। এই দফায় বেশ কয়েকজন ফাতাহ সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়। ফাতাহ'র আরও কয়েক সদস্য হোটেলে অবস্থান করছিলেন। ক্ষেপণাস্ত্র উদ্ধারের পর রোমের গণমাধ্যম মোসাদের সতর্কতার কারণে ক্ষেপণাস্ত্র দুটির উদ্ধার সম্ভব হয়েছে বলে উল্লেখ করে। অনেকের মতে, ঐ অভিযানকালে মোসাদ-প্রধান জামির এই সময় রোমে অবস্থান করছিলে। এক মাস পর...

ইয়োম কিপ্পুর যুদ্ধ

এই যুদ্ধের পর প্রেসিডেন্ট নাসেরের জামাতা মারওয়ান প্রেসিডেন্ট সাদাতকে প্রয়োজনীয় মূল্যবান সব গোয়েন্দা তথ্য দেন। আশরাফ মারওয়ানকে সাদাত আরব দেশসমূহে তার দূত হিসেবে পাঠান। সিরিয় ও মিসরের সঙ্গে ইসরাইলের সেনাদের পৃথকীকরণে মারওয়ান সক্রিয় ছিলেন। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার ও জর্ডানের বাদশা হোসেইনের মধ্যে আম্মানে অনুষ্ঠিত বৈঠকেও মারওয়ান উপস্থিত ছিলেন। সৈন্য পৃথকীকরণের সময় মারওয়ান বিশ্বের সেরা গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ'র সংস্পর্শে আসেন। সিআইএ ব্যাকুলভাবে মিসরের পলিসি অবগত হতে একজন দায়িত্বশীল গোয়েন্দা খুঁজছিল। কেননা আমেরিকা ইতিমধ্যে ইসরাইলের সঙ্গে একটা ইন্টেরিয়াম চুক্তি করে ফেলেছিল। মার্কিন সূত্র অনুযায়ী মারওয়ান ও সিআইএ'র সম্পর্ক সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর স্থায়ী হয়েছিল। চিকিৎসার জন্য মারওয়ান বহুবার আমেরিকা সফর করেন। সিআইএ যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিত। সিনিয়র পদ মর্যাদার কারণে গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহে তার চাহিদা

কিছুটা কমে গেলে মারওয়ান ব্যবসা শুরু করেন। লন্ডনের ২৪ কার্লটন হাউজে তিনি একটা বিলাসবহুল এ্যাপার্টমেন্ট কেনেন এবং তার অগুনতি টাকা বিভিন্নভাবে লগ্নি করেন।

১৯৭৫ সালে আশরাফ মারওয়ান আরব ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। মিসর, সৌদি আরব এবং উপ-সাগরীয় আমিরাতের দেশগুলো এই সংস্থার সদস্য। মূল লক্ষ্য ছিল পশ্চিমা ধাচেই তাদের প্রচলিত অস্ত্রগুলো তৈরির। প্রকল্পটি ব্যর্থ হলেও ব্যবসায়ী মহলের এবং তাদের লোকদের সঙ্গে তার সখ্যতা গড়ে উঠে। যাহোক, কিছুদিন পর অস্ত্র নবায়নের কোম্পানি থেকে বাদ পড়লে মারওয়ান ১৯৭৯ সালে প্যারিসে চলে যান। দু'বছর পর ধর্মান্ধ সন্ত্রাসীদের হাতে মিসরের প্রেসিডেন্ট সাদাত নিহত হলে মারওয়ান লন্ডনে গিয়ে বিশাল ব্যবসার মাধ্যমে মস্ত ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হন। ব্যালোরক দ্বীপে তার মালিকানাধীন হোটেলে তিনি মোসাদের শীর্ষ গোয়েন্দা ডুবিকে দাওয়াত করেন। তাকে মারওয়ান জানান যে, গোয়েন্দাবৃত্তি থেকে তিনি অবসর নিতে চাইছেন। ওদিকে মিসরের মাটি তার জন্য উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। বিশ্লেষকদের মতে, সত্তর দশকের শেষার্ধে মারওয়ান উপলব্ধি করেন যে, মিসরের শীর্ষ পর্যায়ে ইসরাইলের সঙ্গে তার সখ্যতার কথা জানাজানি হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে আশরাফ মারওয়ান ইসরাইলের পক্ষে গোয়েন্দাগিরিও ছেড়ে দিলেন।

ইতিমধ্যে সফল ও বিত্তশালী ব্যবসায়ী হিসেবে চারদিকে মারওয়ানের ব্যাপক পরিচিতি। এর ফলে তিনি ভালো ভালো প্রকল্পে লগ্নি করতে সমর্থ হন। তিনি ফুটবল ক্লাব চেলসির অন্যতম অংশিদার হন। লন্ডনের বিখ্যাত এবং অভিজাত হ্যারোডস ডিপার্টমেন্ট স্টোর কিনতে মনস্থ করেন। এজন্য তাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয় প্রিন্সেস ডায়নার প্রেমিক ডোদীর বাবা মোহাম্মদ আল ডায়েদের সঙ্গে। এদিকে তার বিলাসী জীবনের ধরন-ধারণ আরও বৃদ্ধি পেল। প্রেম, ভালোবাসা, পরকীয়া, মেয়ে পটানোতে তিনি বরাবরই পটু। এসব কাজে মারওয়ানের নাম সমার্থক হয়ে উঠে। একবার সিআইএ'র লোকজন তার নিউইয়র্ক হোটেলে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে কয়েকঘন্টা অপেক্ষা করেছিল।

আশির দশকে গাদ্দাফীর আমলে বেশ কয়েকটি অস্ত্র কেনা-বেচার ডিলের সঙ্গে মারওয়ান যুক্ত ছিলেন। লেবাননে সন্ত্রাসীদের অস্ত্র সরবরাহের ব্যবসায়ও তিনি যুক্ত ছিলেন। একবার সিআইএ'র এক এজেন্টকে তার বাড়িতে দাওয়াত দেন তিনি। বারান্দা থেকে তাকে একটি ঝকঝকে রোলস রয়েস গাড়ি দেখান

আশরাফ মারওয়ান। পার্ক করা গাড়িটি গাদ্দাফী তাকে উপহার হিসেবে দিয়েছেন বলে তিনি জানান।

প্রেসিডেন্ট নাসেরের জামাতা আশরাফ মারওয়ানের সঙ্গে সন্ত্রাসীদের যোগাযোগের বিষয়টি হয়তো সত্যের অপলাপ। কেননা সন্ত্রাসীদের সঙ্গে তিনি সম্পর্ক করলে, ব্যবসা করলে মোসাদ তাকে ছেড়ে দেবে না। মোসাদ তার পিছু নিলে ইসরাইলি এজেন্ট হিসেবে তার অতীত প্রকাশিত হবে। একই সাথে মোসাদ নিশ্চিত তাকে হত্যা করবে। মারওয়ান যদি লিবিয়া কিম্বা সন্ত্রাসীদের সঙ্গে কোনো প্রকার সম্পর্ক তৈরিই করে থাকেন তা করেছেন মোসাদের পূর্ণ সম্মতিতে।

২০০২ সালে ইসরাইলের ইতিহাস শীর্ষক পুস্তক প্রকাশিত হয় লন্ডন থেকে। বইয়ের লেখক ইসরাইলের বিশেষ পন্ডিত আহরন ব্রেগসান। সেখানে ইয়োম কিপ্পুর যুদ্ধের ব্যাপারে ইসরাইলকে এক জামাতা সতর্ক করেছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়। আর ঐ গোয়েন্দা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। এঞ্জেল হলেন প্রেসিডেন্ট নাসেরের জামাতা। ব্রেগম্যান ঐ গোয়েন্দাকে ডাবল এজেন্ট হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি আরও লেখেন ঐ ডাবল এজেন্ট ইসরাইলকে মিথ্যা তথ্য দিতেন। ঐ বইয়ে মারওয়ানের নাম ছিল না। মারওয়ান মিসরের আল আহরাম পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দিয়ে ব্রেগম্যানের গবেষণাকে একটা স্টুপিড গোয়েন্দা গল্প বলে অভিহিত করেন।

ব্রেগম্যান এতে খুবই দুঃখ পান। তিনি তার সম্মান বাঁচাতে একই পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দেন। এই সাক্ষাৎকারে 'জামাতা' হিসেবে আশরাফ মারওয়ানের নাম উল্লেখ করেন।

অভিযোগটি গুরুতর। কিন্তু এর কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু সাবেক আমান প্রধান জেনারেল জেইরা যখন মুখ খোলেন তখন ব্রেগম্যানের কথার সত্যতার প্রমাণ মেলে। জেইরা ঘোষণা দেন ঐ জামাতা ছিলেন ডাবল এজেন্ট। ইসরাইলকে তিনি বোকা বানিয়েছেন। এবং তার নাম আশরাফ মারওয়ান।

ইসরাইলের মাটিতে অতীতে কখনোই এমন ঘটনা ঘটেনি। ইসরাইল কখনোই তাদের সাবেক গুপ্তচরদের পরিচয় প্রকাশ করেনি; এমনকী সে যদি জীবিতও না থাকে। এদিকে আশরাফ মারওয়ান তো জীবিত। সাবেক মোসাদ-প্রধান জামির ত্রিশ বছর আগে অবসরে গেছেন। তিনি মারওয়ানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। কিন্তু এঞ্জেল জামিরের সাথে গলা মিলিয়ে কিছু বলতে অস্বীকৃতি জানান। জামির বলেছেন, মারওয়ান হয়তো মনে করেছেন, আমি তাকে রক্ষা করতে পারব

না। তবে আমি তাকে রক্ষার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমি সফল হইনি।

জেনারেল জেইরা যে তথ্য প্রকাশ করলেন তার কঠোর বিরোধিতা করলেন মোসাদের সাবেক প্রধান জামির। তিনি বললেন, জেইরা রাষ্ট্রের গোপনীয়তা বিনষ্ট করছেন। জেইরা পাল্টা আক্রমণ করে বললেন, মোসাদ-প্রধান জামির যাকে রক্ষা করতে চাইছেন তিনি একজন ডাবল এজেন্ট।

ইসরাইলি সাংবাদিক রোনেন মিসরের একটি টিভি অনুষ্ঠান সরাসরি দেখছিলেন। এটি ঐ সরকারের একটা বিশেষ অনুষ্ঠান। সেখানে দেখা গেল মিসরের প্রেসিডেন্ট হোসাইনী মোবারক মারওয়ানের সঙ্গে উষ্ণ করমর্দন করছেন। অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিক রোনেন আশরাফ মারওয়ানকে ডাবল এজেন্ট হিসেবে অভিহিত করেন।

ইসরাইলে মারওয়ানের সত্যিকার পরিচিতি নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে তুমুল বিতর্কের মধ্যে মোসাদ ও আমান সত্য উদঘাটনে দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করল। কিন্তু দুটি কমিটির রিপোর্টের উপসংহার ছিল একই। সেখানে বলা হল, মারওয়ান ডাবল এজেন্ট ছিলেন না এবং ইসরাইলের জন্য ক্ষতিকর এমন কিছু তিনি করেননি। জেনারেল জেইরা ছাড়বার পাত্র নন। তিনি সাবেক মোসাদ-প্রধান জামিরের বিরুদ্ধে মামলা করলেন। একজন সাবেক বিচারপতি ঐ মামলার সালিশ নিযুক্ত হন এবং তিনি জামিরের বক্তব্যই সঠিক বলে রায় দেন।

জেইরা এবং তার সমর্থকরা কখনোই এ তথ্য আমলে নিতে চাননি যে, মারওয়ান মিসর সরকারের একজন শীর্ষ কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি ছিলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট নাসেরের জামাতা কিম্বা আনোয়ার সাদাতের একজন উপদেষ্টা। এদিকে গেড়াকলে পড়া মিসর সরকার কখনোই স্বীকার করতে চায়নি, তাদের একজন শীর্ষ কর্মকর্তা একজন রাষ্ট্রদ্রোহী ছিলেন কিম্বা ইহুদিদের হয়ে কাজ করেছেন। এটা স্বীকার করার অর্থ হল মিসরের জনগণ এতে যারপরনাই ব্যথিত হবে এবং মিসরের নেতাদের ব্যাপারে জনমনে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। ফলে তারা ভিন্ন এক প্রক্রিয়া গ্রহণ করল। তারা প্রকাশ্যে মারওয়ানের প্রশংসা করল কিন্তু তাকে আর সরকারের কোনো পদে কোনোক্রমেই জায়গা না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

২০০৭ সালে ইসরাইলের উল্লেখিত বিচারক তার রায় প্রকাশ করলেন। ১২ জুন ইসরাইলের একটি আদালত সরকারিভাবে স্বীকার করল যে, জামিরের মাধ্যমে মারওয়ান মোসাদের হয়ে কাজ করেছেন। দুই সপ্তাহ পরে ২৭ জুন মারওয়ানের লাশ তার বারান্দার নিচে রাস্তার পাশে পাওয়া গেল।

ইসরাইলি পর্যবেক্ষকরা এই হত্যার জন্য মিসরের গোয়েন্দা বিভাগকে দায়ী করল। অনেকে জেনারেল জেইরকে দায়ী করল। তার লাগামহীন কথাবার্তা ও আচরণই মারওয়ানের মৃত্যুর কারণ। এদিকে মারওয়ানের বিধবা স্ত্রী এবং প্রেসিডেন্ট নাসেরের মেয়ে তার স্বামীকে হত্যার জন্য মোসাদকে দায়ী করে বিবৃতি দিলেন। এদিকে প্রত্যক্ষদর্শীরা বলল, মৃত্যুর কিছু আগে মধ্যপ্রাচ্যের লোকদের চেহারার কিছু লোককে মারওয়ানের সঙ্গে বারান্দায় কথা বলতে দেখা গেছে।

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডও মামলার তদন্ত করল। কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে বলল, হত্যাকারীকে খুঁজে পেতে তারা ব্যর্থ।

এঞ্জেলের হত্যাকাণ্ডের কোনো কিনারা আজও হয়নি। ইচ্ছে করলে কেউ তদন্ত করে দেখতে পারেন।

আমরা চাই একটা মিগ টুয়েন্টি ওয়ান

অপহৃত ইয়োসেলিকে উদ্ধারে মোসাদ-প্রধান আইসারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা সর্বজনবিদিত। মোসাদে আইসারের স্থলাভিষিক্ত হন মেইর অমিত। তিনি এক বিশেষ ধাচের মানুষ। কী রকম? মেইর অমিত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কখনো কখনো কাঠখোট্টা হালকা ঝগড়াটে স্বভাবের এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অটল। পাশাপাশি উষ্ণ স্বভাবের সোলজারস সোলজার এবং তার অনেক বন্ধু-বান্ধবও। মোশে দায়ান একবার বলেছিলেন, আমার সব বন্ধুর মধ্যে মেইর অমিতই সেরা।

মেইর অমিতের জীবন-যাপন এবং পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ পদ্ধতি মোসাদের নেতৃত্বের ধরনই পাল্টে দেয়। আগের মোসাদ-প্রধান আইসারের জন্ম রাশিয়ায়। মেইর অমিতের জন্ম ইসরাইলেই। ইসরাইল যুদ্ধে মেইর অমিত অংশ নিয়েছিলেন এবং সেনাবাহিনীতে যথারীতি ইউনিফর্ম পরে দীর্ঘদিন চাকরি করে তবে মোসাদে যোগদান করেন। আইসারদের জেনারেশনের ছিল নিজেকে অন্যের নজরে না আনার প্রবণতা। মুখ বন্ধ রাখা, ষড়যন্ত্র এবং অন্তরালে থাকার মানসিকতা নিয়ে তারা কাজ করতেন। কিন্তু মেইর অমিত সেনাবাহিনীর লোক। অনেক বন্ধু ও সহকর্মী তার। এবং তারা সকলেই ধারণা করতেন যে, মেইর অমিত কী করতে যাচ্ছেন। ছায়ার পেছনে লুকিয়ে থাকার মানুষ তিনি নন। সাবেক মোসাদ-প্রধান আইসারের মধ্যে কারিশমা ও রহস্যপ্রিয়তা ছিল। কিন্তু অমিত ও তার উত্তরসুরীদের মধ্যে প্রকাশ্য নিষ্ঠুরতা ও কর্তৃত্বপরায়ণতা লক্ষণীয়। সামরিক বাহিনীতে থাকার অভিজ্ঞতা এবং ইউনিফর্ম তাদের মধ্যে এমন গুণাবলীর সমাবেশ ঘটিয়েছে।

ইসরাইলের স্বাধীনতা যুদ্ধে অমিত আহত হলেও সামরিক বাহিনীতে তিনি বেশ সুনাম কুড়িয়ে ছিলেন। এলিট বাহিনী গোলানী ব্রিগেডের কমান্ডার অমিত সিনাই ক্যাম্পেইনের সময় অপারেশন চীফ ছিলেন। তার সামরিক বাহিনীর চীফ অব স্টাফ হওয়া ছিল অবধারিত। কিন্তু প্যারাসুট জ্যাম্পে আহত হয়ে তাকে এক বছর হাসপাতালে কাটাতে হয়। সামান্য আরোগ্য লাভ করে তিনি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে যান। পরে তাকে আমান বাহিনীর প্রধান করা হয়। ১৯৬৩ সালের এপ্রিলে নেল গুরিয়েন তাকে আইসারের স্থলাভিষিক্ত করেন। মোসাদ-প্রধান হন মেইর অমিত।

মোসাদের প্রধান হিসেবে অমিতের প্রথম দিকের দিনগুলো খুব সহজ ছিল না। ইয়াকেভ কারুজসহ আইসারের অনেক ঘনিষ্ঠ সহকর্মীই অমিতের আচরণে রুষ্ট ছিলেন। তার আকস্মিক মেজাজ দেখানো কিম্বা অতিমাত্রায় আত্মপ্রত্যয়ী ভঙ্গি

অনেক সিনিয়রদের কাছেই ছিল বিরক্তিকর। অনেকেই চটজলদি পদত্যাগ করলেন, কয়েকজন পদত্যাগে কিছুটা সময় নিলেন। অমিতের নেতৃত্বে মোসাদে পরিবর্তন হতে থাকল। তবে মেইর অমিতের সঙ্গে আইসারের সম্পর্ক খুব বেশি খারাপ হয়ে পড়ে।

১৯৬৩ সালের বসন্তকালে প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে বেন গুরিয়েন পদত্যাগ করলে তার স্থলাভিষিক্ত হন তারই ঘনিষ্ঠ সহযোগী লেভী এসকোল। এসকোলের বেশ কিছু সিদ্ধান্তে তার পূর্বসূরী বিরক্ত হন। এর মধ্যে আইসারকে তার উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দান। গোয়েন্দা বিষয়ক দফতরে আইসারকে উপদেষ্টা করা হয়। মোসাদ থেকে চলে যাওয়ার পর আইসার ছিলেন বিরক্ত। যখন তিনি শুনলেন যে, অমিত মরক্কো সরকারকে নিয়মনীতি ভেঙে সহযোগিতা করতে যাচ্ছে তখন তিনি আর সুস্থির থাকতে পারলেন না। সোজা অমিতের অফিসে গিয়ে তার ঘাড়টা ধরেন আর কী।

অমিতের নেতৃত্বাধীন মোসাদ মরক্কোর রাজ পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আইসারের কার্যকালেই মরক্কোর সঙ্গে মোসাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হতে শুরু করে। মরক্কোর সঙ্গে মোসাদের ইয়াকোভ কারুজ ও রাফি এইটান প্রথম যোগাযোগ স্থাপন করেন। ১৯৬৩ সালের শীতকালে আইসার এইটানকে একটা বড় ধরনের সিদ্ধান্তের কথা অত্যন্ত গোপনীয় রাখার শর্তে প্রকাশ করেছিলেন। কথাটা হল মরক্কোর বাদশা হাসান দুই-এর আশংকা মিসরের প্রেসিডেন্ট নাসের তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছেন। হত্যা ষড়যন্ত্রের নেপথ্য কারণ হল বাদশাহ হাসান পাশ্চাত্য ঘেঁষা হয়ে উঠছেন। এখন বাদশাহ হাসান চাইছেন তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার দায়িত্ব মোসাদ নিক।

এই গল্প, কাহিনী বা তথ্য অভাবনীয় বা অসম্ভব মনে হতে পারে। একটি আরব দেশের বাদশাহ আজ ইসরাইলি গোয়েন্দা বিভাগের সাহায্য নিতে চাইছেন? সব সময় বাস্তববাদী হিসেবে খ্যাত রাফি এইটান ও ডেভিড সমোরন নামের আরেক গোয়েন্দা গোপনে মরক্কোর রাজধানী রাবাত সফর করেন। তারা ভুয়া পাসপোর্টে সেখানে যান। একটা গোপন দরজা দিয়ে তাদের বাদশাহর প্রাসাদে ঢোকানো হয়। সেখানে তারা মরক্কোর ভয়ানক জেনারেল ওইউফকীয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ওইউফকীর মরক্কোর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং যাবতীয় নিষ্ঠুরতার জন্য সুপরিচিত। বাদশার বিরুদ্ধে গেলে ওইউফকীর তাকে বাঁচিয়ে রাখেন না। দলে দলে বিরোধী দলীয় লোক গায়েব হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে বাকি থাকে না এর পেছনে রয়েছেন ওইউফকীর। গোয়েন্দা বিষয়ক পরামর্শের ক্ষেত্রে বাদশাহ হাসান এই জেনারেলের পরামর্শকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। সেক্ষেত্রে

ইসরাইল ও মরক্কোর মধ্যে কোনো চুক্তি সম্পাদনে তার অনুমোদন লাগবে। মোসাদের এইটানের সঙ্গে বৈঠককালে জেনারেল ওইউফকীর তার ডেপুটি কর্নেল ডলিমিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন।

এইটান এবং ওইউফকীর একটা চুক্তিতে উপনীত হন। চুক্তিটা হল মোসাদ ও মরক্কোর গোয়েন্দা বিভাগ সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করবে এবং পরস্পর পরস্পরের দেশে স্থায়ী অফিস খুলবে। মোসাদ মরক্কোর গোয়েন্দাদের প্রশিক্ষণ দেবে এবং মরক্কো বিশ্বব্যাপী মোসাদ সদস্যদের সার্বিক নিরাপত্তা প্রদান করবে। গোয়েন্দা তথ্যসমূহ দুই দেশ ভাগাভাগি করে নেয়ার স্বার্থে একটা বিশেষ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করবে। চুক্তিতে আরও বলা হয়, মরক্কোর বাদশার নিরাপত্তায় নিয়োজিতদের মোসাদ উচ্চতর প্রশিক্ষণ দেবে। বাদশাহ্ হাসানের উপস্থিতিতে এই চুক্তিপত্রের সীলমোহর করা হয় এবং এইটান বাদশাহকে কুর্নিশ শেষে তার হাতে চুম্বন করেন।

আরব বিশ্বে মোসাদ এই প্রথম তার কোনো বন্ধু বা সুহৃদের সন্ধান পেল।

এই চুক্তির দুই সপ্তাহের মধ্যে ওইউফকীর ইসরাইল যান। জেনারেল ওইউফকীর বিদেশে সবচে দামী হোটেলে থাকেন। কিন্তু ইসরাইলে গিয়ে তিনি এইটানের তেলআবিব সন্নিহিত ক্ষুদ্র তিন রুমের ফ্ল্যাটে উঠেন। জেনারেল ওইউফকীরের খাওয়া-দাওয়ার জন্য মোসাদের প্রবাদপ্রতিম বাবুর্চি ফিলিপকে পাওয়া যায়। ওইউফকীরের এই আসা-যাওয়ার মাধ্যমে দুই দেশের গোয়েন্দা সংস্থার সম্পর্ক বেশ ভালো হয়ে উঠে। ঠিক এমনি সময় ওইউফকীর মোসাদ-প্রধান মেইর অমিতের কাছে একটা স্পেশাল ফেভার চান।

মরক্কোর বাদশাহর প্রধান শত্রু ছিলেন সে দেশেরই মেহেদী বেন বারকা। তিনি আবার বিরোধী দলেরও নেতা। বাদশাহর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে তাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হলেও দেশে অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ সমানে চলছিল। পলাতক অবস্থায় তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। মেহেদী তার জীবনের ওপর হুমকির কথা জানতেন এবং ওইউফকীর লোকজন যাতে তাকে ধরতে না পারে সেজন্য তিনি সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। ফলে তাকে ধরা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। মোসাদ কী এখন তাকে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করবে?

মেইর অমিতের লোকজন একাজে সহায়তা করেছিলেন। মোসাদ মেহেদী বেন বারকাকে ধোঁকা দিয়ে সুইজারল্যান্ডে আসতে রাজি করেছিলো। অবশ্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের কথা বলে তাকে প্যারিসে নিয়ে আসা হয়। প্যারিসের বিখ্যাত লেফট ব্যাংক রেস্তোরাঁয় ঢুকতেই ফ্রান্সের দুই পুলিশ তাকে গ্রেফতার

করে। পরে জানা গেছে মরক্কোর মন্ত্রী ওইউফকীরের পে-রোলে ছিল ওই দুই পুলিশ অফিসার। বেন বারকাকে ওইউফকীরের হাতে হস্তান্তর করা হলে তিনি গুম হয়ে যান। কিন্তু একজন সাক্ষী বলেন যে, তিনি দেখেছেন ওইউফকীর নিজে মেহেদী বেন বারকাকে ছুরি মেরে হত্যা করেছেন। মেইর অমিত নিজেই প্রধানমন্ত্রী এসকোলকে জানান যে, লোকটিকে হত্যা করা হয়েছে।

বেন বারকার গুম হওয়ার ঘটনায় ফ্রান্সে রাজনৈতিক গুজব গুঞ্জন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। প্রেসিডেন্ট দ্যা গল এই ঘটনায় খুবই ক্ষুব্ধ হন। যখন তিনি এই ঘটনায় মোসাদের সংশ্লিষ্টতার খবর পান তখন তিনি আরও ক্রোধান্বিত হন।

সাবেক মোসাদ-প্রধান আইসার এ ঘটনায় স্তম্ভিত হয়ে পড়েন। মোসাদ কী করে এই ধরনের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট হয়? তার জিজ্ঞাসা, মোসাদ কী করে এমন অনৈতিক ও ফৌজদারী অপরাধে নিজেদের যুক্ত করে এবং এর ফলশ্রুতিতে ফ্রান্সের সঙ্গে ইসরাইলের সম্পর্ক আজ খুবই খারাপ হতে চলেছে। আইসার প্রধানমন্ত্রী এসকোলের কাছেও এ প্রশ্ন করেন এবং অবিলম্বে মেইর অমিতকে চাকরিচ্যুত করার কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী এসকোল দ্বিধান্বিত ছিলেন এবং বাধ্য হয়ে দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। দুটি কমিটিই মেইর অমিতকে নির্দোষ বলে রায় দেয়। সাবেক মোসাদ-প্রধান আইসার অতঃপর পদত্যাগ করেন এবং প্রধানমন্ত্রী ও মেইর অমিতের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে নেমে পড়েন। তিনি সাংবাদিকদের সাহায্য কামনা করলেও কঠিন সামরিক সেন্সরশীপের কারণে এ ব্যাপারটি কোনো প্রচারণা পায় না।

আইসার অমিতের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে থাকলেও বর্তমান মোসাদ-প্রধান অমিত অপর একটি অভিযান নিয়ে ইতিমধ্যেই নেমে পড়েছেন। আর এই অভিযানটি ইসরাইলের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে ছিল বিরাট চ্যালেঞ্জ। অমিতের এই নতুন প্রকল্পটি হল ইরাকের কুর্দীদের সঙ্গে গোপন আঁতাত তৈরি।

১৯৬৫ সালের শেষার্ধে মেইর অমিত তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন আমাদের স্বপ্ন বাস্তব হতে চলেছে। অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটেছে। উত্তর ইরাকের কুর্দী বিদ্রোহী নেতা মোল্লা মোস্তফা বারজানীর তাঁবুতে ইসরাইলি সরকারি প্রতিনিধি আস্তানা গাঁড়তে সক্ষম হয়েছে। মোসাদ কর্মকর্তাদের কুর্দীস্তানে অবস্থানকে ইসরাইলি গোয়েন্দা বিভাগের এক বিশাল সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হল। ইরাকের একটি প্রধান ফ্যাক্টর হল কুর্দীরা। এই একগুয়ে সম্প্রদায়ের সঙ্গে এই প্রথম বারের মতো ইসরাইলের একটা যোগসূত্র সৃষ্টি হল। কুর্দীরা ইরাকী রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে লাগাতার যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। কুর্দীরা ছাড়া ইরাকের আর

দুটি ফ্যাক্টর হল শিয়া ও সুন্নীরা। বারজানীর নেতৃত্বাধীন কুর্দীরা ইরাকের অভ্যন্তরে ব্যাপক এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে। মোসাদ যদি কুর্দী বিদ্রোহীদের মদদ দিয়ে আরও শক্তিশালী করতে সমর্থ হয়, তাহলে অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ইরাককে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হবে। ফলে ইরাকের শক্তি ক্ষয় হবে এবং ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সক্ষমতা হ্রাস পাবে। কুর্দীদের সঙ্গে এই আঁতাত ইসরাইলের পক্ষে আশীর্বাদ হয়ে উঠবে।

প্রথমে তিনজন মোসাদ গোয়েন্দা কুর্দীস্তানে তিন মাস অবস্থান করে। বারজানী তাদেরকে ইনার সার্কেলের অংশ করে নেন। বারজানি যেখানেই যেতেন তাদের সঙ্গে নিয়ে যেতেন। ফলে কুর্দীদের সব গোপন তথ্যাদি মোসাদের জানা হয়ে যায়। মোসাদ ও কুর্দীদের এই সম্পর্ক বেশ ক'বছর উষ্ণ ছিল। বারজানী ও কুর্দীদের সামরিক বাহিনীর প্রধান বেশ কয়েকবার ইসরাইল সফর করেন। মেইর অমিত এবং সহকারীরা কুর্দীস্তান সফর করেন। ইসরাইল কুর্দীদের প্রচুর অস্ত্র দিয়েছে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ইস্যুতে কুর্দীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করেছে।

কুর্দীস্তান সফরকারী ইসরাইলি গোয়েন্দাদের মধ্যে প্রথম সিনিয়র মোস্ট গোয়েন্দা হলেন বেনি জেভি। তার স্ত্রী গালিলা সন্তান প্রসবের লক্ষ্যে লন্ডনে অবস্থান করছিলেন। এই দম্পতির পুত্র সন্তান নাদাভের জন্মের সময় বেনি জেভি কুর্দীস্তানের পাহাড়ে পাহাড়ে বারজানীর সঙ্গে সফর করছিলেন। এই সময় বেনি জেভির কাছে সাংকেতিক ভাষায় একটি টেলিগ্রাম পাঠান মোসাদ-প্রধান মেইর অমিত। অমিতের কোড নাম রিমন। টেলিগ্রামে বলা হয় মা ও সন্তানের স্বাস্থ্য খুবই ভালো রয়েছে।

বেনি জেভির ছেলে হওয়ার সংবাদে বারজানী চারখন্ড পাথর নিয়ে তাতে নানা কথা লিখলেন। জেভিকে বললেন, আপনার ছেলের জন্য আমার এই উপহার। ছেলে বড় হয়ে যখন আমার দেশে আসতে চাইবে তাকে কেউ আটকাবে না। কুর্দীস্তানে সে জমিও পাবে।

বেশ কয়েক বছর পর অমিতের মৃত্যুতে তাকে স্মরণ করে ইসরাইলের বিমান বাহিনীর সাবেক প্রধান জেনারেল ইজার ওয়েইজম্যান বলেছেন, আমরা প্রায়শই তার বাড়িতে যেতাম। প্রায়শই আমরা এক সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করতাম। এরকম একদিন সকালে মেইর অমিত তাকে জিজ্ঞেস করলেন, মোসাদ-প্রধান হিসেবে আমি আপনার জন্য কী করতে পারি। জেনারেল ওয়েইজম্যান বললেন মেইর আমি একটা মিগ টুয়েন্টি ওয়ান চাই।

মেইর অমিত তাকে বললেন, আপনি কী পাগল হয়ে গেছেন? পশ্চিমাদের কাছে পর্যন্ত এরকম একটি যুদ্ধবিমান নেই।

প্রকৃতপক্ষে মিগ টুয়েন্টি ওয়ান ঐ আমলের সবচে সফিসটিকেটেড যুদ্ধবিমান। সোভিয়েত ইউনিয়ন কয়েকটি আরব দেশকে অবশ্য ঐ যুদ্ধবিমান সরবরাহ করেছে।

কিন্তু জেনারেল ওয়েইজম্যান নাছোড়বান্দা। অমিতের মাধ্যমে একটা মিগ তার চাইই চাই। মেইর অমিত এরকম একটি বিমান সংগ্রহে অপারেশন অফিসার বেহাভিয়া ভার্দিকে দায়িত্ব দিলেন। ভার্দি ইতিপূর্বে সিরিয় অথবা মিসর থেকে একটি মিগ টুয়েন্টি ওয়ান গায়েবের চেষ্টা করেছেন। ভার্দি এক বছর পরে অমিতকে জানালেন যে, একাজে আমরা কয়েকমাস অতিবাহিত করেছি। মূল সমস্যা হল এরকম একটি প্রত্যাশার কথা প্রকাশ করা কঠিন।

ভার্দি তার প্রত্যাশার কথা আরব দেশগুলোতে তার লোকজনের কাছে জানালেন। কয়েক সপ্তাহ পরে ইরানে নিযুক্ত ইসরাইলের সামরিক এ্যাটাশে ইয়াকোভ নিমরোদি এ সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন পাঠালেন মোসাদে। তার চিঠির ভাষ্যমতে ইয়োসেফ সেমেশ নামে এক ইরাকী ইহুদির দাবি তিনি এমন একজন ইরাকী পাইলটকে জানেন যে, সে কাজটি পারবে। অর্থাৎ ইরাক থেকে মিগ টুয়েন্টি ওয়ান যুদ্ধবিমান উড়িয়ে সে ইসরাইলে অবতরণ করাবে।

ইয়োসেফ সেমেশ বিয়ে থা করেননি। স্মার্ট, পরকীয়া করে বেড়াচ্ছেন সমানে। আবার ভোজনবিলাসী। তার একটা মস্ত গুণ স্বল্প সময়েই তিনি বন্ধু হয়ে যেতে পারেন যে কারো। এসব বন্ধুরা তাকে বিশ্বাসও করে।

নিমরোদি সেমেশ সম্পর্কে মোসাদকে আরও জানালেন যে, তার পক্ষেই এ কাজ করা সম্ভব। তাছাড়া সেমেশ তার সঙ্গে গত এক বছর ধরে কাজ করছেন।

নিমরোদি সেমেশকে পরীক্ষায় অবতীর্ণ করলেন। গুপ্তচরবৃত্তির কয়েকটি ছোটখাট কাজে সেমেশকে নিয়োগ দিলেন। সেমেশ অতিশয় বুদ্ধিমত্তার জন্য পরীক্ষায় পাশও করলেন।

নিমরোদি অতঃপর তাকে মিগ টুয়েন্টি ওয়ান বিমান হাইজ্যাকের ব্যাপারে অগ্রসর হতে সবুজ সংকেত দিলেন।

বাগদাদে সেমেশের একজন খ্রীষ্টান রক্ষিতা ছিল। তার বোন ক্যামলে ইরাকি বিমান বাহিনীর পাইলট মুনীর রেডফাকে বিয়ে করেছেন। মুনীরও খ্রীষ্টান।

সেমেশ জানতেন মুনীর হতাশায় নিমজ্জিত। মিগ টুয়েন্টি ওয়ান চালানোর ক্ষেত্রে মুনীর খুব পারদর্শী হলেও তাকে পদোন্নতি দেয়া হচ্ছে না। তদুপরি একটা সেকেলে মিগ সেভেনটিন বিমান দিয়ে কুর্দী এলাকায় হামলা চালাতে নির্দেশ দেয়া হল। তার মনে হল এ তার পদাবনতি এবং তার জন্য অমর্যাদাকর। সুপেরিয়ার অফিসারদের সঙ্গে এ ব্যাপারে নালিশ করেও কোনো ফল হল না। একটা পর্যায়ে সে বুঝতে পারল খ্রীষ্টান হওয়ার কারণেই তার পদোন্নতি কখনো হবে না। অর্থাৎ সে স্কোয়াড্রন লিডার হতে পারবে না। উচ্চাভিলাষী মুনীর বুঝলো এই অবস্থায় ইরাক বসবাসের কোনো মানে হয় না।

সেমেশ প্রায় এক বছর ধরে তরুণ পাইলট মুনীরের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকলেন। এক পর্যায়ে মুনীরকে এথেন্সে একটা শর্ট ট্রিপে যেতে রাজি করালেন। বাকপটু সেমেশ ইরাকী কর্তৃপক্ষকে বোঝাতে সক্ষম হলেন যে, মুনীরের স্ত্রী দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত এবং পশ্চিমের কোনো দেশে তার চিকিৎসা জরুরি। মুনীরের স্ত্রী প্রথমে গ্রীসে যাবে। এক্ষেত্রে তার স্বামীকে সঙ্গে যেতে দিতে হবে। কেননা ঐ পরিবারে মুনীরই একমাত্র ইংরেজি জানে।

ইরাকী কর্তৃপক্ষ শর্তাধীনে মুনীর ও তার স্ত্রীকে এথেন্সে যাওয়ার অনুমতি দিল। সেখানে তাদের সঙ্গে ইসরাইলের এয়ারফোর্স অফিসার কর্নেল লিরনের যোগাযোগ হল। লিরনের জন্ম পোল্যান্ডে এবং হলোকাষ্ট থেকে যাওয়া এই অফিসার ইসরাইলি এয়ারফোর্স ইন্টেলিজেন্সের প্রধান। মোসাদ তাকে নির্দেশ দিল মুনীর রেডফার বিষয়টি দেখার জন্য। লিরন এবং মুনীর সামনা-সামনি বসে অনেকগুলো বৈঠক করলেন। লিরন পরিচয় গোপন করে নিজেকে একজন পোলিশ পাইলট হিসেবে পরিচয় দিলেন এবং কম্যুনিষ্ট বিরোধী সংস্থার কাজ করেন বলে জানালেন।

মুনীর লিরনকে তার সব দুঃখের কথা বললেন। প্রথমে তার পরিবার, ইরাকে তার জীবন, সিনিয়রদের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ার ঘটনা, কুর্দীস্তানে বোমা ফেলার কাজে তাকে ব্যবহার ইত্যাদি তিনি লিরনকে খুলে বললেন। কুর্দীস্তানে তার বোমা হামলায় নারী, শিশু ও বৃদ্ধরা মারা যাচ্ছে বলে মুনীর দুঃখ প্রকাশ করলেন। এসব নাদান মানুষকে বোমা মেরে হত্যার জন্যই কী তার জন্ম।
লিরনের সঙ্গে বৈঠকের শেষ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত হল মুনীর ইরাক ছাড়বেন।

মোসাদের নির্দেশ মোতাবেক লিরন মুনীরকে গ্রীসের একটি ছোট্ট দ্বীপে দাওয়াত দিলেন। মোসাদ একটা সাঙ্কেতিক নাম দিল। ইংরেজিতে যা ডায়মন্ড বাংলায় হীরকখন্ড।

গ্রীসের দ্বীপের শান্ত সমাহিত পরিবেশে মুনীর এবং লিরন আরও ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পেলেন। লিরন মুনীরকে একটি প্রশ্ন করলেন, যদি আপনি যুদ্ধবিমান নিয়ে ইরাক ত্যাগ করেন তার পরিণতি কী হবে। মুনীর বললেন, তারা হয়তো আমাকে হত্যা করবে। এছাড়া কোনো দেশই আমাকে আশ্রয় দিতে রাজি হবে না।

এ সময় লিরন দু'বাহু বাড়িয়ে মুনীরকে বললেন, পৃথিবীতে একটা দেশই রয়েছে। যে আপনাকে আশ্রয় দেবে। লিরন তার বন্ধুর কাছে স্বীকারও করলেন, তিনি কোনো পোলিশ পাইলট নন, ইসরাইলি পাইলট।
ঘানার টেবিলে বেশ কিছুক্ষণের জন্য নীরবতা নেমে এল।
লিরন ঐ দিনের জন্য বিদায় নিলেন। পরদিন মুনীর লিরনের প্রস্তাবে তার সম্মতির কথা জানালেন। তারা দু'জন মুনীরের দেশত্যাগ তথা স্বপক্ষ ত্যাগ নিয়ে এবং মুনীরকে কত টাকা দেয়া হবে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হল।

মেইর অমিত পরে বলেছেন, মুনীর ভালো লোক। মুনীর ইচ্ছে করলে টাকার অংক দ্বিগুণ করতে পারতেন। কিন্তু প্রথমবার প্রদত্ত প্রস্তাবেই মুনীর রাজি হয়ে গেলেন। মুনীরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হল, তার পরিবার ইসরাইলে গিয়ে তার সঙ্গে যোগদান করবে।

গ্রীসের ঐ দ্বীপ থেকে লিরন ও মুনীর উড়ে গেল রোমে। সেমেশ এবং তার রক্ষিতা বাগদাদ থেকে সেখানে এল। কয়েকদিন পর তারা ইসরাইলি বিমান বাহিনীর গবেষণা কর্মকর্তা ইয়েহুদা পোরাটের সঙ্গে বৈঠক করলেন। পোরাট মুনীরকে পুরো ব্রিফিং দিলেন। পরবর্তীতে পোরাট এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন মুনীর এককথায় ভদ্র, খুবই বিবেচক। তাকে শ্রদ্ধা করা যায়। পোরাট আরও বলেন, মুনীর সাহসী। বাচাল নয়।

রোমে লিরন ও মুনীর যোগাযোগের প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করলেন। উভয়ে সিদ্ধান্তে এলেন যে, ইসরাইলি রেডিও থেকে আরবি জনপ্রিয় গান বাজানো শুরু হলে মুনীর বিমান নিয়ে তার যাত্রা শুরু করবেন। এটাই তার সিগনাল। গানটি হল মারহাবা মারহাবা।

মুনীর জানতেন না, তিনি যখন রোমে মোসাদের লোকদের সঙ্গে বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় বৈঠক করে চলছেন, তাকে মোসাদের শীর্ষ বসরা তখন পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন।

মোসাদ-প্রধান মেইর অমিত বলেছেন, যে লোকটা পৃথিবীর সেরা যুদ্ধবিমানটি নিজ দেশ থেকে উড়িয়ে শত্রু দেশে নিয়ে আসবে তাকে একবার চোখে দেখা

তার জন্য জরুরি। অমিত বলেছেন, তিনি রোমে উড়ে যান এবং তার লোকের সঙ্গে মুনীরের বৈঠকের সময় তিনি পাশের টেবিলেই বসা ছিলেন। যাহোক, মুনীরকে আমার যোগ্য লোকই মনে হল। আমি আমার অফিসারকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলাম।

মেইর অমিত হেড অন নামক তার বইয়ে ক্যাফের ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। তার ভাষায় ইহুদি প্রেমিক সেমেশ ঐ দিন স্লিপার পরেছিলেন। কেননা তার পায়ে চোট লেগেছিল। তার ভাষায়, সেমেশের বান্ধবী বা রক্ষিতা মোটা-সোটা মহিলা এবং বিন্দুমাত্র সুন্দরী নয়। আমি জানি না সেমেশ ঐ মহিলার মধ্যে কী খুঁজে পেয়েছে। এদের সঙ্গে ছিলেন মুনীর–বিশাল কাধের অধিকারী কিন্তু খাটো এবং সিরিয়স চেহারার এক মানুষ। এরা কেউই বুঝতে পারেননি যে, তাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে।

মুনীরকে আস্থায় নিয়ে মোসাদ-প্রধান অমিত ভাদিকে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিলেন।

লিরন ও মুনীর এথেন্সে এসে তেলআবিবের প্লেন ধরবেন। মুনীর তেলআবিবের প্লেনের বদলে কায়রোগামী প্লেনে উঠে বসেছিলেন। হতাশ লিরন ভাবলেন, তাদের সব আশা-ভরসা শেষ। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যে লিরনের পাশে এসে উপস্থিত হলেন মুনীর। কায়রোগামী প্লেনের যাত্রী গণনাকালে একজন অতিরিক্ত যাত্রীর সন্ধান মেলে। সেই যাত্রীই মুনীর। টিকেট চেক করা হলে দেখা গেল মুনীরের টিকেট তেলআবিবগামী।

মুনীর ইসরাইলে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা অবস্থান করেন। সে সময় তাকে ব্যাপকভাবে ব্রিফ করা হয় এবং ইরাক থেকে কোনো পথে বিমানটি আসবে তারও নির্দেশিকা দেখানো হয়। মোসাদ অফিসে তাকে একটি গোপন কোডও দেয়া হয়। আরও কিছু কর্মসূচী শেষে তাকে জাফার ভালো রেস্তোরাঁয় খাওয়ানো হয়। যাতে মুনীরের মনে প্রত্যয় জাগে যে, তিনি বাড়িতেই আছেন। মুনীর পরিকল্পনা বদল করে এথেন্স হয়ে বাগদাদে ফিরে এলেন। এরপর শুরু হবে তার চূড়ান্ত পর্বের কার্যক্রম।

মোসাদ-প্রধান মেইর অমিত পরে বলেছেন, মুনীরের একটি ঘটনায় তার হার্ট এ্যাটাক হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। মুনীর দেশ ত্যাগের কিছুদিন আগে তার বাড়ির আসবাবপত্র বিক্রির সিদ্ধান্ত নেন। যুদ্ধ বিমানের একজন পাইলটের এহেন কর্মকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ার কথা ভাবলে গা শিউরে না উঠে পারে না। ইরাকী গোয়েন্দা বাহিনী মুখাভারত যদি তার এসব মালামাল বিক্রির হেতু

জানতে চায় নির্ঘাৎ মুনীর ধরা পড়বেন। মুনীরকে গ্রেফতার করা হলে জিজ্ঞাসাবাদে তিনি যাবতীয় ষড়যন্ত্রের কথা বলে দেবেন। ব্যস, কেল্লা ফতে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, মুখাভারত ঐ বেচা-বিক্রি নিয়ে কিছু জানতে পারেনি। গাধা ও কৃপন মুনীর সামান্য টাকার জন্য জীবনটাই খোয়াতে বসেছিলেন।

এরপর আরেকটা সমস্যা দেখা দিল। পাইলট মুনীরের পরিবারকে কী করে ইরাকের বাইরে আনা যায়– প্রথমে লন্ডন পরে আমেরিকা। মুনীরের অনেকগুলো বোন ও ভগ্নিপতি। যুদ্ধবিমান ছিনতাইয়ের আগেই তাদেরকে ইরাক থেকে সরাতে হবে। পরিবারের কয়েকজন ইসরাইলে চলে আসতে রাজি হলেও পাইলট মুনীর কী সব হতে যাচ্ছে তার বিন্দুবিসর্গও তার স্ত্রীকে ভয়ে বলেননি। স্ত্রীকে শুধু একটা কথাই বলেছেন তারা ইউরোপে যাবেন এবং সেখানে দীর্ঘদিন থাকবেন। তার স্ত্রী দুই সন্তানকে নিয়ে আমস্টারডামে এলে মোসাদের লোকজন তাদের প্যারিসে নিয়ে এল। লিরন সেখানে তার সঙ্গে দেখা করলেও এরা যে মোসাদের লোক মিসেস মুনীর তা ধারণা করতে পারেননি।

লিরন পরে বলেছেন, মিসেস মুনীরকে ছোট ফ্ল্যাটে একটা ডাবল বেডের বিছানার ব্যবস্থা করা হল। লিরনের ভাষায়, আমরা তার ডাবল বেডে বসলাম। ঐ দিন রাতেই পাইলট মুনীরের মিগ টুয়েন্টি ওয়ান যুদ্ধবিমান নিয়ে ইসরাইল অভিমুখে ইরাক থেকে ভেগে আসার কথা। লিরন বলেন, এক পর্যায়ে আমি যে ইসরাইলি অফিসার সে কথা তাকে বললাম। তাকে আরও বললাম, আপনার স্বামী আগামীকাল ইসরাইলে ল্যান্ড করবেন এবং আমরা এক পর্যায়ে সেখানেই চলে যাব।

লিরন বলেন, একথায় পাইলট মুনীরের স্ত্রী বেজায় কান্না জুড়ে দেন। সারা রাত চীৎকার করে এই মহিলা কাঁদছিলেন। মিসেস মুনীর তার স্বামীকে রাষ্ট্রদ্রোহী প্রভৃতি বলে গালাগাল দিতে থাকেন। লিরন আবার সে কথা তার সিনিয়রদের জানিয়েও দেন। মিসেস মুনীর আরও বলেন, তার স্বামী ইরাকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তার ভাইয়েরা যখনি পাবে মুনীরকে হত্যা করবে।

মিসেস মুনীর এখুনি ইরাকী দূতাবাসে যেতে চাইলেন এবং তার স্বামীর কুকীর্তির কথা তাদের জানাবেন।

পাইলট মুনীরের স্ত্রী এভাবেই সারা রাত কাঁদলেন। লিরন তাকে থামাতে ব্যর্থ হন। অবশেষে লিরন তাকে বললেন, স্বামীকে দেখতে চাইলে আমার সঙ্গে ইসরাইল যেতে হবে। মিসেস মুনীর বুঝলেন, তার কাছে আর অন্য কোনো

পথ খোলা নেই। অশ্রুভেজা চোখে মিসেস মুনীর তার অসুস্থ সন্তানকে নিয়ে ইসরাইলের প্লেনে গিয়ে উঠে বসলেন।

১৯৬৬ সালের ১৭ জুলাই ইউরোপে মোসাদের অফিস একটা সাংকেতিক চিঠি পায় মুনীরের কাছ থেকে। মুনীর তাতে লিখেছেন, তিনি যুদ্ধবিমান নিয়ে ইসরাইলের পথে যাত্রার কাজ শুরু করেছেন। ১৪ আগস্ট মুনীর যাত্রা শুরু করলেও বিমানের বৈদ্যুতিক সিষ্টেমে গলদের কারণে তিনি ফিরে এসে রশীদ বিমান ঘাঁটিতে ল্যান্ড করেন।

মোসাদ-প্রধান অমিত পরে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, মুনীরের বিমানের ত্রুটি বড় ধরনের ছিল না। মুনীর ইচ্ছে করলে উড়ে আসতে পারতেন। কিন্তু মুনীর কোনো ঝুঁকি না নিয়েই ঘাঁটিতে ফিরে যান। অমিত বলেন, এই ঘটনায় আমি কত যে পাকা চুল ছিড়েছি তার ইয়াত্তা নেই। আমার টেবিলটি পাকা চুলে ভরে গিয়েছিল।

দু'দিন পরে মুনীর আবার যুদ্ধবিমানটি নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। তিনি নির্দেশিত পথেই উড়ে আসছিলেন। এক পর্যায়ে ইসরাইলি রাডারে একটি বিদেশি বিমানের এগিয়ে আসার চিহ্ন উদ্ভাসিত হল। বিমান বাহিনীর নতুন কমান্ডার জেনারেল মোরডেচাই (মোট্টি) হড সামান্য কয়েকজন পাইলটকে এই কাজের জন্য নিয়োগ দিয়েছিলেন। তাদের দায়িত্ব ছিল মুনীরের বিমানটিকে এসকর্ট করে নির্বিঘ্নে ঘাঁটিতে নিয়ে আসা। হড ঐ ঘাঁটির সব কর্মকর্তা, কর্মচারী, পাইলট, স্কোয়াড্রনদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তোমাদের আজ কোনো কাজ নেই। ছুটি। তবে আমার মৌখিক নির্দেশ পেলে জীবন দিতে বললে তাই করতে হবে। এবং তোমরা সবাই তো আমার কণ্ঠস্বর চেনই। ইসরাইলি ভূমিতে অনধিকার প্রবেশের অভিযোগে কতিপয় অতিমাত্রায় হিংসুক প্রকৃতির পাইলট যাতে শত্রু বিমানটিকে গুলি করে ভূপাতিত না করে সে কারণেই এই ব্যবস্থা।

মিগ টুয়েন্টি ওয়ান এখন ইসরাইলের আকাশে। ইসরাইলি বিমান বাহিনীর এক দক্ষ কর্মকর্তা রান পেকারকে মুনীরকে এসকর্ট করে নিয়ে আসার দায়িত্ব দেয়া হল। পেকার বিমান ঘাঁটির কন্ট্রোলকে জানালেন, আমাদের মেহমান গতি কমিয়ে আনছেন। মেহমান আমাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ইংগিত করেছেন যে, তিনি ল্যান্ড করতে চাইছেন। তিনি তার বিমানের পাখাও কাত করে দেখিয়েছেন। আর আন্তর্জাতিক আইনানুযায়ী বিমানের পাখা কাত করে দেখানোর অর্থ হল তিনি শান্তি চান। শান্তির বার্তা নিয়ে তিনি এসেছেন।

সকাল আটটায় ইরাকী পাইলট মুনীরের বিমান ইসরাইলের বিমান ঘাঁটিতে অবতরণ করল। ৬৫ মিনিট সময় লেগেছে ইরাকের বাগদাদ থেকে ইসরাইলে হাটজোর বিমান ঘাঁটিতে এসে পৌছাতে।

১৯৬৭ সালের আগে কয়েকটি দেশের বিরুদ্ধে ৬দিন ব্যাপী একক যুদ্ধে ইসরাইল বড় ধরনের জয় পেয়েছিল। আর এই যুদ্ধের আগেই অনৈতিকভাবে ইসরাইল একটি মিগ টুয়েন্টি ওয়ান যুদ্ধবিমান করায়ত্ত করেছিল। দুটি মিরেজ যুদ্ধবিমান মিগটিকে এসকর্ট করে সীমান্ত ঘাঁটি থেকে উড়িয়ে এনেছিল। মোসাদ-প্রধান মেইর অমিত এবং তার লোকজন এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন। ঐ সময় মিগ টুয়েন্টি ওয়ান যুদ্ধবিমানকে সোভিয়েত অস্ত্র ভান্ডারের ক্রাউন জুয়েল বলে অভিহিত করা হত। পশ্চিমা শক্তিও মিগ টুয়েন্টি ওয়ানের ভয়ে সর্বদা কাঁপত। সেই মিগটি আজ ইসরাইলের দখলে।

ইরাকী পাইলট মুনীর ইসরাইলের ঘাঁটিতে নিরাপদ অবতরণের পরেও বিভ্রান্ত ও হতচকিত ছিলেন। মুনীরকে হাটজোর ঘাঁটির কমান্ডারের বাসায় নেয়া হয়। এখানে সিনিয়র অফিসাররা তার সম্মানে পার্টির আয়োজন করেন।

মুনীর পার্টির বহর দেখে বিস্মিত। প্রথমে তার মনে হয়েছিল অন্য কারো বিয়ের পার্টিতে ভুল করে তিনি ঢুকে পড়েছেন। মেইর অমিত বলেছেন, মুনীর পার্টির এক কোনে জড়সড় ও শান্ত হয়ে বসেছিলেন।

কিছুটা বিশ্রাম শেষে মুনীরকে জানান হল তার স্ত্রী ও শিশুরা বিমানে করে ইসরাইলে আসছে। মুনীরকে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে নিয়ে যাওয়া হল। সাংবাদিক সম্মেলনে পাইলট মুনীর ইরাকে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের ওপর নিপীড়ন নির্যাতনের কথা বলেন। দেশ ও স্বপক্ষ ত্যাগের বর্ণনা দিয়ে মুনীর তার ওপর অবিচারের কথা বলেন এবং কুর্দীদের ওপর নির্বিচারে বোমা বর্ষণের প্রতিবাদ করেন।

সাংবাদিক সম্মেলন শেষে মুনীরকে তেলআবিব সন্নিহিত সমুদ্র তীরবর্তী হারজলিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে তার পরিবার অবস্থান করছে।

মোসাদ-প্রধান মেইর অমিত লিখেছেন, পাইলট মুনীরকে স্বাভাবিক ও শান্ত করতে আমরা সবধরনের পদক্ষেপ নেই। আমরা তাকে নানাভাবে উজ্জীবিত করি এবং বড় একটা সফল অভিযানের জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই। মেইর অমিত আরও লিখেছেন, আমার যত ক্ষমতা রয়েছে তা ব্যবহারের মাধ্যমে মুনীর এবং তার পরিবারের কল্যাণ করা হবে বলে আমি তাকে প্রতিশ্রুতি

দেই। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছিল পরবর্তী অধ্যায় নিয়ে। কেননা মুনীরের পরিবার যে একটা সমস্যা সংকুল পরিবার তা আমি জানতাম।

এর কিছুদিনের মধ্যেই মুনীরের স্ত্রীর ভাই ইসরাইলে আসেন। তার সঙ্গে ছিলেন সেই বিখ্যাত সেমেশ এবং তার বান্ধবী ক্যামিল্লে। মুনীরের স্ত্রীর ভাই ইরাকী সেনাবাহিনীর অফিসার। ঐ অফিসারটি রাগে গজগজ করছিলেন। সামনা-সামনি হতেই তিনি মুনীরের মাথায় ঘুষি মারেন। ঐ অফিসার বলেন, তার বোন গুরুতর অসুস্থ বিধায় তাকে ইউরোপ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আর আজ তিনি তাকে ইসরাইলের মাটিতে দেখে বিস্মিত। ইরাকী অফিসার মুনিরকে রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যা দিয়ে আক্রমণের এক পর্যায়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি তার বোন অর্থাৎ মুনীরের স্ত্রীকেও ভৎসনা করেন। সে কেন সবকিছু জেনেও তাদের জানাল না। মুনীরের স্ত্রী ভাইয়ের অভিযোগ অস্বীকার করেন। কয়েকদিন পর মুনীরের ঐ আত্মীয় ইরাকী সামরিক অফিসার ইসরাইল ত্যাগ করেন।

জালিয়াতি করে ইরাক থেকে আনীত মিগ টুয়েন্টি ওয়ান চালানোর জন্য প্রথম মনোনীত হন ড্যানি সাপিরা। ড্যানিও ইসরাইলি বিমান বাহিনীর পাইলট এবং তাকে সেরা টেষ্ট পাইলট হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মোট্রি হড তাকে ডেকে বললেন, তুমি প্রথম পশ্চিমা পাইলট হিসেবে মিগটি নিয়ে আকাশে উড়বে। যত খুশী, যত ঘণ্টা খুশী উড়তে থাক এবং এর ভালো-মন্দ দিকগুলো আমাদের জানাও।

ড্যানি পরবর্তীতে বলেছেন, মুনীর আমাকে প্লেনের কোথায় কোনো সুঁইচ তা দেখিয়ে দেন। সব কমান্ডই আরবি ও রুশ ভাষায় লেখা ছিল। যাহোক এক ঘণ্টার মাথায় আমি মুনীরকে বললাম, এখন মিগটি চালাব। একথা শুনে মুনীর বিস্মিত হলেন। তিনি বললেন, এখনো তো আপনার কোর্স শেষ হয়নি। আমি তাকে বললাম, আমি একজন টেষ্ট পাইলট। একথা শোনার পরও মুনীরকে খুব চিন্তাযুক্ত মনে হল। তিনি ককপিটে আমার পাশে বসারও আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু তার প্রয়োজন নেই বলে তাকে আমি আশ্বস্ত করলাম।

ইসরাইলের বিভিন্ন বাহিনীর কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। জেনারেল ওয়েজম্যানকে মনে আছে? তিনিই প্রথম মিগ টুয়েন্টি ওয়ান ইসরাইলের হস্তগত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনিও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পাইলট সাপিরা অতীতের সেই ঘটনা স্মরণ করে বললেন, জেনারেল ওয়েজম্যান আমার কাছে এসে আমাকে বাহবা দিলেন। তারপর বললেন, তুমি আবার

কোনো চালাকি কর না। মিগটি নিয়ে আবার ফিরে এস। সাপিরা আরও বলেছেন, বিমানটি চালিয়ে ফিরে আসার পর পাইলট মুনীরও আমাকে বাহবা দেন। তিনি আমাকে যখন জড়িয়ে ধরেন তখন তার চোখ দিয়ে পানি ঝরছিল। তিনি আরও বললেন, ইসরাইলি বাহিনীতে আমার মতো পাইলট থাকলে আরবরা কিছুই করতে পারবে না।

মিগ টুয়েন্টি ওয়ান ব্যাপকভাবে চালানো ও পরীক্ষার পর ইসরাইলি বিশেষজ্ঞরা বুঝলেন, কেন পশ্চিমারা এরকম একটি বিমান পাওয়ার জন্য ব্যাগ্র। এর বিস্ময়কর বিশেষত্ব হল এটি দ্রুতগতি সম্পন্ন, ওড়ে আংশিক উঁচু দিয়ে এবং ইসরাইলি মিরেজ দুই ও ফরাসি যুদ্ধ বিমানের চেয়ে ওজন এক টন কম।

মিগ টুয়েন্টি ওয়ান আকাশে ওড়ানোর মাধ্যমে ইসরাইল আবার বিশ্বের গণমাধ্যমে বিস্ফোরণ ঘটাল। মার্কিনীরা বিস্মিত। কয়েকদিন পরে মার্কিন একটি কারিগরি প্রতিনিধি দল বিমানটি পরীক্ষা এবং আকাশে উড্ডয়ন করে। মার্কিনীদের মিগের কাছে যাওয়ার আগে ইসরাইল একটা শর্ত দেয়। আর তা হল সোভিয়েত এয়ারক্রাফট ক্ষেপণাস্ত্র সাম-২ এর কাগজপত্রের কপি আগে তাদেরকে মার্কিনীদের দিতে হবে। আমেরিকানরা অবশেষে রাজি হয়। মার্কিন পাইলট ইসরাইলে আসেন, আতিপাতি করে পরীক্ষা করেন এবং সেটি চালিয়ে দেখেন।

মিগ টুয়েন্টি ওয়ানের গোপন রহস্য ও শক্তি উদঘাটনের মাধ্যমে আরবদের বিরুদ্ধে ৬ দিনের যুদ্ধে ইসরাইল ব্যাপক সাফল্য লাভ করে। যুদ্ধ হয় ১৯৬৭ সালের জুনে। মিগটি পাওয়া গিয়েছিল এর দশ মাস আগে। আর ঐ যুদ্ধের প্রস্তুতি ও সফল পরিকল্পনার নেপথ্যে ছিল মিগ টুয়েন্টি ওয়ান। উল্লেখ্য, কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে ইসরাইল আলোচ্য মিগের সাহায্যে মিসরের বিমান বাহিনীকে প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছিল। বাকি পাঁচটি দেশেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল।

মিগ টুয়েন্টি ওয়ানের মাধ্যমে ব্যাপক জয়লাভের প্রেক্ষাপটে ইরাকী পাইলট মুনীর ও তার পরিবারকে ইসরাইল প্রভূত আর্থিক সাহায্য করেছিল। কিন্তু ইসরাইলে আসার পর মুনীরের জীবন বিষাদময় ও দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল।

মোসাদের একজন সিনিয়রের ভাষায়, একজন এজেন্টের জন্য দেশের বাইরে নতুন জীবন শুরু অলমোস্ট ইমপসিবল। মুনীর দিনে দিনে হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন। ফলে তার পরিবারও ভোগান্তিতে পড়ে। আর পুরো পরিবারের কাঠামোই ভেঙে পড়ে।

তিন বছর পরেও মুনীর ইসরাইলকে তার নিজ দেশ ভাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ডাকোটার বিমানে করে ইসরাইলি তেল সিনাই পৌছে দেয়ার কাজও তিনি নিয়েছিলেন। তার পরিবার ইরানি শরণার্থী হিসেবে তেলআবিবেই বসবাস করছিল। কিন্তু মুনীরের স্ত্রী নিষ্ঠাবতী ক্যাথোলিক হিসেবে বন্ধুত্ব গড়ার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছিলেন। বলতে গেলে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করতেন তিনি। ইসরাইলে তিনি কোনোভাবেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলেন না। পরবর্তীতে জাল পরিচয়ে তারা পশ্চিমা দেশে চলে যান। আত্মীয়-স্বজনকে পর্যন্ত তাদের ঠিকানা দেয়া হয়নি। যদিও তাদেরকে প্রভূত নিরাপত্তা দেয়া হয়েছিল। তবুও তারা সব সময় ইরাকী গোয়েন্দা বাহিনী মুখাভারতের ভয়ে তটস্থ থাকতেন।

ঘটনার ২২ বছর পর ১৯৮৮ সালের আগস্টে নিজ বাড়িতেই আকস্মিক হার্ট এ্যাটাকে ইরাকী পাইলট মুনীর মারা যান। স্বামীর মৃত্যুর পর মুনীরের স্ত্রী মেইর অমিতকে ফোন করেন। অমিত আর তখন মোসাদের প্রধান নন। মুনীরের স্ত্রী জানান, তার স্বামীর মৃত্যুর সময় তার এক ছেলে পাশেই দাঁড়ানো ছিল। সকাল বেলা তার স্বামী তাদের বাড়ির তিন তলা থেকে নামার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা যান।

মুনীরের মৃত্যুর পর মোসাদ এক শোকসভার আয়োজন করে। শোকসভায় সিনিয়র কর্মকর্তারা কেঁদে ফেলেন। লিরন বলেন, ইরাকী এক পাইলটের জন্য ইসরাইলের মোসাদ বাহিনী আজ কাঁদছে।

মিগ টুয়েন্টি ওয়ান অধিগত হওয়া ও ছয় আরব দেশের বিরুদ্ধে ইসরাইলের একক যুদ্ধে জয়লাভের পর মোসাদ-প্রধান অমিত আরও উজ্জীবিত হয়ে নতুন এক অভিযানের পরিকল্পনা করেন। যুদ্ধবন্দী হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিত ল্যাভন এফেয়ার্সের আদলে তিনি ইসরাইলের কয়েকজন বন্দীকে দেশে আনার পরিকল্পনা করেন। তরুণ ল্যাভন ১৩ বছর ধরে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে জেলে পচছিল। তার মুক্তি কিম্বা ক্ষমা প্রাপ্তির কোনো আশাই ছিল না।

আরব দেশের সঙ্গে যুদ্ধে ইসরাইল ছিল মিসরের তুলনায় সুবিধাজনক অবস্থানে। ঐ যুদ্ধে মিসরের ৪ হাজার ৩৩৮ জন মিসরীয় সৈন্য ইসরাইলের হাতে বন্দী ছিল। ৮৩০ জন বেসমারিক মিসরীয় নাগরিকও বন্দী ছিল। ওদিকে মাত্র ১১জন ইসরাইলি সৈন্য মিসরের হাতে বন্দী ছিল। এক্ষেত্রে অমিত লেভন ফর্মূলায় তাদেরকে মুক্ত করার উদ্যোগ নিলে মিসর দৃঢ়তার সঙ্গে তার বিরোধিতা করে।

কিন্তু মেইর অমিত ছিলেন নাছোড়বান্দা। ইসরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোশে

দায়ান অমিতের ভালো বন্ধু। তিনিও অমিতকে বললেন, মিসরীয়রা কখনোই তাদের মুক্তি দেবে না। প্রধানমন্ত্রী এসকোলেরও অনুরূপ অভিমত। অমিত প্রেসিডেন্ট নাসেরকে ব্যক্তিগতভাবে একটা চিঠি লিখলেন। এবং বন্দীদের মুক্তি দাবি করলেন।

অমিত সিরিয়ায় বন্দী ইসরাইলি মোসাদের জন্যও কাজ শুরু করলেন।

লেবাননে বন্দী মিসেস সুলা কোহেনকে মুক্ত করতে তিনি সিরিয়র সহযোগিতা চাইলেন। সুলার কোড নাম পার্ল। তিনি মোসাদের একজন প্রবাদ প্রতিম গোয়েন্দা। একজন সামান্য গৃহবধূ হওয়া সত্ত্বেও সিরিয় ও লেবাননের বিখ্যাত নেতা ও ব্যক্তিদের সঙ্গে তার ব্যাপক যোগাযোগ ও সম্পর্ক ছিল। তিনি ইসরাইলের একটা গোয়েন্দা চক্র সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করেছেন। তার বড় ধরনের একটা সাফল্য হল সিরিয় ও লেবাননের কয়েক হাজার ইহুদিকে তিনি চোরাগুপ্তা পথে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মেইর অমিত প্রেসিডেন্ট নাসেরের কাছে যে আবেদন করেছিলেন তা কাজে এসেছিল। সিরিয়ও কিছু দিনের মাথায় অনুরূপ আবেদনে সাড়া দিলে অমিতের জয় হয়। লুভন ফর্মূলা প্রয়োগ করে অমিত লুটজ, সুলা কোহেনকে ইসরাইলে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন।

বিদেশে থাকা বন্দীদের নিজ দেশে ফিরিয়ে আনতে সাফল্য লাভ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এবং অবশ্যই বড় ধরনের অভিযান।

ইরাকে ফাঁসির মঞ্চে ইসরাইলি গোয়েন্দা

ইসার বেরী 'বিগ ইসার' নামেই সমধিক পরিচিত। তিনি বেশ লম্বা, তবে চুল তেমন নেই এবং তা সাদা কালো। তার কালো ভ্রূ কোটরাগত চোখ দুটিকে ঢেকে রাখে। তার তিক্ত বা ঘৃণাপূর্ণ হাসি প্রায়শই তার পাতলা ঠোঁটে খেলা করে। পোল্যান্ডে জন্মগ্রহণকারী ইসার বেরী আবার যেমন সৌন্দর্য প্রিয়, তেমনি তার ইন্টেরগ্রেটিও ত্রুটিমুক্ত। তার প্রতিপক্ষের ভাষ্য, লোকটি এককথায় ভয়ংকর। হাগানার দীর্ঘদিনের সদস্য ইসার বেরী হাইফার একটি প্রাইভেট কনস্ট্রাকশন কোম্পানির পরিচালক ছিলেন। অসামাজিক, নিঃসঙ্গ এবং চুপচাপ স্বভাবের ইসার বেরী স্ত্রী, ছেলেকে নিয়ে চারদিক খোলা একটা বাড়িতে বসবাস করতেন। বাট গালিমের একটি উপকূলীয় এলাকায় তার বাড়িটি অবস্থিত।

ইসরাইল রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পূর্বে হাগানার কমান্ডাররা তাকে সাই-এর প্রধান পদে নিয়োগ দেন। ইসরাইল ১৯৪৮ সালের ১৪ মে স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

স্বাধীনতা ঘোষণার পর পরই চারদিকের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো ইসরাইলকে আক্রমণ করে। এই সময় সদ্য স্বাধীন ইসরাইলের সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান পদে নিয়োগ লাভ করেন। তার রাজনৈতিক যোগাযোগ ছিল ঈর্ষণীয়। শ্রমিক আন্দোলনে সম্পৃক্ত বামপন্থীদের সংগঠনে তিনি বেশ সক্রিয় ছিলেন। তার বন্ধুরা ইসরাইলের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে ইসার বেরীর উৎসর্গিত মনোভাবের খুব প্রশংসা করতেন। তবে সিক্রেট সার্ভিসের প্রধান হওয়ার পর বেরীর কার্যকালে একের পর এক রহস্যজনক ঘটনা ঘটতে শুরু করে।

মাউন্ট কারবেলে এক দম্পতি ভয়াবহ একটি ঘটনা উদঘাটন করে। এই দম্পতি পাহাড়ের পাদদেশে অর্ধদগ্ধ লাশ দেখতে পায়। লাশের শরীরটি গুলিতে ঝাঝরা হয়ে ছিল। পরে তার নাম জানা যায় আলি কাসেম। কাসেম আরব দেশগুলোকে নানা তথ্যাদি সরবরাহ করতেন। প্রথমে আততায়ীরা তাকে গুলি করে অতঃপর পুড়ে ফেলার চেষ্টা করে।

ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেন গুরিয়নের সঙ্গে কয়েক সপ্তাহ পরে এক গোপন বৈঠকে আইসার প্রধানমন্ত্রীরই দলের লোক আব্বা হুশিকে একটি ঘটনায় অভিযুক্ত করেন। আব্বা হুশি ছিলেন মাপাই দলের প্রভাবশালী নেতা। তাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও ব্রিটিশ গুপ্তচর হিসেবে কাজ করার অভিযোগ আনে ইসার বেরী। প্রধানমন্ত্রী বেন গুরিয়ন একথা শুনে স্তম্ভিত। ফিলিস্তিনিদের শাসক ছিল ব্রিটিশরা। ইসরাইলের রাষ্ট্র হিসেবে অভ্যুদয়ের পর ব্রিটিশ শাসনের অবসান

ঘটে। ব্রিটিশ গোয়েন্দারা ইহুদি নেতৃত্বের মধ্যে তাদের চর হিসেবে নিয়োগদানের চেষ্টা করে। কিন্তু প্রশ্ন হল, হাইফার শ্রমিকদের মধ্যে ক্যারিশম্যাটিক নেতা হিসেবে পরিচিত।

ইহুদি সম্প্রদায়ের একটা স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত আব্বা হুশি কী করে একজন রাষ্ট্রদ্রোহী হন? এটা যে অবিশ্বাস্য। প্রথমে ইসরাইলের নেতারা ক্রোধ ভরে বেরীর এই অভিযোগ বাতিল করে দেন। কিন্তু আব্বা হুশির কাছে পাঠানো ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের দুটি টেলিগ্রাম হস্তগত হয় বেরীর। সে দুটি টেলিগ্রাম তিনি প্রধানমন্ত্রীর টেবিলে জমা দেন। আব্বা হুশির বিশ্বাসঘাতকতার আর কোনো প্রমাণের দরকার আছে কী!

বেরী এ সময় হুশির বন্ধু জুলেস আমস্টারকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। শহর থেকে কিছুটা দূরে লবণের গুদামে জুলেসকে ৭৬ দিন ধরে অমানুষিক নির্যাতন করা হয়। তার ওপর এই বলে চাপ প্রয়োগ করা হয় যে, আব্বা হুশি যে একজন ঘৃণিত রাষ্ট্রদ্রোহী একথা সে বলুক। জুলেস হার মানতে অস্বীকৃতি জানালে তাকে মুক্ত করে দেয়া হয়। মুক্ত অবস্থায় সে একজন বিধ্বস্ত মানুষে পরিণত হয়। তার দাঁত বলতে কিছুই ছিল না। তার পা ছিল আঘাতে আঘাতে ছিন্ন। জুলেস বহু বছর এই আতঙ্ক কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

১৯৪৮ সালের ৩০ জুন ইসরাইলি সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন মেয়ার টুবিয়ানস্কিকে গ্রেফতার করা হয়। সামরিক গোয়েন্দাদের অভিযোগ টুবিয়ানস্কি সামরিক বাহিনীর গোপনীয় তথ্যাদি এক ব্রিটিশ নাগরিককে সরবরাহ করে। ঐ ব্রিটিশ আবার এসব তথ্য জর্ডান সেনাবাহিনীর কাছে পাচার করে।

জর্ডান সামরিক বাহিনী ঐ তথ্যের ভিত্তিতে কৌশলগত এলাকায় বোমাবর্ষণ করলে ইসরাইলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। আধা ঘন্টারও কম সময়ে সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালত তাকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দেয়। তাৎক্ষণিকভাবে জড়ো হওয়া কিছু লোকও স্তম্ভিত; ইসরাইলি সৈন্যদের সামনেই টুবিয়ানস্কিকে ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলি করে হত্যা করা হয়।
উপরোক্ত দুটি ঘটনায় তদন্তকারীরা বেরীকে দোষী সাব্যস্ত করে।
বেরী মনে করেছিল আলি কাসেম ডাবল এজেন্ট। এ কারণেই তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল।

যাহোক এভাবে বেরীর অনেক দোষ বেরুতে থাকে। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেন গুরিয়েন অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করেন। বেরীর প্রথমে সামরিক আদালতে পরে বেসামরিক আদালতে বিচার হয়। তার র‍্যাঙ্ক নামিয়ে দেয়া হয়।

অসম্মানজনকভাবে আইডিএফ থেকে তাকে সরিয়ে দেয়া হয়। আলি কাসেম ও ক্যাপ্টেন টুবিয়ানস্কির মৃত্যুর জন্য তাকে দায়ী করা হয়। কুখ্যাত কেজিবির আদলে গোয়েন্দা বিভাগ পরিচালিত হতে দেখে ইসরাইলের নেতারা স্তম্ভিত হয়ে পড়েন।

বেরীকে অপসারণের পর তার স্থলাভিষিক্ত হন রেউভেন শিলোয়াহ। তিনি বেরীর বিপরীত মেরুর লোক। সিআলাহর বয়স ৪০। মৃদুভাষী ও রহস্যঘেরা একজন মানুষ। সমৃদ্ধ কালচার্ড ফ্যামিলি থেকে তার আগমন। পর্যবেক্ষণী ক্ষমতা তার ঈর্ষণীয়। মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে বিশেষ করে গোত্রগুলোর ঐতিহ্য, শত্রুতা এবং রক্তের ঋণ নিয়ে বিবাদ-বিসম্বাদ তার নখদর্পণে। শিলোয়াহ'র এক ভক্ত শিলোয়াহকে প্রধানমন্ত্রীর দাবা কোর্টের রানি বলে উল্লেখ করেন। রানির ক্ষমতা তো অপরিসীম। অবশ্য শিলোয়াহ যখন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন তখন তাকে অনেক কিছুই সামলাতে হয়েছে। এভাবে তার সম্পর্কে অনেকেই ভালো ভালো বিশেষণ ব্যবহার করেছেন। শিলোয়াহ সারাজীবনই খুব এ্যাকটিভ। সে সিক্রেট মিশনে হোক কিম্বা অন্য জটিল কোনো ক্ষেত্রে।

ইহুদিদের এক ধর্মযাজক বা ধর্মগুরুর ছেলে শিলোয়াহর জন্ম পুরনো জেরুজালেমে। ইসরাইলের জন্মের আগেই শিক্ষক ও সাংবাদিকদের ছদ্মবেশে তিনি ইরাকে কাটিয়েছেন সে দেশের রাজনীতি অনুধাবনের জন্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশদের সঙ্গে দেন-দরবার করে একটি ইহুদি কম্যান্ডো প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উদ্দেশ্য নাকি অধিকৃত ইউরোপে তাদের অভিযান ব্যর্থ করে দেয়া। তিনি এভাবে দুটি বিশেষ ইহুদি কম্যান্ডো বাহিনী গঠন করেন। এর মধ্যে একটি ছিল জার্মান অস্ত্রশস্ত্র ও তাদের ইউনিফর্মধারী জার্মান ব্যাটেলিয়ান। এই ইউনিট ইউরোপে শত্রুর বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি দু:সাহসিক অভিযান পরিচালনা করে। আরেকটি ছিল আরব ব্যাটালিয়ান। এই ইউনিটের সকলেই আরবি ভাষায় কথা বলত, আরবদের পোশাক পরত। আরব দেশসমূহের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাদের অভিযান পরিচালনারও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। শিলোয়াহ প্রথম ব্যক্তি যিনি স্ট্রাটেজিক সার্ভিসের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হন। এটিই সিআই-এর পূর্ববর্তী নাম। ইসরাইলের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় শিলোয়াহ প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রগুলোর রাজধানী গোপনে সফর করেন। আরব সেনাবাহিনীগুলো তাদের দেশে আগ্রাসন চালাবে সেই তথ্য নিয়ে তিনি ফিরে আসেন।

শিলোয়াহ অত্যন্ত গোপনীয় ভাবে তার গোয়েন্দা তৎপরতা চালাতেন। ফলে

অগণিত সোর্স যেমন তার ছিল তেমনি গোপন তথ্যের ভান্ডার ছিল তার নখদর্পণে। শিলোয়াহর এক বন্ধু একটা জোক বলেছিলেন। আহূত ট্যাক্সি ড্রাইভার শিলোয়াহকে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবেন। শিলোয়াহ তাকে বললেন, বলা যাবে না। এটা স্টেট সিক্রেট।

ইসরাইলের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় শিলোয়াহ বৈদেশিক রাজনৈতিক ইনফরমেশন বিভাগের প্রধান ছিলেন। একাধিক প্রায় বিচার বিভাগীয় স্বাধীন গোয়েন্দা গ্রুপ ইসরাইল প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু ১৯৪৯ সালের ১৩ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী বেন গুরিয়েন দেশের গোয়েন্দাবৃত্তিকে একটি সমন্বিত প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি ইনষ্টিটিউট গড়ার নির্দেশ জারি করেন। এই ইনষ্টিটিউটের হিব্রু নাম 'মোসাদ'। রেডভেন শিলোয়াহ মোসাদ-এর প্রথম প্রধান নিযুক্ত হন।

প্রকৃতপক্ষে মোসাদ প্রতিষ্ঠা আরও দু'বছর বিলম্বিত হয়। গোয়েন্দাদের একটি ইউনিয়নের কাজ ছিল বিদেশে অবস্থান করে কার্য পরিচালনা। এটিকে পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট বলা হত। এই বিভাগের লোকজন প্রচুর খরচ যেমন করতে পারত বিদেশে তাদের জীবন-যাপনও ছিল রাজকীয়। মোসাদ গঠনের প্রতিক্রিয়ায় তারা বিদ্রোহ করল। তারা ইসরাইলের পক্ষে গোয়েন্দাবৃত্তি করতে অস্বীকৃতি জানাল। তাদের ইউনিটের বিলুপ্তি ঘটতে যাচ্ছে এই হল ক্ষোভের কারণ। অবস্থা এমন দাঁড়াল, তাদের চাকরিচ্যুত না করলে এবং প্রায় নির্যাতনের মুখোমুখি করা না গেলে শিলোয়াহ'র পক্ষে মোসাদ গঠন অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

শিলোয়াহ'র দর্শন ছিল, মোসাদ শুধুমাত্র ইসরাইলের স্বার্থই দেখবে না। বিশ্বে যত ইহুদি রয়েছে তাদের স্বার্থ দেখার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল মোসাদ। প্রথম নিয়োগ পরীক্ষাকালে মোসাদ-প্রধান শিলোয়াহ স্পষ্টই তার বক্তৃতায় বলেন, যাবতীয় গোয়ন্দাগিরির পাশাপাশি আমাদের আরও একটা বড় দায়িত্ব রয়েছে। আর তা হল ইহুদি জনগোষ্ঠীকে রক্ষা। তারা পৃথিবীর যে প্রান্তেই বসবাস করুক না কেন, তাদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে তাদেরকে ইসরাইলের স্থায়ী বাসিন্দা করার উদ্যোগ নিতে হবে। উল্লেখ্য, পরবর্তী কয়েক বছরে দেখা গেছে মোসাদ এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বিশ্বের বহু দেশে ইহুদিরা অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্যে ছিল। তাদের আত্মরক্ষার জন্য মোসাদ গোপনে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। বিশেষ করে কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া, দামেস্ক, বাগদাদসহ দক্ষিণ আমেরিকার বহু দেশের ইহুদিরা যারপরনাই কষ্ট ও নিরাপত্তাহীনতায় বসবাস করত। তরুণ

মিলিট্যান্ট ইহুদিদের তাদের অজান্তেই ইসরাইলে ফিরিয়ে এনে প্রশিক্ষণ শেষে সেনাবাহিনী ও মোসাদে ভর্তি করা হল। শত্রু দেশকে অস্থিতিশীল করতে চোরাচালানের মাধ্যমে অস্ত্র সংগ্রহ করা হল। বিদেশে অবস্থানরত ইহুদিদের নিজেদের প্রতিরক্ষায় সংগঠিত করা হল। বিদেশে ইহুদি সম্প্রদায়ের নিরাপত্তায় বিশেষ করে দাঙ্গাকারী কিম্বা অনিয়মিত গ্রুপের হামলা প্রতিরোধে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করা হল। কেননা সরকারের সাহায্য না আসা পর্যন্ত কিম্বা বিদেশি সাহায্য সংস্থার হস্তক্ষেপ না হওয়া পর্যন্ত তাদের অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করল মোসাদ।

পঞ্চাশের দশকে আরবদেশসমূহ ও মরক্কো থেকে মোসাদ দশ হাজারের অধিক দূর্দশায় পতিত ইহুদিকে ইসরাইলে ফেরত নিয়ে এসেছে। একইভাবে আশির দশকে খোমেনীর ইরানে আটকাপড়া বহু ইহুদিকে মোসাদ ইসরাইলে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। ইথিওপিয়ার ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটেছিল। কিন্তু মোসাদের প্রথম গোয়েন্দাগিরি ইরাকে মহাবিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছিল।

ইরাকের রশীদ স্ট্রীটের বিশাল ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে আসাদ নামের এক লোকের একটা টাইয়ের দোকান ছিল। সে একজন ফিলিস্তিনী শরণার্থী। ইসরাইলি সেনাবাহিনী এক রাত্রে তাদের বাড়িঘর দখল করে নিলে সে দেশ ত্যাগ করে। ইসরাইল ত্যাগ করার কিছুদিন আগে সে তার অসুস্থ এক কাজিনের জন্য অনেকের সাহায্য কামনা করে। তার অসুস্থ কাজিনকে সামরিক গভর্নরের কম্পাউন্ডের কাছাকাছি অবস্থিত একটি রেস্তোরাঁয় ওয়েটারের কাজ দেয়। এক সপ্তাহের কাছাকাছি সময়ে আসাদ মিলিটারী গভর্নরের ভবনের বারান্দা দিয়ে হাঁটছিল। তার হাতে ছিল পিতলের অলঙ্কৃত ট্রে। ট্রেতে করে বেশ কয়েক কাপ কড়া টার্কিশ কফি সে ইসরাইলি আর্মি অফিসারদের মধ্যে পরিবেশন করছিল। এই তরুণ অফিসারদের মধ্যে বেশ কয়েকজন তার মুখ চেনা।

১৯৫১ সালের ২২ মে সে লক্ষ্য করল তার টাইয়ের দোকানের কাছাকাছি যারা ঘুরছে তাদের মধ্যকার একটি মুখ তার খুব চেনা। প্রথমে ভেবেছিল সে ভুল দেখেছে। কিন্তু যে মানুষটিকে সে দেখেছে তাকে এই পোশাকে সে কখনো দেখেনি। এখন এই লোকটির গায়ে গরম কালের পোশাক। কিন্তু আসাদ তাকে দেখেছে খাকি ইউনিফর্মে। আসাদ পুলিশকে বিষয়টি জানায়। পুলিশকে সে বলে, আমি এখনই বাগদাদে একজন ইসরাইলি আর্মি অফিসারকে দেখেছি। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় চেহারায় ঐ লোকটিকে গ্রেফতার করে। ঐ

লোকের সঙ্গে ছিল ইরাকী এক ইহুদি। তার নাম নিসিম মোশে। সে পুলিশকে জানায়, ইহুদিদের স্থানীয় কম্যুনিটি সেন্টারে সে ছোট্ট একটা চাকরি করে। সে ব্যাখ্যা করে বলে, গ্রেফতারকৃত পর্যটকের সঙ্গে একটা কনসার্টে গতকালই তার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। সেই বাগদাদের দোকানপাট আমাকে ঘুরে দেখাতে অনুরোধ করে।

বাগদাদের পুলিশ সদর দফতরে ওদের দু'জনকে নেয়া হলে এক পর্যায়ে আলাদা করে ফেলা হয়। ইরাকী গোয়েন্দারা মোশেকে নির্যাতনপূর্বক ইসরাইলি লোকটি সম্পর্কে জানতে চায়। কিন্তু মোশে অনড়। সে এক কথাই বলে যাচ্ছে; গতকালই ঐ ইসরাইলির সঙ্গে প্রথম আলাপ। পুলিশ সদর দফতরের গোপন নির্দেশে মোশেকে নির্যাতন করে প্রায় মেরে ফেলার উপক্রম করে। এমনকী তাকে হত্যার হুমকি দেয়া হয়। কিন্তু বন্দীর এক কথা। সে কিছু জানে না। এক সপ্তাহ ধরে প্রচন্ড মারধরের পরও কোনো কথা আদায় করতে না পেরে ইরাক সরকার তাকে মুক্তি দেয়।

অপর বন্দীরও একই কথা। তার নাম ইসমাইল সালহুন। সে ইরানি। সে প্রশাসনকে তার ইরানি পাসপোর্ট দেখায়। তারপরও অবশ্য নির্যাতন থামে না। তাকে নিয়ে সমস্যা হল সে দেখতে ইরানিদের মতো নয়।

ফারসী শব্দ সে বিন্দুমাত্র জানে না। অবশেষে শেষোক্ত বন্দীর সঙ্গে টাই বিক্রেতা আসাদকে মুখোমুখি করা হয়। আসাদকে দেখামাত্র আমার রক্ত হিমশীতল হয়ে পড়েছিল বলে দ্বিতীয় বন্দী পরে জানায়। দ্বিতীয় বন্দী ভেঙে পড়ে এবং স্বীকারোক্তি দেয়।

স্বীকারোক্তিতে সে তার নাম বলে ইয়েহুদী ট্যাগার। আইডিএফের একজন ক্যাপ্টেন। অবশ্যই ইসরাইলি নাগরিক। ইরাকী গোয়েন্দারা ট্যাগারের বাড়ি তছনছ করে। দেয়াল ফুটো করে। দেয়াল ভাঙ্গার পর গুপ্তভান্ডারে বহু ডকুমেন্ট পায়।

শুরু হয় প্রচন্ড আতঙ্কের। ট্যাগারই শুধু আতঙ্কগ্রস্ত নয়, বাগদাদের পুরো ইহুদি সম্প্রদায় অজানা আতঙ্কে কাঁপতে থাকে।

বেশ কিছু লুকিয়ে থাকা ইহুদি এবং বাগদাদে পরিচালিত ইসরাইলি সংগঠন ইরাকীদের তোপের মুখে পড়ে। অবৈধ ইমিগ্রেশন ইউনিট, আত্মরক্ষায় নিয়োজিত একটি গ্রুপ এবং জায়নবাদী বেশ কিছু তরুণ ইরাকীদের রোষানলে পড়ে। ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে গঠিত সংগঠনগুলোর মধ্যেও ভয়, ত্রাস।

প্রকৃতপক্ষে ইরাকের রাজধানী বাগদাদকে ঘিরে ইসরাইলিদের বহু অস্ত্র ভান্ডার ও দলিল ডকুমেন্ট গুপ্ত ভান্ডারে রক্ষিত ছিল। কিছু ইহুদিদের ধর্মস্থান মাসুদা সেমটভে। প্রকৃতপক্ষে ইরাকের ঘোরতর শত্রু হল ইসরাইল। ফলে ইরাকের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির চুক্তি করাও কারো পক্ষে সম্ভব নয়। ইরাকে অবস্থানরত ইসরাইলি গোপন সংগঠনের নেতারা ভালো করেই জানত ইরাক তাদেরকে ক্ষমা করার পাত্র নয়। ফাঁসি অবশ্যম্ভাবী।

প্রকৃতপক্ষে ট্যাগারকে ইসরাইল সরকার ভালো কাজেই ইরাকে পাঠিয়েছিলো। তাকে গোয়েন্দাদের মধ্যে যাবতীয় যোগাযোগ বন্ধ করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। ২৭ বছর বয়সী ট্যাগারের বিদেশ মিশন এই প্রথম। ট্যাগার ধরা পড়ার আগে বেশ কয়েকটি ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা ও গ্রুপের মধ্যকার যোগাযোগ নিষ্ক্রিয়ও করেছিল। কিন্তু কয়েকজন তার কথা শোনেনি। তারা ঠিকই নিজেদের মধ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছিল। এ দলের নেতৃত্বে ছিল প্রকৃতই ব্রিটিশ পাসপোর্টধারী পিটার ইয়ানিভ।

ইসরাইলের রাজধানী তেলআবিবের সঙ্গে ট্যাগারের যোগাযোগ হতো একজন শীর্ষ কমান্ডারের মাধ্যমে। তার পরিচয় সামান্য লোকই জানে। তার ছদ্মনাম যাকী হাভিভ। প্রকৃত নাম বেন পোরাত। ইরাকে জন্মগ্রহণকারী এক ইসরাইলি। ইসরাইলের মুক্তিযুদ্ধকালীন একজন অফিসার। বেন পোরাত ইরাকে কাজ নিতে অনাগ্রহী ছিল। আর্মিতে থাকাকালীন প্রেম হওয়া এক সহকর্মীকে বিয়ে করার জন্য সে ছিল মরিয়া। কিন্তু ইসরাইলের গোয়েন্দা বিভাগের চাপে তাকে ইরাকে বিপজ্জনক পোস্টিং নিতে হয়।

ট্যাগারকে গ্রেফতার ও জিজ্ঞাসাবাদকালে ইরাকে অবস্থানরত ইসরাইলের গোপন সংগঠনগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ইরাকী পুলিশ অসংখ্য ইহুদিকে গ্রেফতার করে এবং তাদের মধ্যে অনেকে দোষও স্বীকার করে। ইরাকী পুলিশ যেসব ডকুমেন্ট আটক করে তার মধ্যে প্রচুর গোয়েন্দা তথ্যও ছিল। ইহুদিদের প্রার্থনা স্থানের গোপন ভান্ডার থেকে প্রচুর অস্ত্র আটক করা হয়। বেশ কয়েক বছর ধরে এসব অস্ত্রশস্ত্র জমা করা হচ্ছিল। অস্ত্র জমা শুরু হয় ১৯৪১ সাল থেকে। তখন ১৭৯ জন ইহুদিকে হত্যা করা হয়, ২১১৮ জন আহত হয় এবং বহু নারী ধর্ষণের শিকার হয়। ধর্মশালা থেকে উদ্ধারকৃত অস্ত্র দেখে ইরাকীদের চক্ষু ছানাবড়া। এখানে ছিল ৪৩৬টি গ্রেনেড, ৩৩টি মেশিন পিস্তল, ১৬৮টি রিভলবার, ৯৭টি মেশিনগান চার্জার, ৩২টি কমান্ডো ড্যাগার এবং ২৫ হাজার গুলি।

ইরাকীদের হিংস্র ও ভয়ংকর প্রশ্নবানে একটি নাম বন্দীদের কাছ থেকে বারে বারে উচ্চারিত হতে থাকে। নামটি যাকী হাভিভ। আন্ডারগ্রাউন্ডের রহস্যজনক শীর্ষ ব্যক্তি।

কিন্তু কে এই যাকী হাভিভ? সে কোথায়? অবশেষে ইরাকী এক তরুণ গোয়েন্দা যাকীর পরিচয় কিছুটা উদঘাটনে সমর্থ হয়। তার নিশ্চিত বিশ্বাস যাকী হাভিভই নিসিম মোশে। এই মোশে ট্যাগারের সঙ্গে গ্রেফতার হয়েছিল। কিন্তু পরে তাকে মুক্তি দেয়া হয়। অসংখ্য গোয়েন্দা নিসিম মোশের বাড়ি ঘেরাও করেও তার সন্ধান পায়নি। সারা ইরাক জুড়ে তার তল্লাশী চলে কিন্তু যাকী হাভিভের কোনো হদিশ নেই। আসলে যাকী হাভিভ তখন ছিল জেলে। যা ইরাকী পুলিশের মাথাতেই আসেনি।

ট্যাগারের সঙ্গে গ্রেফতার হয়ে কয়েকদিন পর জেল থেকে মুক্তি পেয়ে একদিন সে বাড়ির গেটে ইরাক পুলিশের খুব হাঁক-ডাক শুনতে পায়। পুলিশ তাকে দরজা খুলতে বলে। বেন পোরাত মনে করে তার জীবনের এই শেষ। তার বাড়ির পেছন দিকে বেরুনোরও কোনো দরজা ছিল না। সে ভালো করেই জানত, তার পজিশনের কাউকে আটক করা মানে নিশ্চিত ফাঁসি।

ইরাকী পুলিশ জানায়, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ খুব গুরুতর নয়। কয়েক মাস আগে সে একটা সড়ক দুর্ঘটনা ঘটিয়েছিল। সেই মামলায় আদালতের সমন সে কয়েকবার অগ্রাহ্য করেছে। ইরাকী আদালতে এক ঘন্টার শুনানী শেষে বেন পোরাতকে দুই সপ্তাহের কারাবাস দেয়।

দুই সপ্তাহের দণ্ড শেষ না হওয়ার আগেই বেন পোরাতকে পুলিশ সদর দফতরে নেয়া হয় তার ছবি তোলা ও হাতের আঙ্গুলের ছাপ নেয়ার জন্য। সে ভালো করে জানত যদি এসব নেয়া হয় তাহলে সে মরেছে। তখন পুলিশ নিশ্চিতভাবেই সে যে যাকী হাভিভ তা শনাক্ত করতে পারবে। আর এবার তাকে দুই সপ্তাহের সামান্য জেল দেয়া হবে না।

সামান্য দূরের পুলিশ সদর দফতরে দু'জন গার্ডের সঙ্গে বেন পোরাত ওরফে যাকী হাভিভ বাগদাদের রাস্তা দিয়ে হেঁটেই যাচ্ছিল। গলি ঘুপচির মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় সে ভাবল পালানোর এটাই তার সেরা সময়। যাকী হাভিভ দুই পুলিশকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। দুই পুলিশ তাকে বাধাও দেয়নি। কেননা মামলাটি তেমন গুরুতর নয়। হয়তো ঘন্টাখানেকের মধ্যেই সে ছাড়া পাবে। অতএব দুঃশ্চিন্তার কিছু নেই।

ইরাকী দুই পুলিশ যখন সিনিয়রদের কাছে গেল তারা বড় ধরনের ধমক খেল। ইরাকের কাছে মোস্ট ওয়ান্টেড মানুষটিকে তারা ছেড়ে দিল। ইরাকের বিরোধী দলের পত্রিকাগুলোর হেডলাইন কোথায় যাকী হাভিভ? আরেকটি পত্রিকা লিখল যাকী হাভিভ এখন তেলআবিবে।

এদিকে তেলআবিবে যাকী হাভিভের গোয়েন্দা বসরা নিখুঁতভাবে পরিকল্পনা করে রেখেছে, কীভাবে সে ইরাক থেকে পালাবে। সে অনুযায়ী পরিকল্পনাও চূড়ান্ত হয়। ঐ সময় ইরাক থেকে হাজার হাজার ইহুদিদের সাইপ্রাস হয়ে ইসরাইলে নিয়ে আসা হচ্ছিল। এক লক্ষ ইহুদি তখন ইরাক থেকে প্লেনযোগে ইসরাইলে আসে। প্রতি রাত্রেই বিমানে করে তাদের আনা হতো।

১২ জুন রাতে বেন পোরাত ওরফে যাকী হাভিভ সুন্দর পোশাক পরে একটি ট্যাক্সি ভাড়া করে। তার বন্ধুরা তাকে প্রচুর পরিমাণে লোকাল মদ খাওয়ায়। ট্যাক্সির পেছনের আসনে সে বেহুশ হয়ে পড়ে এবং ঘুমের ছল করে। ট্যাক্সির ড্রাইভার তাকে বাগদাদ বিমান বন্দরের কাছে একটি জায়গায় রেখে যায়। একাকী বেন পোরাত ওরফে যাকী হাভিভ বিমান বন্দরের কাঁটাতার ভেদ করে ভেতরে চলে যায়। সে জানত, কাঁটাতার কোনো জায়গায় কাটা আছে। এদিকে টারমাকে একটি প্লেন দেশত্যাগীদের নিয়ে রানওয়ে চলতে শুরু করে। কন্ট্রোল টাওয়ারের নির্দেশ মোতাবেক প্লেনটি শক্তি সঞ্চয় করে গতি বাড়িয়ে দেয়। বিমানটি দশ ফুট উঁচুতে উঠে গেছে। ঠিক এসময়ই একটি ঝুলন্ত রশি ঝুলতে দেখা যায় প্লেনের। অন্ধকার থেকে খুব দ্রুত বেরিয়ে পোরাত ওরফে যাকী হাভিভ ঐ দড়িটি ধরে ফেলে। তাকে প্লেনে তুলে নেয়া হয়। এবং প্লেনটি ওড়ার জন্য ভূমিত্যাগ করে। বিমানবন্দরে দায়িত্বরত এবং কোনো যাত্রীই জানতে পারল না কীভাবে একজন যাত্রীকে প্লেনে নিয়ে যাওয়া হল। এ্যাকশন মুভিতে যেমনটা দেখা যায় ঠিক তেমনটাই ঘটল বেন পোরাত তথা যাকী হাভিভের ক্ষেত্রে।

বাগদাদের ওপর দিয়ে প্লেনটি ওড়ার সময় ছাদে দাঁড়ানো অনেকেই ঈশ্বরের প্রশংসা করল। প্রশংসার কারণ তাদের বন্ধুর যাত্রা নিরাপদ হোক। আর বন্ধুটি হল বেন পোরাত ওরফে যাকী হাভিভ।

এর কয়েক ঘণ্টা পরেই যাকি হাভিভ ইসরাইলে পৌঁছে গেল। ইসরাইলে পৌঁছে যাকি হাভিভ তার সুইট হার্টকে বিয়ে করে। সে রাজনীতিতে নেমে সফল হয়। এমপি হয়, মন্ত্রী হয়। বর্তমানে ইসরাইলের ইরাকী ইহুদিদের কাছে সে একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব।

ইরাকে আটকে পড়া ইহুদিদের ভাগ্য সুপ্রসন ছিল না। গ্রেফতারকৃত অসংখ্য ইহুদিকে বেদম মারধর করা হয়। ট্যাগারসহ ২২ জনকে অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য কঠিন সাজা দেয়া হয়। অস্ত্র ও বিস্ফোরক বহনের জন্য দু'জন সুপরিচিত বাগদাদের ইহুদি সালোম সালাচ ও যোশেফ বাটজরিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

ট্যাগারকে একদিন জেলের মধ্যে মধ্যরাতে ঘুম থেকে জাগান হয়। তার সেলের মধ্যে তখন অসংখ্য পুলিশ। প্রধান তদন্তকারী ট্যাগারকে বললেন, আজ রাত্রে তোমার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে। ট্যাগারের বিচারকার্য এখনো শেষ হয়নি। ট্যাগার তাদের বলল, বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা ফাঁসি দিতে পার না।

ট্যাগারকে বলা হল, আমরা পারি না মানে? আমরা তোমার সব অতীত কর্মকাণ্ড জেনে গেছি। তুমি একজন ইসরাইলি অফিসার। একজন গোয়েন্দা।

ইহুদিদের একজন ধর্মগুরু এসে ট্যাগারের পাশে বসলেন। ট্যাগারকে তিনি স্তোস্ত বা প্রার্থনা সংগীত শোনালেন। শেষ রাত সাড়ে তিনটায় ট্যাগারকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের চেম্বারে নিয়ে যাওয়া হল। ট্যাগারের মনে পড়ে গেল, মাত্র এক সপ্তাহ আগে সে জেরুজালেমে পরিবারের সঙ্গে কাটিয়েছে। বাগদাদে আসার আগে কিছু সময় সে প্যারিস ও রোমে ছুটি কাটিয়েছে। আর এখন দড়িতে ঝুলতে হবে।

ইরাকী কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ফর্মে ট্যাগারের সই নিল। জল্লাদ তার ঘড়ি ও আংটি নিয়ে নিল। ট্যাগার দাবি করল, তার লাশ যেন ইসরাইলে পাঠানো হয়। জল্লাদ ট্যাগারকে একটি ফাঁসির দরজায় দাঁড় করালো। তার পায়ে বালুর বস্তা বাঁধা হল। ট্যাগারের মাথায় একটা যমটুপি পরাতে চাইলে সে বাধা দেয়। আয়োজন সব শেষ হলে জল্লাদের দৃষ্টি এখন কমান্ডিং অফিসারের দিকে। এ সময়ও আরও অনেক অফিসার উপস্থিত ছিলেন। মৃত্যুপথযাত্রী একজন মানুষটাকে সবাই দেখছিল। ট্যাগার তার পরিবারের লোকদের কথা ভাবছিল। ভাবছিল জেরুজালেমের কথা। সেখানে থাকলে তার জীবনটা কেমন হতো। সে এও ভাবছিল তার মুন্ডুটা কী দেহ থেকে আলাদা হয়ে যাবে।

হঠাৎ করেই কমান্ডিং অফিসার উঠে চলে যান। ট্যাগারকে মৃত্যুকূপ থেকে সরিয়ে আনা হল। তার পায়ের বালুর বস্তা খুলে ফেলা হল। জল্লাদ বলল, আজ রাত্রে সে যে পরিশ্রমিক বা সম্মানী পেত তা আর পাওয়া যাবে না।
ট্যাগার বুঝল, তাকে এই দফায় আর মরতে হচ্ছে না। ট্যাগারকে বিচারে

প্রথমে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। পরে তার দণ্ড কমিয়ে তাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেয়া হয়। বাটজরি ও সালাহকে ফাঁসি দেয়া হয়।

ইয়োককে যে করেই হোক বেঁচে যাওয়ার আয়োজনও করেছিল ইরাকের জেলাররা। রাজনৈতিক বন্দীরা, আততায়ীরা সকলেই বুঝতে পারল ইয়োককে বন্দী অবস্থায় মরতে হবে না। একদিন সে মুক্ত হয়ে যাবে।

ট্যাগারকে ৯ বছর ইরাকের জেলে কাটাতে হয়। ১৯৫৮ সালে জেনারেল আব্দুল করিম কাসেম অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ইরাকে ক্ষমতা দখল করেন। তিনি ইরাকী প্রধানমন্ত্রী ও রাজকীয় পরিবারের বহু লোককে হত্যা করেন। ক্ষমতাগ্রহণের দু'বছর পর জেনারেল কাসেমের ঘনিষ্ঠ কিছু লোক তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। অবশ্য কয়েক বছর পরে তাদের সে চেষ্টা সফল হয়। যাহোক, জেনারেল কাসেমকে হত্যা চেষ্টার খবর টের পায় মোসাদ। মোসাদ-প্রধান সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল কাসেমের ঘনিষ্ঠ লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। মোসাদ এবং জেনারেল কাসেমের লোকদের মধ্যে একটা সমঝোতা হয়। সমঝোতাটি হল, জেনারেল কাসেমকে যারা হত্যা করতে চায় মোসাদ তাদের নাম দেবে বিনিময়ে ট্যাগারকে জেল থেকে মুক্তি দিতে হবে। জেলে ট্যাগারের কাছে জেলার গেলেন। তাকে কয়েদীর পোশাক ছেড়ে অন্য পোশাক পরতে দেয়া হল। জেলার বললেন, আপনাকে এখন বাগদাদ যেতে হবে।

পুলিশের একটি গাড়িতে ট্যাগারকে তোলা হল। এতসব আয়োজন দেখে ট্যাগার স্তম্ভিত। ট্যাগারকে নেয়া হল রাজকীয় প্রাসাদে। সৈন্যরা তাকে এসকর্ট করে বিশাল এক অফিসে নিয়ে গেল। সুদৃশ্য একটি টেবিলে ট্যাগার একটি পরিচিত মুখ দেখতে পেল। ইনি ইরাকের বর্তমান প্রেসিডেন্ট– জেনারেল কাসেম। ট্যাগার হঠাৎ করেই বুঝল, তাকে আসলে ছেড়ে দেয়া হবে। এদিকে জেনারেল কাসেম এই ইসরাইলির মুখটা পর্যবেক্ষণ করছিলেন।

এক পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট কাসেম ট্যাগারকে জিজ্ঞেস করলেন, ইরাক ও ইসরাইলের মধ্যে যদি যুদ্ধ লেগে যায়, তাহলে তুমি কী আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে? ট্যাগার উত্তর দিল, আমি যখন দেশে ফিরে যাব তখন ইসরাইল ও আরব দেশগুলোর মধ্যে শান্তি ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠায় আমি কাজ করব। আর যদি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় আমি নিশ্চিতভাবে ইসরালের পক্ষে যুদ্ধ করব। আপনি যেভাবে নিজ দেশের হয়ে বহু যুদ্ধ করেছেন।

জেনারেল কাসেমের ট্যাগারের এই উত্তর ভালো লাগার কথা। প্রেসিডেন্ট কাসেম আসন ছেড়ে দাঁড়ালেন। বললেন, দেশে গিয়ে তোমার লোকদের বলবে

যে, ইরাক এখন একটা স্বাধীন দেশ। আমরা আজ আর সাম্রাজ্যবাদের দালাল নই।

রাজকীয় প্রাসাদ থেকে একটি গাড়ি ট্যাগারকে বিমান বন্দরে নিয়ে গেল। বৈরুতের একটি বিমানে তুলে দেয়া হল ট্যাগারকে। বৈরুত, নিকোসিয়া, সাইপ্রাস হয়ে অবশেষে ইসরাইলে গিয়ে পৌঁছল ট্যাগার।

বিমানবন্দরে ট্যাগারের সহকর্মী, বন্ধুরা উপস্থিত ছিল। তাদের ধারণা ছিল বিধ্বস্ত এক ট্যাগারকে দেখবে তারা। কিন্তু জীবন্মৃত ট্যাগারকে দেখার পরিবর্তে তারা দেখল তেজস্বী, সমঝদার, মিশুক ও হাসি মুখের ট্যাগারকে। গত নয় বছরে একই রকম আছে ট্যাগার।

ট্যাগারকে দেশে ফিরিয়ে আনার পর মোসাদ-প্রধান শিলোয়াহ বলেন, যে কোনো মূল্যে আমাদের বিপদাপন্ন লোকগুলোকে ফিরিয়ে আনাই আমাদের মূল লক্ষ্য।

ইসরাইলে ফিরে ট্যাগার বিয়ে করে। বিদেশে কূটনৈতিক হিসেবে সাফল্য লাভ করে এবং অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর হিসেবে যোগ দেয়।

রেড প্রিন্সের সন্ধানে

ইসরাইলি খেলোয়াড় ও এথলেটরা জার্মানিতে এসেছিলেন অলিম্পিক গেমসে অংশ নিতে। ১৯৭২ সালের ৫ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ৪টায় ৮জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী মুখোশ পরে জার্মানির মিউনিখে ইসরাইলি খেলোয়াড়দের ফ্ল্যাটে ঢুকে মুষ্টিযুদ্ধের কোচ মোশে উইনবার্গ ও ওয়েট লিফটিং চ্যাম্পিয়ান যোয়ে রোমানোকে হত্যা করে। তারা সন্ত্রাসীদের ফ্ল্যাটে ঢুকতে বাধা দিয়েছিলেন। ইসরাইলি এথলেটদের কয়েকজন গুলির শব্দে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও সন্ত্রাসীরা ৯জনকে জিম্মি করে।

জার্মান পুলিশ, সাংবাদিক, টিভি সকলেই দৌড়ে আসে এবং সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা এই প্রথম বারের মতো বিশ্বজুড়ে টিভিতে সরাসরি প্রচারিত হয়। ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মেয়ারকে ঘুম থেকে জাগান তার সামরিক এ্যাডজুটেন্ট। গোল্ডা মেয়ার পড়ে গেলেন ফাঁদে। ঘটনাস্থল জার্মানি একটি বন্ধুপ্রতীম দেশ। জিম্মি উদ্ধারের দায়িত্বও জার্মানির। ইসরাইল তাদের সেরা কমান্ডো ইউনিট সায়েরেত মাটকালকে জিম্মি উদ্ধারে পাঠাতে চাইলেও জার্মানির বেভারিয়া রাজ্য সরকার ভদ্রভাবে এতে আপত্তি জানায়। বেভারিয়াতেই সেবার অলিম্পিকের অনুষ্ঠানাদি হচ্ছিল। ইসরাইল সরকারকে জার্মান প্রশাসনের ভাষ্য, আপনাদের উদ্বেগের কোনো কারণ নেই। আমরাই সকল জিম্মিকে মুক্ত করব। সমস্যা হল জিম্মি উদ্ধারে যে অভিজ্ঞতা, সৃজনশীলতা এবং সাহসিকতার প্রয়োজন জার্মান সরকারের তাতে ঘাটতি ছিল। বিশেষ করে এমন একটি ধূর্ত সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে কাবু করার ক্ষেত্রে।

জার্মান কর্তৃপক্ষ ও সন্ত্রাসীদের মধ্যে সারাদিন ধরে আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক চলতে থাকে এবং এক পর্যায়ে সন্ত্রাসী ও জিম্মিদের মিউনিখের বাইরে ফুরস্টেন ফ্রেল্ডব্রাক বিমান বন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়।

জার্মান সরকার তাদেরকে একটি বিমান দিতে চায় যাতে চড়ে তারা যেখানে খুশী যেতে পারবে। কিন্তু জার্মান পুলিশ বিমান বন্দরকে ঘিরে যে আয়োজন করেছে তাতে বিন্দুমাত্র পেশাদারী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। জার্মানি বিমান বন্দরের মাঝখানে একটি বিমান এনে রাখলেও তাতে কোনো পাইলট বা ক্রু ছিল না। আবার বিমান বন্দরের ছাদে অদক্ষ শার্পসুটারদের জড়ো করে রাখা হয়। সন্ত্রাসী চক্রের নেতা প্লেনটি পরিদর্শনে এসে দেখে যে, বিমানটিতে কোনো ক্রুতো নেইই ইঞ্জিনও ঠাণ্ডা হয়ে আছে। এহেন বিমান চালু করে উড়ে যেতে কত সময় লাগবে? সন্ত্রাসীরা মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারে তাদের সঙ্গে প্রতারণা

করা হচ্ছে। ফলে তারা হ্যান্ড গ্রেনেড ছুঁড়তে ও গুলি করতে শুরু করে। জার্মান পুলিশের সঙ্গে গুলি বিনিময়ের শুরুতেই ইসরাইলের সকল জিম্মিকে তারা হত্যা করে। নিহত হয় একজন জার্মান পুলিশও। ৮ সন্ত্রাসীর মধ্যে পাঁচজন নিহত হয়। তিন সন্ত্রাসীকে আটক করা সম্ভব হলেও কিছুদিনের মধ্যেই তাদের ছেড়ে দেয়া হয়। কেননা এই সন্ত্রাসী ঘটনার কিছুদিন পরে একটি লুফথানসা বিমান ছিনতাই হয়। ধারণা করা হয় ঐ সময় শর্তাধীনে আটক তিন সন্ত্রাসীকে মুক্ত করে দেয়া হয়।

ইসরাইলি জেনারেল জভি জামির সবেমাত্র ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান হয়েছেন। তাকে অসহায়ের মতো তার দেশের লোকদের নিহত হওয়ার মতো ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে হল। ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে তিনি জার্মানিতে উড়ে এসেছিলেন এবং উক্ত বিমান বন্দরের কন্ট্রোল টাওয়ারে অবস্থান নিয়েছিলেন। জার্মানি পরিচালিত অভিযানে তার কোনো হস্তক্ষেপের সুযোগ ছিল না। তদুপরি জার্মান সরকার পুনঃপুনঃ বলছে যে, তাদের উদ্ধারাভিযান এক্সেলেন্ট। মোসাদ-প্রধান উপলব্ধি করলেন, তাদের দেশের এক নতুন শত্রুর অভ্যুদয় ঘটেছে। এটি একটি সন্ত্রাসী সংগঠন এবং তারা নিজেদেরকে 'ব্লাক সেপ্টেম্বর' বলে পরিচয় দেয়।

ব্লাক সেপ্টেম্বর নামকরণের পেছনে রয়েছে ফিলিস্তিনিদের জন্য একটি দু:খজনক ঘটনা। এ মাসে জর্ডানের বাদশা হোসেন তার দেশে কয়েক হাজার ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেন। ১৯৬৭ সালে ইসরাইলের সঙ্গে ছয়দিনের যুদ্ধ শেষে ইসরাইলের ভাষায় বহু সন্ত্রাসী জর্ডানের রাজধানী আম্মান, শহরতলী এলাকা এমনকী গ্রামে পর্যন্ত তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ইসরাইল সীমান্ত এসব তথাকথিত সন্ত্রাসীদের বিশেষ ঘাঁটিতে পরিণত হয় এবং প্রকাশ্যে তারা অস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করত। তারা জর্ডানের বাদশাহর কর্তৃত্ব অস্বীকার করে এবং ক্রমান্বয়ে সে দেশের শাসনকর্তায় পরিণত হয়। বাদশাহ এসব জানলেও কোনো পদক্ষেপ নেননি। বাদশাহ একদিন আর্মি ক্যাম্প পরিদর্শনে গিয়ে দেখলেন, ট্যাঙ্কের এ্যান্টেনায় একটি ব্রেসিয়ার ঝুলছে। ক্রুদ্ধ বাদশাহর প্রশ্ন, ওটা কী?

ট্যাঙ্কের পুরুষ কমান্ডার বললেন, ব্রেসিয়ার ঝোলানোর অর্থ হল আমরা পুরুষ নই, নারী। আপনি আমাদের তো আর যুদ্ধ করতে দিচ্ছেন না। বাদশাহ হোসেনের মনে হল বালিয়ারিতে তিনি তার মাথা ঢুকিয়ে দেন। নিজ দেশ তার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে ভেবে ১৯৭০ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসীদের ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিতে তিনি সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিলেন।

বাদশাহ্ হোসেনের এই কঠোর নির্দেশে সেনাবাহিনী সন্ত্রাসীদের রাস্তাঘাটে গুলি করে মারতে শুরু করে। গ্রেফতার হয় বহু। আদালতে না নিয়েই তাদের বিচার কাজ শেষ হয়। বহু সন্ত্রাসী ফিলিস্তিনিদের আশ্রয় শিবিরে লুকালেও সেসব শিবিরে নির্বিচারে গুলি চালানো হয়। মারা যায় কয়েক হাজার। বহু আতঙ্কিত সন্ত্রাসী জর্ডান নদী অতিক্রম করে ইসরাইলিদের হাতে বন্দী হয়। তাদের উপলব্ধি হল, ইসরাইলি কারাগারে পচে মরব; জর্ডান সরকারের গুলিতে নয়। ম্যাসাকারের সময় বহু সন্ত্রাসী সিরিয় ও লেবাননে পালিয়ে যায়। সেপ্টেম্বরের ঐ হামলায় দুই থেকে সাত হাজার লোক নিহত হয়।

ফাতাহ্ প্রধান ইয়াসির আরাফাত এই ঘটনার প্রতিশোধ নিতে প্রতিজ্ঞা করলেন। কেননা তার সংগঠনটিই অন্যদের তুলনায় বৃহৎ। ফাতাহ্‌র অভ্যন্তরে আরেকটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হল। আন্ডারগ্রাউন্ডের মধ্যে আন্ডারগ্রাউন্ড। ফাতাহ্‌র সদস্য ও কমান্ডাররা পর্যন্ত ব্লাক সেপ্টেম্বর গ্রুপ সম্পর্কে জানালেন না।

ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর

ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর গ্রুপ মানেই নিষ্ঠুরতা। ফিলিস্তিনিদের শত্রু ভাবলেই তারা আক্রমণ চালানোর কথা ভাবত। ইয়াসির আলাফাত এই গ্রুপের সঙ্গে তার সংশ্লিষ্টতার কথা বরাবরই অস্বীকার করেছেন। কিন্তু ইসরাইলের ভাষায় আরাফাতই এই সংগঠনের স্রষ্টা এবং নেতা। তিনি নাকি ফাতাহ্‌র সিনিয়র নেতা আবু ইউসেফকে ব্লাক সেপ্টেম্বর সংগঠনের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেন। ইসরাইলিদের ভাষায় ধর্মান্ধ তরুণ আলি হাসান সালামেহকে ব্লাক সেপ্টেম্বর গ্রুপের অপারেশন প্রধান করা হয়। সালামেহ'র প্রধান গুণ তিনি ধর্মান্ধ একই সঙ্গে সাহসী ও বুদ্ধিমান। তার বাবা হাসান সালামেহ ১৯৪৮ সালের আরব ইসরাইল যুদ্ধে ফিলিস্তিনি বাহিনীর সর্বশেষ সুপ্রিম কমান্ডার ছিলেন। যুদ্ধে হাসান সালামেহ নিহত হন এবং তার ছেলে আলি হাসান সালামেহ তার পিতার আদর্শ জিইয়ে রাখার সংগ্রামে ব্রতী হন।

ব্লাক সেপ্টেম্বরের প্রথম দিককার অভিযানগুলো ইসরাইলকে তেমন বিচলিত করেনি। কেননা তাদের মূল টার্গেট ছিল জর্ডান। তারা রোমে জর্ডানের জাতীয় বিমান সংস্থার অফিস ও প্যারিসে জর্ডান দূতাবাসে বোমা হামলা করে। জর্ডানের একটি বিমান ছিনতাই করে লিবিয়ায় নিয়ে যায়। বার্ণে জর্ডান দূতাবাস এবং জার্মানিতে একটি ইলেকট্রোনিক প্ল্যান্ট তারা ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাদের ক্ষতির মধ্যে আরও রয়েছে জর্ডানের পাঁচ গোয়েন্দাকে হত্যা, হামবুর্গ ও

রটেরডামে তেল রিজার্ভারের ক্ষতিসাধন ইত্যাদি। ব্লাক সেপ্টেম্বর গ্রুপের একটি অভিযান পরিচালিত হয় কায়রো শেরাটন হোটেলের লবিতে। সেখানে হত্যা করা হয় জর্ডানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ওয়াসকি আল তালকে। এখানে এক হত্যাকারী সাবেক প্রধানমন্ত্রীর শরীরে ঝুঁকে তার রক্ত লেহন করে।

১৯৬৭ সালে ছয় দিনের যুদ্ধে ইসরাইলের বিজয়ে ব্লাক সেপ্টেম্বরের চোখ পড়ে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলের দিকে। তারা ইসরাইলের বিমান ছিনতাই করে, পুনঃপুনঃ ইসরাইলের সীমান্ত অতিক্রমের মাধ্যমে বেসামরিক লোককে হত্যা করতে শুরু করে। একই সঙ্গে বড় বড় শহরে বোমা পুঁতে ও বিস্ফোরণ ঘটাতে শুরু করে। ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা শাবাক ও মোসাদের নতুন শত্রুতে পরিণত হয় ব্লাক সেপ্টেম্বর। যদিও এই পর্যায়ে মোসাদের শত্রু ছিল ফাতাহ এবং তাদের বহু পরিকল্পনা তারা নস্যাৎ করে এবং বহু লোককে তারা গ্রেফতার করে।

কিন্তু ইতিমধ্যে ব্লাক সেপ্টেম্বর তাদের সীমা অতিক্রম করতে শুরু করে এবং পশ্চিমা দেশসমূহ তাদের টার্গেটে পরিণত হয়– বিশেষ করে ইসরাইল। জার্মানির মিউনিখের ধ্বংসযজ্ঞ ইহুদি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্লাক সেপ্টেম্বর গ্রুপের ছিল উল্লেখযোগ্য প্রথম অভিযান।

মিউনিখ অভিযানের পরেই আলি হাসান সালামেহ'র নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঐ অভিযানের নেপথ্যে ছিল হাসান সালামেহ'র ব্রেন। প্রতিপক্ষকে হত্যার পর ভিকটিমের রক্ত নিজ দলের লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার প্রবণতা ছিল তার মধ্যে। আর এভাবেই হাসান সালামেহ'র ছেলে আলি হাসান সালামেহর নাম হয়ে যায় রেড প্রিন্স।

১৯৬৯ সালে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী এশকলের অকাল মৃত্যুতে তার স্থলাভিষিক্ত হন গোল্ডা মেয়ার। ১৯৭২ সালের অক্টোবরে গোল্ডা মেয়ার অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল এবং বর্তমানে মোসাদ-প্রধান জভি জামির এবং প্রধানমন্ত্রীর কাউন্টার টেররিজম বিষয়ক উপদেষ্টা এবং সাবেক আমান প্রধান আহারোন ইয়ারিভকে তার অফিসে তলব করেন। মিউনিখে ইসরাইলি এথলেটদের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গোল্ডা মেয়র খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন। তিনি এই সময় বলেন, জার্মানিতে আবার ইহুদিদের রক্ত ঝরল। গোল্ডা মেয়ার ছিলেন একজন শক্ত মহিলা। আর তিনি যে মিউনিখ ম্যাসাকারে যুক্তদের শাস্তি নিশ্চিত করবেন না এটা ভাবাই যায় না।

জভি জামির সাবেক পালমাক ফাইটার হলেও আউটস্ট্যান্ডিং জেনারেল হিসেবে

তার খ্যাতি ছিল না। দক্ষিণাঞ্চলীয় কমান্ডের কমান্ডার হিসেবে পদ পাওয়াই ছিল তার সর্বোচ্চ পদায়ন। তিনি কিছুদিন বৃটেনে ইসরাইলের মিলিটারী এটাচে ছিলেন। মেইর অমিত মোসাদ-প্রধান হিসেবে তার কার্যকাল পুরোটা শেষ করার পরই ১৯৬৮ সালে জভি জামির মোসাদের প্রধান হন। জামিরের সমালোচকদের মতে, তিনি অতিমাত্রায় ভদ্রলোক, লাজুক এবং গোয়েন্দাগিরিতে তার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। মোটকথা তিনি ক্যারিশমেটিক নন এবং হারেল ও মেইর অমিতের মতো মোসাদ-প্রধান হওয়ার যোগ্যতাও তার নেই। জামির মোসাদ-প্রধান হওয়ায় রাফি এইতানসহ বেশ কয়েকজন মোসাদ যোদ্ধা প্রতিবাদে সংগঠন ত্যাগ করেছেন।

জামিরের মতো ইয়ারিভও নেপথ্যে থেকে কাজ করতে পছন্দ করেন। ইসরাইলের ছয়দিনের যুদ্ধকালে আমান প্রধান হিসেবে ইয়ারিভ বেশ সাফল্য দেখিয়েছেন। এটা তার জন্য একটা বিশাল অর্জন। তবে তার গ্রহণযোগ্যতার মূলে রয়েছে তার জ্ঞান ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা। হালকা পাতলা চশমাধারী, স্বল্পভাষী এবং টাকমাথার ইয়ারিভকে দেখলে একজন পান্ডিত্যপূর্ণ প্রফেসর বলে ভ্রম হয়, তুখোড় গোয়েন্দা মনে হয় না।

ইয়ারিভ এবং জামিরের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য ছিল। তাদের আসলে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার কথা। কেননা কিছুটা ওভারলেপিংও হয়েছে। কিন্তু তারা পরস্পর পরস্পরকে শ্রদ্ধা করা ও সম্প্রীতির মনোভাব নিয়ে কাজ করেছেন। তারা দু'জনই শান্তশিষ্ট, রিজার্ভ এবং কিছুটা লাজুকও। মধ্যমণি হয়ে ওঠার প্রবণতা তাদের মধ্যে ছিল না এবং ঘটনার বিশ্লেষণ ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তারা খুব সতর্ক ছিলেন।

মিউনিখের হত্যাযজ্ঞের পর ইয়ারিভ এবং জামির অতি তৎপরতার সঙ্গে ব্লাক সেপ্টেম্বর সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেন। এ কাজে তারা নামী গোয়েন্দাদের নিয়োগ করেছিলেন। তারা গোল্ডা মেয়ারকে বলেন, ঐ সংগঠনটি ইসরাইলের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ব্লাক সেপ্টেম্বরের শপথ হল যতটা সম্ভব ইসরাইলিদের সৈন্য, নাগরিক, মহিলা ও শিশু হত্যা করা। এক্ষেত্রে একের পর এক ওদের সব নেতাকে হত্যা করতে হবে। সাপের মাথা থেতলে দিতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মেয়ার কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিলেন। তরুণ সম্প্রদায়কে এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ তার পক্ষে অতি সহজ ছিল না। ইসরাইল অতীতে এমনটা কখনো করেনি। গোল্ডা মেয়ার কিছুক্ষণ নিশ্চুপ

বসে থাকলেন। এবং এক সময় কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি এমনভাবে কথা বলছিলেন যেন তিনি স্বগতোক্তি করছেন কিম্বা নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলছেন। তিনি হলোকাস্টের সময় ইসরাইলি নারী-পুরুষকে হত্যার কথা স্মরণ করলেন। ইহুদিরা এ সময় নিগৃহীত হয়েছে, তাদের নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। অবশেষে তিনি তার মাথা তুলে অভিযান শুরুর নির্দেশ দিলেন।

জামির অবিলম্বে অভিযানের প্রস্তুতি নিলেন। এদিকে প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মেয়ার ভাবছেন, ইয়ারিভ এবং জামির যতই প্রতিশ্রুতি দিক না কেন একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে তিনি তাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন কীনা। মোসাদের তরুণ গোয়েন্দারা যাদের মারতে যাচ্ছে তারা যেই-সেই নন, ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর দলের নেতা এবং প্রধান প্রধান সন্ত্রাসী। গোল্ডা মেয়ার জানতেন এই ধরনের অভিযান আইনের বাইরে চালাতে হবে। মোসাদের কার্যক্রম যদি বেসামরিক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে না থাকে তাহলে তাদের কর্মকাণ্ড নারকীয় হয়ে পড়ার আশংকা। ফলে অনেক নিরীহ লোকও মারা যেতে পারে। ফলে মোসাদকে তিনি নিয়ন্ত্রণে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন। এলক্ষ্যে তিনি একটি গোপন কমিটি করলেন যাতে অন্তর্ভুক্ত করা হল প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মোশে দায়ান ও সাবেক মেধাবী জেনারেল ও বর্তমান উপপ্রধানমন্ত্রী ইগাল আল্লোনকে। আর প্রধানমন্ত্রী নিজে তো এই কমিটিতে থাকছেনই। এই গোপন ট্রাইব্যুনালের কাজ হবে প্রতিটি অভিযানের ফলাফল পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা। এই কমিটির নাম দেয়া হল এক্স কমিটি। সিদ্ধান্ত হল মোসাদ ও শাবাক প্রধান প্রত্যেকটি অভিযানের আগে সংশ্লিষ্ট টার্গেটের নাম ও ফাইল তাদেরকে দেবেন। তাদের অনুমোদন পেলেই মোসাদের হিট টিম মাঠে নামবে।

মাসাদ হল মোসাদের অভিযান পরিচালনা বিভাগ। তাদেরকে এই অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হল। কালো কেশধারী এবং শ্রমসাধ্য কাজে তৎপর মাইক হারারীকে অভিযানের নেতা বানানো হল। সিদ্ধান্ত হল, ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর বিরোধী সব অভিযানই হবে ইউরোপে। প্রথমত সেখানে তারা সুদৃঢ় অবস্থান গড়ে তুলেছে এবং সেখানে তাদের সুরক্ষা দেয়ার লোকেরও অভাব নেই।

মাসাদার অপারেশনাল টিম কিডন থেকে লোক নিয়োগ দিলেন। অনেকগুলো টিম করলেন। তেমনি একটি টিমের নারী ও পুরুষকে দায়িত্ব দেয়া হল তারা সন্দেহভাজনকে চিহ্নিত ও পরিচয় নিশ্চিত করবে। সংশ্লিষ্ট সন্ত্রাসীর যে শহরে বাস সেখানে তারা তাকে ফলো করবে, তার ছবি তুলবে, তার অভ্যাস জানবে, তার বন্ধুদের চিহ্নিত করবে, প্রকৃত ঠিকানা খুঁজে বের করবে। যেসব বার বা রেস্তোরাঁয় সে যাতায়াত করে তা খুঁজে বের করাও দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। তার

রুটিন জানতে হবে এবং ঘণ্টায় ঘণ্টায় তার তৎপরতা উদঘাটন করতে হবে। হোটেল রুম ঠিক করা, ফ্ল্যাট ও গাড়ি ভাড়া করার দায়িত্বে থাকবে ছোট্ট একটি দল–একজন নারী আরেকজন পুরুষ। আরেকটি ক্ষুদ্র দলের ওপর বর্তাবে মোসাদ সদর দফতর ইউরোপের সংশ্লিষ্ট দেশের অগ্রগামী অপারেশনাল টিমের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষার।

মোসাদের হিটটিম বা ঘাতক বাহিনী অকুস্থলে এসে পৌছবে সবার শেষে। তারা ব্যক্তি, ঠিকানা ও ছবি এবং অন্যান্য তথ্যাদি নিশ্চিত হয়ে অভিযানে নামবে। যে শহরে অভিযান চলবে সেখানে কর্মরত মোসাদ গোয়েন্দাদের নিরাপত্তায় কাজ করবে আরেকটি দল। ড্রাইভার, গাড়ি অভিযান স্থলে প্রস্তুত থাকবে। মহড়া অনুযায়ী সটকে পড়ার রাস্তা নির্বিঘ্ন করবে এই টিম। এই দলের কাছে অস্ত্র থাকবে এবং প্রয়োজনে হিট টিমের পাশে এসে দাঁড়াবে। অভিযান শেষে হিট টিমের সকল সদস্য তাদের অস্ত্র ও সরঞ্জামাদিসহ ঐ দেশ ত্যাগ করবে। অপারেশনের আগেই সন্দেহভাজনকে খুঁজে পেতে সাহায্যকারী টিম ঐ দেশ ছাড়বে। অন্যরা বাক্স-পেটরা বাঁধাইসহ অন্যান্য কাজে আরও কয়েকদিন সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থান করবে। মোসাদ গোয়েন্দারা অভিযান পরিচালনার জন্য প্রথম যে শহরটি বেছে নিলেন সেটি রোম।

রোমে সন্দেহভাজন হিসেবে যাকে চিহ্নিত করা হল তিনি লিবীয় দূতাবাসের একজন অধঃস্তন কেরানি। নাবলুসে জন্মগ্রহণকারী ৩৮ বছর বয়স্ক ওয়াযেল জেডওয়েলার ভদ্র, হালকা পাতলা গড়ন ও মৃদুভাষী। তার বাবা খুব বিখ্যাত ব্যক্তি এবং আরবিতে অনুবাদে খুব দক্ষ ছিলেন। ওয়াযেল নিজেও কবিতা ও ফিকশন অনুবাদে পারদর্শী। শিল্পকলার একজন সমঝদারও তিনি। লিবীয় দূতাবাসে দোভাষী হিসেবে তিনি কর্মরত। ছোট্ট একটা এ্যাপার্টমেন্টে তার বাস। তার বন্ধুর দাবি ওয়াযেল সব সময় সন্ত্রাসকে ঘৃণা করতেন। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যারা হত্যায় লিপ্ত হয় তাদেরও তিনি ঘৃণা করতেন।

কিন্তু ওয়াযেলের বন্ধুরা তার সত্যিকার পরিচয় জানতেন না। তার ভালো বন্ধুরা ছিলেন যেমন নিষ্ঠুর তেমনি ধর্মান্ধ। তারা রোমে ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের হয়ে পরিকল্পনা করে স্থির বিশ্বাসে অভিযান চালাতেন। ওয়াযেল রোমে বেড়াতে আসা দুই ইংলিশ তরুণীকে টার্গেট করলেন। এই দুই তরুণী রোম হয়ে ইসরাইলে যাবে। ওয়াযেল দুই সুদর্শন তরুণ ফিলিস্তিনিকে ঐ দুই তরুণীর সঙ্গে বিছানায় যাওয়াসহ সবরকমের সম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশ দেন। দুই তরুণ সফলও হন। দুই জোড়া তরুণ তরুণীর বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় হয়। তখন এক

তরুণ তার বান্ধবীকে পশ্চিম তীরে তাদের বাড়িতে ছোট্ট একটা টেপ রেকর্ডার পৌঁছে দিতে অনুরোধ করেন। সাধাসিদে তরুণী সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়। রোম বিমানবন্দরে তরুণীদের মালামাল ও টেপরেকর্ডারটি যথাযথভাবে চেক করা হয়। দুই তরুণী জানত না, সুদর্শন দুই তরুণ তাদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ওয়াযেলের তত্ত্বাবধানেই ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের লোকজন ঐ রেকর্ড প্লেয়ারের মধ্যে বিস্ফোরক ভর্তি করে দেন এবং সুন্দর করে ব্রান্ড নিউ বাক্সে সেটি ভরে প্যাক করা হয়। ঐ রেকর্ডারের বডিতে এমন ডিভাইস সংযুক্ত করা হয় যাতে একটা উচ্চতায় ওঠার পর সেটি বিস্ফোরিত হবে এবং প্লেন ও তার সকল যাত্রী মারা যাবে।

সন্ত্রাসীরা জানতেন না যে, ইসরাইল অভিমুখী একটি সুইস বিমানে অনুরূপ বিস্ফোরক ইতিপূর্বে সংযুক্ত করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য বিমানটির ধ্বংস। কিন্তু এল আল প্লেন এক ধরনের অস্ত্রের বর্ম দিয়ে তা ঢেকে দেয়ায় প্লেনটি ধ্বংস হয়নি। এই দফায় যা হল, এল আল প্লেনের পাইলট একটি সন্দেহজক রেড লাইট জ্বলতে দেখলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিমান বন্দরে ফিরে এলেন। স্তম্ভিত ইংলিশ তরুণীদ্বয়কে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের দুই প্রেমিকের সন্ধান পাওয়া গেল। কিন্তু ঐ সুদর্শন তরুণ বান্ধবীদের বিমানবন্দরে ঢুকিয়েই চলে গেছেন ইটালী।

মোসাদ গোয়েন্দাদের প্রথম টিমটি কয়েকদিন ধরে ওয়াযেলকে খুঁজতে থাকে। এক মহিলা গোয়েন্দা লিবীয় দূতাবাসে প্রবেশ ও নির্গমনের সময় হ্যান্ড ব্যাগের নিচে ক্যামেরা রেখে তার ছবি তুলতে সমর্থ হয়। এদিকে ১৬ অক্টোবর ওয়াযেল বাড়ির সামনে এলে এই মহিলার বিষাদমাখা সুর পিয়ানোতে শুনতে পান। হঠাৎ করে বাড়ির সামনের অন্ধকার থেকে রিভলবার হাতে দুই ব্যক্তি বেরিয়ে এসে ওয়াযেলকে গুলি করে। কেউই সেই গুলির শব্দ পায়নি এবং দুই মোসাদ গোয়েন্দা অকুস্থলে পার্ক করে রাখা একটি গাড়িতে লাফ দিয়ে উঠে। কয়েক ঘন্টার মধ্যে তারা রোম ত্যাগ করে।

যাহোক, ওয়াযেল নিহত হয়েছেন। বৈরুতের একটি পত্রিকা তার মৃত্যু সংবাদ ছাপে। কয়েকটি সন্ত্রাসী সংগঠন শোক প্রকাশ করে বলে, ওয়াযেল তাদের একজন পরীক্ষিত যোদ্ধা ছিলেন।

ওয়াযেলের হত্যাকারীর প্রকৃত নাম ডেভিড মোলাডনয়। তার জন্ম তিউনিসিয়ায় এবং ছোট বেলায় ইসরাইলে স্থায়ী হয়েছে। ফরাসি ভাষায় তার দক্ষতা ঈর্ষণীয়। কিন্তু ইসরাইলের প্রতি তার ভালোবাসার কোনো তুলনা হয় না। ইসরাইলের ব্যাপারে বরাবরই সে আপোষহীন। সেনাবাহিনীর চাকরি

ছেড়ে মোসাদে যোগদানের পর থেকেই দুর্ধর্ষ সব অভিযানে তার ডাক পড়ে এবং রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠে। ওয়ায়েলকে হত্যার পরও মোসাদ বেশ কিছুদিন ইসরাইলে কাটিয়ে প্যারিসে চলে যায়।

এই ঘটনার কয়েকদিন পর প্যারিসের ১৭৫ রুয়ে আলেসিয়ার ড: মাহমুদ হামশারির বাড়ির ফোন বেজে উঠে। ফোনে তাকে প্রশ্ন করা হয় প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের ফ্রান্স প্রতিনিধি হামশারির এটি কীনা। ফোনকারীর গলায় পুরোপুরি ইটালী এ্যাকসেন্ট। ফোনকারী নিজেকে ইটালীর একজন সাংবাদিক হিসেবে পরিচয় দেয় এবং ফিলিস্তিনিদের প্রতি সহমর্মিতার কথা বলে। তার দরকার হামশারীর একটা সাক্ষাৎকার। সিদ্ধান্ত হয়, হামশারীর বাড়ির বেশ কিছুটা দূরের এক রেস্তোরাঁয় তাদের সাক্ষাৎ হবে। হামশারী একজন শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক। প্যারিসে তিনি তার ফরাসি স্ত্রী ও মেয়ে নিয়ে থাকতেন। পরবর্তীতে তার মেয়ের নিরাপত্তায় ব্যাপক কড়াকড়ি আরোপ করা হয়।

হামশারী যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন তখন রাস্তাঘাটের দিকে বিশেষ নজর রাখতেন। কেউ তাকে ফলো করছে কীনা ইত্যাদি। মাঝে-মধ্যে প্রতিবেশীদের কাছে জানতে চাইতেন, অচেনা কোনো লোক তাকে খুঁজেছে কীনা।

হামশারীর অবশ্য অত চিন্তিত হওয়ার কথা নয়। কেননা তিনি একজন পন্ডিত ব্যক্তি। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও তার বেশ পরিচিতি রয়েছে। কিন্তু ইসরাইলের গোয়েন্দারা তার সম্পর্কে এর বেশি কিছু জানত। ১৯৬৯ সালে ডেনমার্কে বেন গুরিয়ানকে হত্যার একটা ব্যর্থ চেষ্টা হয়। সেই অভিযানে হামশারী অংশ নিয়েছিলেন। ১৯৭০ সালে একটি সুইস বিমান মধ্য আকাশে বিস্ফোরণের কারণে বিধ্বস্ত হলে ৪৭জন নিহত হয়। সেই ঘটনায় হামশারীর সম্পৃক্ততা ছিল। রহস্যজনক আরব তরুণদের সঙ্গে তার গভীর যোগাযোগ ছিল এবং তারা রাতে বিশালাকায় সুটকেস নিয়ে তার বাড়িতে আসত। অনেক হীন আচরণের ঘটনা ঘটত ঐ বাড়িতে। ইহুদি গোয়েন্দারা আরও জানত, ইউরোপে এখন ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর দলের সে দ্বিতীয় ব্যক্তি।

হামশারী যেদিন সাক্ষাৎকার দিতে বাড়ির বাইরে বের হন কয়েকজন লোক তার এপার্টমেন্ট ভেঙে পনের মিনিট সেখানে কাটায় এবং পরবর্তীতে চলে যায়।

পরের দিন হামশারীর স্ত্রী ও মেয়ে বাড়ি ত্যাগ না করা পর্যন্ত এক ইসরাইলি গোয়েন্দা আশপাশে অবস্থান করছিল। হামশারীর বাড়ির টেলিফোনটি বাজলে তিনি সেটি ধরেন। এটি ছিল ঐ গোয়েন্দার টেলিফোন। গোয়েন্দা হামশারীর বাড়িতে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হয়।

হঠাৎ করেই হামশারী ভয়াবহ এক বিস্ফোরণের শব্দ পান। তার ডেস্কের নিচে একটা বিস্ফোরক লুকায়িত ছিল। সেটিই বিস্ফোরিত হয়েছে। মারাত্মক আহত হামশারী কয়েকদিন পর হাসপাতালে মারা যান। মোসাদকে দোষারোপ করার কোনো সুযোগই তিনি পাননি।

হামশারীর মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পর অভিযানের নেপথ্য নায়ক হারারি জোনাথান নামে একজনকে সঙ্গে নিয়ে সাইপ্রাস দ্বীপে আসেন। সিরিয়, লেবানন ও মিসরের কাছাকাছি অবস্থানের কারণে সাইপ্রাস ইসরাইল ও আরব গোয়েন্দাদের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

হারারীদের লক্ষ্যবস্তু হুসেইন আবদএল হীর। তিনি কয়েকমাস আগে সাইপ্রাসে ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর গ্রুপের আবাসিক প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্বাঞ্চলীয় ব্লকের সঙ্গে তার যোগাযোগ রাখাও ছিল কর্তব্য। পূর্বাঞ্চল সন্ত্রাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। রাশিয়ায় চেক, হাঙ্গেরী, ফিলিস্তিন ও বুলগেরিয়ার সন্ত্রাসীদের প্রশিক্ষণ হয় সামরিক ঘাঁটি ও বিশেষ বাহিনীর ইউনিটে। ঐ সব দেশ অস্ত্র ও গোলাবারুদ পাঠায় সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোর কাছে। কতিপয় ফিলিস্তিনি নেতা সোভিয়েত আদর্শে দীক্ষিত ছিলেন। তারা পড়াশুনা করতেন মস্কোর প্যাট্রিক লুবুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ইসরাইলে সন্ত্রাসী রপ্তানিরও প্রধান ছিলেন আবদ এল হীর। ইসরাইলি গডফাদারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে যেসব আরব গোয়েন্দা সাইপ্রাসে আসত হীর তাদেরও গুম করার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত এক্স কমিটি আবদ এল হীরকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। এখন এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পালা।

আবদ এল হীর তার হোটেলে ফিরলেন এবং বাতি নিভিয়ে দিলেন। জোনাথানের স্থির বিশ্বাস হীর ঘুমিয়ে পড়েছেন। অত:পর তিনি রিমোট কন্ট্রোলের বোতাম টিপলেন। বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল পুরো হোটেল। ধোঁয়া অন্তর্হিত হওয়ার পর দেখা গেল আবদ এল হীরের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে।

ব্লাক সেপ্টেম্বরের বাহিনীর প্রতি তাৎক্ষণিক প্রতিশোধের আগুন সেক্ষেত্রে শুরু হয়ে গেল।

১৯৭৩ সালের ২৬ জানুয়ারি মোশে হানান ইশায়ী নামের এক ইসরাইলি তার ফিলিস্তিনি বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে মাদ্রিদের একটি পাবে এসেছে। পাব ত্যাগের পর তাদের সামনে এসে দাঁড়াল দু'জন লোক। ফিলিস্তিনি লোকটি

পালিয়ে গেল। অতএব আগত দুই লোক গুলি করল ঈশায়ীকে। মৃত্যু হল ঈশায়ীর। আততায়ী দু'জন সটকে পড়ল।

কয়েকদিনের মধ্যেই জানা গেল ঈশায়ীর প্রকৃত নাম বারুচ কোহেন। সে একজন নিষ্ঠাবান মোসাদ গোয়েন্দা। সে মাদ্রিদে ফিলিস্তিনি ছাত্রদের একটা নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিল। যে লোকটি তার সঙ্গে পাবে দেখা করতে এসেছিল সে হল তার সন্ধানদাতা। ব্লাক সেপ্টেম্বরই তাকে নিয়োগ দিয়েছিল। কোহেনকে হত্যার মাধ্যমে ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের অনুসারীরা তাদের সহকর্মী আবদ এল হীরের হত্যার প্রতিশোধ নিল।

যাদক অফির নামের এক ইসরাইলি গোয়েন্দাকে ব্রাসেলসের ক্যাফেতে গুলি করে আহত করার জন্য ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের লোকদের দায়ী করা হয়। পত্র বোমার মাধ্যমে লন্ডনের ইসরাইলি দূতাবাসের এটাচে ড. আমিকে হত্যার জন্যও ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর দলকে দায়ী করা হয়।

আবদ এল হীরের মৃত্যুর দুই সপ্তাহ পর ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর সাইপ্রাসে তাদের নতুন এজেন্ট নিয়োগ করে। সাইপ্রাসে পৌছানোর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ঐ নতুন এজেন্ট রুশ গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। অতএব হোটেলে ফিরে বাতি নেভানোর সঙ্গে সঙ্গে তার পূর্বসূরীর মতো তাকেও হত্যা করা হয়।

আরাফাত এবং আলি হাসান সালামেহ অত:পর বড় ধরনের প্রতিশোধ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। তারা একটি বিমান ছিনতাই করে সেটি বিস্ফোরক দিয়ে ভর্তি করেন। অত:পর আত্মঘাতী হামলাকারী কমান্ডোদের ইসরাইল অভিমুখে পাঠানো হয়। ঐ বিমান তেল আবিবে বিধ্বস্ত হলে শতাধিক লোক নিহত হয়। নিউইয়র্কে টুইন টাওয়ার ধ্বংস তথা নাইন ইলেভেনের মতো ঘটনার ধারণার সঙ্গে এর সাজুয্য বিদ্যমান।

মোসাদ এজেন্টরা প্যারিসে ফিলিস্তিনিদের একটি গ্রুপের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে। তারা একটি প্রকল্পের দায়িত্বে ছিলেন। এক রাতে মোসাদের এক গোয়েন্দা ঐ দলে এক বুড়ো লোকের উপস্থিতি শনাক্ত করে। তার ছবি তুলে মোসাদ সদর দফতরে পাঠানো হলে ঐ বৃদ্ধের নাম জানা যায়। তার নাম বাসিল আল খুবাইশী। তিনি ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর দলের একজন সিনিয়র নেতা। খুবাইশী একজন সুপরিচিত আইনজ্ঞ। বৈরুতের আমেরিকান ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগের প্রফেসর এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় পন্ডিত। কিন্তু হামশারী ও ওয়ায়েলের মতো জনাকয়েক ভয়ংকর মানুষের মতো খুবাইশীও গোপনে

ভয়ংকর।

১৯৫৬ সালে তিনি বাদশাহ ফয়সালকে গাড়ি বোমার সাহায্যে হত্যার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। রাজকীয় গাড়ি বহরের পথে গাড়ি বোমাটি রাখা হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বোমাটি নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বিস্ফোরিত হয়। আলি খুবাইশী পালিয়ে লেবানন চলে যান। পরে আমেরিকা যান। কয়েক বছর আগে তিনি গোল্ডা মেয়ারকে আমেরিকা সফরকালে হত্যার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ঐ হত্যা চেষ্টা ব্যর্থ হলে তিনি প্যারিসে সোসালিস্ট আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আবার গোল্ডা মেয়ারকে হত্যার উদ্যোগ নেন। এবারও তিনি ব্যর্থ হন।

আল খুবাইশী এরপরও সন্ত্রাসের পথ পরিহার করেননি। তিনি পিএলওতে যোগদান করেন এবং দলনেতা জর্জ হাবাশের ডেপুটি নিযুক্ত হন। ১৯৭২ সালের ৩০ মে লড এয়ারপোর্টে আরব ও জাপানী সন্ত্রাসীরা হামলা চালালে ২৬জন লোক নিহত হয়। এই হামলার পরিকল্পনাকারীদের একজন হলেন খুবাইশী। নিহতদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল পুয়ের্তোরিকোর তীর্থ যাত্রী। তারা জেরুজালেমে এসেছিল। পরবর্তীতে আল খুবাইশী ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরে যোগদানের মাধ্যমে প্যারিসে যান। আত্মঘাতী হামলার পরিকল্পনা করতেই হয়তো তার আগমন। তিনি উঠেছেন ছোট্ট একটি হোটেলে। ৬ এপ্রিল একটি ক্যাফেতে রাতের আহার শেষে খুবাইশী তার হোটেলে ফিরছিলেন। মেডেলিয়েনের কাছে ওঁত পেতে ছিল মোসাদ টিম। মোসাদের আরও দু'জন গোয়েন্দা রাস্তায় এবং আরও দু'জন গাড়ির মধ্যে ছিল। এদের মধ্যে একজন স্বর্ণকেশীদের ন্যায় পরচুলা পরে ছিল। খুবাইশী কাছাকাছি আসতেই দুই মোসাদ গোয়েন্দার বন্দুক গর্জে ওঠার অপেক্ষায়। এ সময় অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে। বাতি জ্বালিয়ে একটি গাড়ি খুবাইশীর সামনে এসে দাঁড়ায়। ঐ গাড়িতে ছিল সুন্দরী এক মহিলা। দু'চারটি কথা শেষ করে খুবাইশী ঐ গাড়িতে গিয়ে উঠেন। গাড়িটি চলে গেলে মোসাদ গোয়েন্দারা হতাশ হয়ে পড়েন। ঐ নারী আসলে একজন পতিতা। সে আল খুবাইশীকে প্রস্তাব দিয়েছিল।

এক যৌন কর্মীর কারণে এতবড় একটা অভিযান ব্যর্থ হয়ে গেল। অভিযানে নেতৃত্বদানকারী অফিসার তার দলের গোয়েন্দাদের শান্ত থাকতে বলল। সে বলল, যৌন কর্মী ঠিকই আল খুবাইশীকে কিছুক্ষণের মধ্যে এখানেই নিয়ে আসবে। দলনেতা কী করে এটা জানত তা বলা কঠিন। কিন্তু তার কথামতই ওরা আগের জায়গায় কুড়ি মিনিটের মধ্যে ফিরে এলেন। আল খুবাইশী যৌন কর্মীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হোটেলের দিকে সামান্য অগ্রসর হতেই অন্ধকার থেকে দু'ব্যক্তি তার পথ রোধ করে দাঁড়ালো। এদের মধ্যে একজন ডেভিড

মোসাদ।

আল খুবাইশী সঙ্গে সঙ্গে বুঝলেন কী হতে যাচ্ছে। ফরাসি ভাষায় তিনি না না বলে ওঠলেন। বললেন, গুলি করো না। নয়টি বুলেট খুবাইশীকে ঝাঝরা করে দিল। মোসাদ গোয়েন্দারা লাফ দিয়ে তাদের গাড়িতে উঠে সটকে পড়ল। পরের দিন পিএলও এক বিবৃতিতে আইন প্রফেসরের প্রকৃত পরিচয় বিবৃতির মাধ্যমে প্রকাশ করল।

এর কয়েক মাসের মধ্যে মোসাদ এবং কিডনের সদস্যরা বেশ কয়েকজন ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর দলের নেতাদের হত্যা করল গ্রীসে। তারা গ্রীসে এসেছিলেন জাহাজ কিনতে। সেসব জাহাজে বিস্ফোরক ভর্তি করে তা ইসরাইলে পাঠানোর কথা ছিল।

কিন্তু একটি প্রশ্ন তাড়া করে ফিরছে। মিউনিখ অলিম্পিকে হত্যাযজ্ঞ চালানোর মূল পরিকল্পনাকারী সালামেহ কোথায়? সালামেহ ছিলেন বৈরুত সদর দফতরে। তিনি তার পরবর্তী অপারেশনের পরিকল্পনা করছিলেন। এর মধ্যে একটি পরিকল্পনা ছিল ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের মাধ্যমে থাইল্যান্ডে ইসরাইলি দূতাবাস দখল করা। কিন্তু ঐ অভিযান ব্যর্থ হয়। থাই জেনারেলদের কড়া হুমকি এবং ব্যাংককে নিযুক্ত মিসরীয় রাষ্ট্রদূতের চাপে সন্ত্রাসীরা জিম্মিদের মুক্ত করে অপদস্থ হয়ে থাইল্যান্ড ত্যাগ করেন।

সালামেহর পরবর্তী অভিযান চালানো হয় সুদানে সৌদি দূতাবাসে। খার্তুমের এই ফেয়ারওয়েল পার্টি এক ইউরোপীয় কূটনীতিকের সম্মানে আয়োজন করা হয়েছিল। সালামেহ'র অস্ত্রধারী লোকজন বলতে গেলে খার্তুমের প্রায় সকল কূটনৈতিককে জিম্মি করে ফেলেছিলেন। আরাফাতের নির্দেশে তারা অধিকাংশ কূটনৈতিককে ছেড়ে দেন। তবে যাদেরকে আটক করে রাখা হয় তাদের মধ্যে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ক্লেও এ নোয়েল, একই দূতাবাসের দ্বিতীয় ব্যক্তি জর্জ সি মুর এবং বেলজিয়ামের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত গাই ঈদ। সালামেহর নির্দেশে চরম নিষ্ঠুরভাবে তাদের হত্যা করা হয়। প্রথমে তাদের পায়ে গুলি করা হয়। পরে রাইফেলের গুলিতে হত্যা করা হয়।

সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করা হলেও কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সুদান সরকার তাদের ছেড়ে দেয়। কূটনীতিকদের হত্যার প্রতিবাদে বিশ্বব্যাপী নিন্দার ঝড় উঠে। ইসরাইল মনে করে ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর গ্রুপের লোকদের মরণ কামড় দেয়ার এটাই প্রকৃত সময়। জেরুজালেমে ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মেয়ার নতুন করে অভিযান শুরুর নির্দেশে দেন।

১৯৭৩ সালের ১ এপ্রিল ৩৫ বছর বয়স্ক বেলজিয়ামের পর্যটক গিলবার্ট রিমবাউট বৈরুতের স্যান্ডস হোটেলে উঠেন। একই দিন আরেক পর্যটক দিয়েতার একই হোটেলে রুম ভাড়া নেয়। তাদের সমুদ্রের দিকে মুখ করা রুমগুলো দেয়া হয়। যদিও এরা কেউ কাউকে চিনত না। ৬ এপ্রিল ঐ হোটেলে আরও তিনজন পর্যটক উঠে। হাসিখুশী মুখের এন্ডলু ব্রিটিশ নাগরিক। ডেভিড মোলাড বেলজিয়ামের পাসপোর্ট নিয়ে দু'ঘন্টা পর রোম ফ্লাইটে আসেন। এখানে তার নাম চার্লস বাউসাউ। বিকেলে আসা জর্জ এলডারও ব্রিটিশ নাগরিক। কিন্তু তার স্বদেশের ঠিক বিপরীত আচরণ। পৃথক একটি বীচ ও হোটেলে উঠেছেন চার্লস মেসি। তার আচরণ প্রকৃতই ইংরেজদের মতো। দু'বেলা আবহাওয়া বার্তা শোনা তার চাই-ই চাই।
ছয়জন লোকই নিজ নিজ প্রক্রিয়ায় বৈরুত সফর করছেন। তারা রাস্তায় হেঁটে হেঁটে শহরের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন। ট্রাফিক ব্যবস্থা, গলি ঘুপচি সবই পর্যবেক্ষণ করছেন। তারা কয়েকটি দামি গাড়িও ভাড়া করেছেন।

৯ এপ্রিল ক্ষেপণাস্ত্রবাহী নয়টি জাহাজের একটি বহর এবং ইসরাইলি নৌবাহিনীর টহল যান গভীর সমুদ্রে অবস্থান নেয়। এমবি মিভটাহ্ জাহাজে প্যারাসুট বাহিনীর সদস্যরা অবস্থান নেয়। এর কমান্ডে রয়েছে কর্নেল আমনোন লিপকিন। এদের দায়িত্ব হল পিএলও'র সদর দফতরে হামলা চালানোও। এহুদ বারাকের অধীনে রয়েছে সায়েরেত মাটকাল ইউনিট। আরেকটি জাহাজেও রয়েছে প্যারাসুট বাহিনী। তাদের অভিযানের লক্ষ্য ভিন্নতর। জাহাজে চড়ার আগে তাদেরকে চার ব্যক্তির ছবি দেখানো হয়। তাদের মধ্যে তিনজন হলেন ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর দলের সুপ্রিম কমান্ডার আবু ইউসেফ, ফাতাহর শীর্ষ অপারেশন কমান্ডার কামাল আদওয়ান। ইসরাইল অধিকৃত এলাকায় ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর দলের অপারেশন চালানোর প্রধান ব্যক্তিও তিনি। আরেকটি ছবি ফাতাহ্ গ্রুপের প্রধান মুখপাত্র কামাল নাসেরের। মোসাদ গোয়েন্দাদের বলা হল, ওরা তিনজনই রিউ ভারদুনের একই বাড়িতে বসবাস করেন। চতুর্থ ছবিটি হল আলি হাসান সালামেহ্'র। কেউ জানে না তিনি কোথায় আছেন।
কমান্ডোদের বেসামরিক পোশাক পরানো হল। বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে বোটগুলো বৈরুতের দিকে এগুতে থাকল। যাত্রীরা উইগ পরিধান করল। এহুদ বারাক মহিলাদের পোশাক পরল। সে তার ব্রেসিয়ারের মধ্যে বিস্ফোরক চার্জার লুকিয়ে রাখল। বেশ কয়েকটি রাবারের ডিঙ্গি বৈরুতের নির্জন দ্বীপে। এইসব ডিঙ্গিতে মাদারশীপ থেকে আনীত প্যারাসুটবাহী সৈন্যরা রয়েছে। তারা বীচে

ছয়টি গাড়ি দেখল। কে কোনো গাড়িতে উঠবে তা আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে গাড়িগুলো নিয়ে যেখানে ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের নেতাদের বাস সেখানে গেলেন।

মিলিটারী কমান্ডোদের যে বহরটি পপুলার ফ্রন্টের সদর দফতরের দিকে যাচ্ছিল তারা আক্রমণ পরিচালনার মহড়া দেশে বসেই করে গিয়েছিল। তেল আবিবের শহরতলীতে এই মহড়া হয়। এখানে রাতে ইসরাইলের চীফ অব স্টাফ ডেভিড এলাজার ঐ মহড়া দেখতে যান। সুদর্শন এক লেফটেন্যান্ট ডেভিডকে মহড়াকালে জানান, বৈরুতের সুনির্দিষ্ট ভবনটি বিধ্বস্ত করতে আমরা ৫২০ কিলোগ্রাম বিস্ফোরক ব্যবহার করব। কিন্তু ডেভিড বললেন, এত বেশি বিস্ফোরক ব্যবহার অপ্রয়োজনীয়। বেশি বিস্ফোরক ব্যবহারে পাশের ভবনগুলোর ক্ষতি হতে পারে। আর বহু বেসামরিক লোকের বাস এসব স্থানে। অত:পর তিনি পকেট থেকে নোট বুক বের করে লেফটেন্যান্টকে দেখালেন যে, মাত্র ৮০ কিলোগ্রাম বিস্ফোরক ব্যবহারই পপুলার ফ্রন্টের ভবন ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। পরবর্তীতে ৮০ কিলোগ্রাম ব্যবহারের সিদ্ধান্তই বহাল হল।

প্যারাসুটারদের পপুলার ফ্রন্টের সদর দফতর দখল নিতে তাদের দুই কম্যান্ডোর জীবনহানি হল। অত:পর তারা ঐ সদর দফতর দখলে নিয়ে ৮০ কিলোগ্রাম বিস্ফোরকের বিস্ফোরণ ঘটালে ভবনটি পুরোপুরি ধ্বংস হয় এবং বহু সন্ত্রাসী নিহত হয়। কিন্তু আশপাশের কোনো ভবনের ক্ষতি হয়নি।

একই সময়ে দক্ষিণ বৈরুতের বেশ কয়েকটি সন্ত্রাসী ঘাঁটিতে আক্রমণ করে ইসরাইলি গোয়েন্দারা। এই আক্রমণের পেছনে আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল। তা হল সন্ত্রাসীর পাল্টা আক্রমণ চালায় কী না এমনকী লেবাননের সেনাবাহিনীও। কিন্তু কোনো তরফ থেকেই কোনো সাড়া মেলেনি।

ইতিমধ্যে সায়েরেত মাটকাল কম্যান্ডোরা রিউ ভারদুম ভবনে চলে গেছে। ঐ বাড়িতে ঢোকার সময় দুই লেবাননী পুলিশ সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ তারা এক প্রেমিক যুগলকে দেখল। এই প্রেমিক যুগলের মধ্যে রোমিওর ভূমিকায় ছিল সুপরিচিত যোদ্ধা মুকী বেটজার আর প্রেমিকা জুলিয়েটের ভূমিকায় ছিল এহুদ বারাক। পুলিশ সরে গেলেই মোসাদের লোকজন কামাল আদওয়ান, কামাল নাসের এবং আবু ইউসেফের ফ্ল্যাট ভেঙে ভেতরে ঢুকল। এরা একেকজন একেক ফ্লোরে থাকতেন। ভেতরে ঢুকেই তারা তিন যোদ্ধাকে হত্যা করল। আবু ইউসেফের স্ত্রী তার স্বামীকে বাঁচানোর চেষ্টা করে আহত হন।

এই হত্যাযজ্ঞ চালানোর সময়ই ইসরাইলি গোয়েন্দারা ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের

নেতাদের ড্রয়ারে রক্ষিত মূল্যবান কাগজ পত্রাদি হস্তগত করে। অত:পর তারা গাড়ি চালিয়ে বীচে চলে যায়। সেখানেই রয়েছে তাদের জন্য অপেক্ষমাণ রাবারের ডিঙ্গি। অবশ্য তিন ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর নেতাদের মারতে গিয়ে এক ইতালীয় মহিলাও নিহত হন।

অত:পর টাস্ক ফোর্সের লোকজন মাদারশীপে একত্রিত হয়। জাহাজটি ইসরাইলের দিকে যাচ্ছিল। আসলে এই অভিযান প্রকৃত অর্থেই সফল। পিএলও এলপি সদর দপ্তরের এখন আর কোনো অস্তিত্ব নেই। ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের নেতারা বিশেষ করে সংস্থার কমান্ডার আবু ইউসেফও নিহত হয়েছেন।

এদিকে ইসরাইলি কমান্ডোরা জানত না যে, রুয়ে ভারদুন ভবন থেকে মাত্র ৫০ গজ দূরের একটি ভবনে খুব শান্তিতে ঘুমাচ্ছিলেন আলি হাসান সালেমেহ। পরদিন আবু ইউসুফের মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত হলে ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের নেতা হন আলি হাসান সালেমেহ।
নিহতদের ড্রয়ার থেকে উদ্ধারকৃত কাগজপত্র পরীক্ষা করে মোসাদ 'পাসওভার একেয়ার' সম্পর্কে অবগত হয়। মোসাদ এই রহস্য নিয়ে দু'বছর ধরে ব্যতিব্যস্ত ছিল। পাসওভার একেয়ার নিয়ে এখন দু'কথা বলি।

১৯৭১ সালের এপ্রিলে দুই সুন্দরী ফরাসি মহিলা ইসরাইলের লাড বিমানবন্দরে নামে ভুয়া পাসপোর্টে। তাদের আগমন সম্পর্কে বিমানবন্দরকে আগেই অবহিত করা হলে তাদের কাপড়-চোপড় ও আন্ডার গার্মেন্ট সার্চ করে ১২ পাউন্ড সাদা পাউডার উদ্ধার করা হয়। তাদের হাইহিলের মধ্যেও ঐ পাউডার ছিল। এই পাউডার দিয়ে শক্তিশালী প্লাস্টিক বিস্ফোরক বানানো যায়। তাদের সুটকেসে প্রচুর ডেটোনেটরও পাওয়া যায়। জিজ্ঞাসাবাদে দুই তরুণীই কান্নায় ভেঙে পড়ে। তারা জানায়, তারা দুবোন এবং তাদের বাবা মরক্কোর একজন ধনী ব্যবসায়ী। প্যারিসে এক লোক তাদের চুক্তিবদ্ধ করলে তারা এডভেঞ্চারের বশে স্মাগলিংয়ের কাজ করে।

ঐ দিন বিকেলে তেলআবিবের একটি ছোট্ট হোটেলে তল্লাশী চালিয়ে ইসরাইলি পুলিশ এক বৃদ্ধ দম্পতিকে আটক করে। পুলিশ তাদের রেডিও ট্রানজিস্টার খুলে প্রচুর পরিমাণ বিস্ফোরক আটক করলে তারা কান্নায় ভেঙে পড়ে।

পরের দিন আরেক ফরাসি তরুণীকে আটক করে ইসরাইলি পুলিশ। সে-ও ভুয়া পাসপোর্ট নিয়ে ইসরাইলে ঢুকেছে। সে যে একজন পেশাদার সন্ত্রাসী, একজন ফ্যানাটিক মার্ক্সবাদী মোসাদ তা জানত। সে বহুবার সন্ত্রাসী হামলায়

অংশ নিয়েছে।

জিজ্ঞাসাবাদে এই দলটি জানায়, তারা তেলআবিবের নয়টি বিখ্যাত হোটেল পর্যটন মৌসুমে উড়িয়ে দিতে ইসরাইল ঢুকেছে। ইসরাইলিসহ ব্যাপকসংখ্যক পর্যটক হত্যা তাদের টার্গেট। ইসরাইলকে অস্থিতিশীল করাই তাদের লক্ষ্য।

এদের সকলকে জেলে পাঠানো হল। কিন্তু এদের নেপথ্যের মানুষটি হলেন মোঃ বউদিয়া। আলজেরিয়ার বংশোদ্ভূত বউদিয়া প্যারিসে থিয়েটারের পরিচালক। অনেক নারীর সঙ্গেই তার পরকীয়া বিদ্যমান।

বউদিয়া মূলত জর্জ হাবাম এবং পিএফএলপির নির্দেশনায় চলেন। পাসওভার টিম ধরা পড়ে গেলে বউদিয়া ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর গ্রুপে যোগদান করেন। তিনি সংগঠনের প্যারিস শাখার প্রধান। মোসাদের সঙ্গে সংযুক্তির দোহাই দিয়ে প্যারিসে এক সিরিয় সাংবাদিককে তারা হত্যা করেছিল। ইউরোপে ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের অভিযান পরিচালনার দায়িত্বেও বউদিয়া।

১৯৭৩ সালে মোসাদের একটি টিম বউদিয়াকে হত্যার টার্গেট নিয়ে প্যারিসে আসে। বউদিয়ার নতুন প্রেমিকার নাম-ঠিকানা মোসাদের হাতে ছিল। ঐ প্রেমিকার বাড়ির আশে-পাশে মোসাদ এজেন্ট লুকিয়ে অবস্থান নেয়। বউদিয়া প্রেমিকার কাছে আসেন বটে কিন্তু পরদিন অন্যরা কাজে বেরিয়ে গেলে বউদিয়ার কোনো পাত্তা নেই। এক মাস শেষে মোসাদ এজেন্ট উপলব্ধি করে যে, বউদিয়া প্রতিদিনই তার প্রেমিকার বাসায় আসেন এবং মহিলার সাজে অন্যদের সঙ্গে বেরিয়ে যান।

বর্তমানের যে সমস্যাটি, বউদিয়া কিছুদিন হল আর তার প্রেমিকার কাছে আসেন না। ফলে মোসাদ তাকে হারিয়ে ফেলে। তবে তাদের কাছে একটা তথ্য অবশ্য ছিল। আর তা হল বউদিয়া প্রতিদিন সকালে সাবওয়ে মেট্রো ও কানেকটিং ট্রেন ধরে মিটিং করতে যান। কিন্তু সাবওয়েতে লক্ষ মানুষ। বহুরূপী বউদিয়াকে ধরা অত সহজ নয়।

মোসাদ বউদিয়ার কয়েকশত ছবি বিলি করে গোয়েন্দাদের মধ্যে এবং সাবওয়েতেই নিয়োজিত অসংখ্য গোয়েন্দাদের মধ্যে একজন বউদিয়াকে চিহ্নিত করে ফেলে। গোয়েন্দারা সারা রাত বউদিয়ার গাড়ি অনুসরণ করে তার নতুন প্রেমিকার বাড়ি ও বউদিয়ার সন্ধান পায়। ১৯৭৩ সালের ২৯ জুন বউদিয়া নিজের গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেটি বিধ্বস্ত হয়। মারা যান বউদিয়া। ইউরোপের রিপোর্টারদের সংবাদ, মোসাদ-প্রধান জভি জামির অদূরে

দাঁড়িয়ে বউদিয়ার গাড়ি বিধ্বস্ত হওয়ার দৃশ্যাবলী দেখছিলেন।

মোসাদ কর্মকর্তাদের এই সাফল্য উৎসবে রূপান্তরের সুযোগ নেই। এরি মধ্যে জরুরি খবর এল ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের বিশেষ বার্তাবাহক বেন আমান আলি হাসান সালামেহ্র সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে নরওয়ের পর্যটন কেন্দ্র লিলেহ্যামারে যাচ্ছেন।

এর কয়েকদিনের মধ্যে মোসাদ লিলেহ্যামারে পজিশন নেয়। এই শান্ত পাহাড়ী এলাকায় সালমেহ্রের কী ধরনের কাজ থাকতে পারে কারো মাথায় তা ঢুকছিল না। মোসাদ বেন আমানাকে সেখানাকার সুইমিং পুলে মধ্যপ্রাচ্যের চেহারার আদলে এক লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেখে। মোসাদ ছবি মিলিয়ে নিশ্চিত হয় এই লোকটিই সালামেহ্। মোসাদ গোয়েন্দাদের একজন অবশ্য এই ধারণার বিরোধিতা করে। তার বক্তব্য সালামেহ্ কিছুতেই নরওয়েজিয়ান ভাষা বলতে পারেন না।

মোসাদ কথিত সালামেহ্র সঙ্গে নরওয়ের এক নারীর যোগসাজশ প্রত্যক্ষ করে। এই কমবয়সী নারী সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা।

সালামেহ্কে কতল করার যাবতীয় উদ্যোগ নেয় মোসাদ। গোয়েন্দা সংখ্যা বাড়ায়। কিছু পর্যটকের মোসাদের অতিমাত্রায় তৎপরতা নজর কাড়ে। ছোট্ট শহর বলেই হয়তো। কেননা পর্যটকরা যেসব দ্রষ্টব্য স্থানে যাচ্ছে এই পর্যটকদের গন্তব্য সেই স্থানে।

১৯৭৩ সালের ২১ জুলাই কথিত সালমেহ্ এবং ঐ অন্তঃসত্ত্বা তরুণী সিনেমা দেখে বাড়ি ফেরার পথে এক নির্জন স্থানে মোসাদের কবলে পড়ে। মোসাদ কথিত সালেমেহ্কে চৌদ্দটি গুলি করে হত্যা করে।

তাহলে রেড প্রিন্স নিহত হলেন। মোসাদ ঘাতকসহ শীর্ষ নেতাদের অনেকেই নরওয়ে ছেড়ে গেছে। বাড়ি ও গাড়ি ভাড়া দেয়ার জন্য থেকে যাওয়া কয়েকজন গোয়েন্দা এক অপ্রত্যাশিত ঘটনায় গ্রেফতার হয়। এই গ্রেফতারের মাধ্যমে মোসাদের থলের বিড়াল বেরিয়ে আসে। অনেক কাগজপত্র উদ্ধার করে নরওয়ের পুলিশ। ইসরাইলি দূতাবাসের এক নিরাপত্তা কর্মীর সঙ্গেও মোসাদের যোগসূত্র উদঘাটিত হয়।

পরদিন নরওয়ের পত্র-পত্রিকায় ইসরাইলি গোয়েন্দাদের গ্রেফতারের খবর ছাপা হলে মোসাদের মর্যাদা ও ক্রেডিবিলিটি ক্ষুণ্ন হয়। মোসাদের আরও বেশি ক্ষতি হয় যখন পত্রিকায় ছাপা হয় যে ভুল লোককে মোসাদ হত্যা করেছে।

নরওয়েতে যাকে হত্যা করেছে মোসাদ তিনি আলি হাসান সালমেহ নন। তার নাম আহমদ বুশিকি। মরক্কোর এই ওয়েটার নরওয়েতে চাকরি খুঁজতে এসেছিল। বুশিকি এদেশে এসে নরওয়ের এক নারীকে বিয়ে করে। তার স্ত্রীই সাত মাসের ঐ অন্তঃসত্ত্বা মহিলা।

মোসাদ গোয়েন্দাদের গ্রেফতার ও বিচার নিয়ে বিশ্বমিডিয়ায় তোলপাড়ের সৃষ্টি হয়। বিচারে কয়েক মোসাদ গোয়েন্দাকে দীর্ঘ কারাবাস দেয়া হয়।

নরওয়ের এই বিপর্যয়ের পর মোসাদ তাদের নীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনে। বাড়ি ভাড়া নেয়ার পাট চুকে যায়। অনেকের চাকরি যায় এবং সোর্সের তালিকা পরিবর্তন করা হয়। মোসাদ আহমদ বুশিকিকে হত্যার দায় স্বীকার করে তার পরিবারকে ৪ লক্ষ ডলার ক্ষতিপূরণ দেয়। তবে মোসাদের মর্যাদার যে ক্ষতি হয়েছে তার মূল্য অনেক অনেক বেশি।

ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মেয়ার মোসাদ-প্রধান জভি জামিরকে আলোচ্য প্রকল্পের ইতি টানার নির্দেশ দেন। এদিকে সামনে আরও বড় ঘটনা ঘটে। ৬ অক্টোবর মিসর ও সিরিয় হঠাৎ করে ইসরাইল আক্রমণ করে। শুরু হয় ইয়ুম কিপ্পুর যুদ্ধ।

এই ঘটনার পর দু'বছর অতিক্রান্ত হয়। ১৯৭৫ সালে বিশ্বের সেরা সুন্দরীকে এক বৈরুত পরিবার সম্বর্ধনা দেয়। চার বছর আগে এই সুন্দরী মিস ইউনিভার্স হয়েছিলেন। এই গর্জিয়াস লেবানী সুন্দরী ফলশ্রুতিতে বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করার প্রচুর সুযোগ পান। লেবানন ফিরে এই সুন্দরী সুপার মডেল হিসেবে তার ক্যারিয়ার গড়তে যেমন সমর্থ হন তেমনি একটি ফ্যাশন বুটিকের মালিকও হন।

যাহোক ১৯৭৫ সালের ঐ পার্টিতে ঐ বিশ্ব সুন্দরী সুদর্শন, ক্যারিশমেটিক এক তরুণের সঙ্গে পরিচিত হন। তারা ভালোবাসায় সিক্ত হন। এবং দু'বছর পরে ১৯৭৭ সালের ৮ জুন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

আর এই সুখী বরটি হলেন আলি হাসান সালেমেহ।

১৯৭৩ সালে ব্লাক সেপ্টেম্বর সংগঠনের বিলুপ্তি ঘটলে আলি হাসান সালেমেহ আরাফাতের দক্ষিণ হস্তে পরিণত হন। আরাফাত তাকে পুত্র হিসেবে দত্তক নেন। এমনও প্রচারণা ছিল একদিন তিনি আরাফাতের স্থলাভিষিক্ত হবেন। হবেন দলীয় প্রধান।

ব্লাক সেপ্টেম্বরের অবলুপ্তির পর সালামেহ ফোর্স সেভেনটিন নামের একটি

গ্রুপের প্রধান হন। একবার সালামেহ্ আরাফাতের সফরসঙ্গী হয়ে নিউইয়র্কে যান।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে যোগদানকালেও আরাফাতের কোমরে রিভলবার ছিল। আরাফাত ও সালেমেহ্ এক সঙ্গে মস্কো যান এবং বিশ্বনেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। ইসরাইলের আতিশয্য দেখে সিআইএ সালেমেহর প্রতি আকৃষ্ট হয়। সিআইএ রেড প্রিন্স সালেমেহ'র রক্তাক্ত অতীত আজ বিস্মৃত হতে চায়। সালেমেহ মিউনিখ ম্যাসাকারের প্রধান ব্যক্তি। খার্তুমে যে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে হত্যা করা হয়েছিল তারও পরিকল্পনাকারী এই সালেমেহ। যাহোক সিআইএ বিশ্বের এই শীর্ষ সন্ত্রাসীকে তাদের গোয়েন্দা নিয়োগ করে। আমেরিকা ভেবেছিল সালেমেহ তাদের অনুগত হবেন। সিআইএ তাকে হাজার হাজার ডলার অফার করলেও সালেমেহ্ একটি অফার গ্রহণ করেছিলেন। সিআইএর টাকায় সালমেহ্ দীর্ঘদিন হাইওয়াইতে অবকাশ যাপন করেন।

সালেমেহর জীবনধারা বদলে গিয়েছিল। তার বন্ধুরা মনে করতেন আগের মতো ঝুঁকি নেই সালেমেহর জীবনে। কিন্তু সালেমেহ ভাবতেন তার উল্টোটা। তিনি জানতেন, তাকে আর বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখা হবে না। এক সাংবাদিককে তিনি বলেছিলেন আমাকে কেউ বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না।

ইসরাইল প্রকৃতপক্ষে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিল।

ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের বিলুপ্তির পর ইসরাইলে প্রশাসনে নানা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মেয়ার বিদায় নিয়েছেন। তার উত্তরসূরী আইজাক রবীন পদত্যাগ করেছেন। এখন প্রধানমন্ত্রীর মেনাচেম বেগিন। মোসাদ-প্রধান জভি জামিরের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন জেনারেল ইটসাক হোকি। এদিকে ইসরাইলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৬ সালে এয়ার ফ্রান্সের একটি বিমান উগান্ডায় ছিনতাই হলে ইসরাইলের ছত্রীসেনা ও সায়েরের্ত মাটকাল এক দু:সাহসিক অভিযান চালিয়ে সেটি উদ্ধার করে। ফাতাহর লোকজন ইসরাইলে ঢুকে একটি বেসামরিক বাস ছিনতাই করলে ৩৫ যাত্রী নিহত হয়। যদিও ফাতাহ'র লোকজন শেষতক হার মানে।

ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেগিন কঠোর মনোভাব গ্রহণ করলে সন্ত্রাসীদের তালিকায় আবার সালেমেহ'র নাম নথিভুক্ত হয়।

ছদ্মবেশে এক মোসাদ গোয়েন্দাকে বৈরুতে পাঠানো হয়। সালেমেহ যে ক্লাবে ব্যায়াম করতেন এই গোয়েন্দাও সেই ক্লাবের সদস্য হন। একদিন এই

গোয়েন্দার মুখোমুখি হন সালেমেহ। তখন তিনি ছিলেন উলঙ্গ। সিদ্ধান্ত হয় সালেমেহকে ব্যায়ামাগারে হত্যা করা সহজ হবে। আরেকপক্ষ বলল, এতে অনেক সাধারণ নাগরিকও নিহত হতে পারে।

এই সময় দৃশ্যে প্রবেশ এক ইংলিশ মহিলার। এই রহস্যময়ী সিঙ্গেল, এবং চার বছর ধরে জার্মানিতে তার বসবাস। এই মহিলা গরীব শিশুদের অনুদান দিয়ে থাকে-সমাজকর্মী হিসেবে। প্রতিবেশীরা তাকে পেনিলোপে নামে জানে। সে একবার আলি হাসান সালামেহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে বলে জানা যায়। এই নি:সঙ্গ মহিলা সাধারণ কাপড়-চোপড় পরত। রাস্তায় প্লেটে খাবার নিয়ে বিড়ালকে খাওয়াত। ছবি আঁকা তার হবি। তবে সে সব ছবি দেখে তাকে খুব বেশি নাম্বার দেয়া যাবে না।

পেনিলোপে লক্ষ্য করল দুটি গাড়ি প্রতিদিন একই সময়ে বেরিয়ে ফাতাহ সদর দফতরে যায়, দুপুরে খানিক সময়ের জন্য ফিরে আসে আবার বিকেলে একই সময়ে একই স্থানে যায়। বাইনোকুলার দিয়ে উদ্‌ঘাটন করা হল যে, শেভ্রোলেট গাড়িটিতে দু'জন সশস্ত্র দেহরক্ষী নিয়ে পেছনের সিটে বসেন সালামেহ। ল্যান্ড রোভার গাড়িতে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা থাকে এবং তাকে ফলো করে।

সুন্দরী মডেল জিয়োরজিনাকে বিয়ের পর সালামেহর জীবনধারা অনেকটা কেরানির জীবন হয়ে উঠে। সোলুব্রা এলাকায় এই দম্পতির বাস। তবে গোয়েন্দা বা নেতৃস্থানীয়রা যে প্যাটার্নে তাদের জীবন পরিচালিত করে সালেমেহ সে পথ থেকে সরে গেছেন। যেমন এক বাড়িতে এ ধরনের লোকেরা বেশি দিন বসবাস করেন না। ঘড়ি ধরে যাতায়াত করেন না।

যাহোক সালেমেহকে আটকের জন্য মোসাদ গোয়েন্দারা নানা নাম ও পরিচয়ে বৈরুতে আসা শুরু করল। এরি মধ্যে তিনটি ইসরাইলি মিসাইল বোট বৈরুত ও যৌনিয়েহ বন্দরের মাঝামাঝি বীচে অবস্থান নিল। তারা ভেজা বালুতে প্রচুর পরিমান বিস্ফোরক রেখে গেল। মোসাদের গোয়েন্দারা যা করে, অভিযানের চূড়ান্ত হতেই কয়েকজন দেশ ছেড়ে চলে যায়। গেলও। পৌনে চারটার সময় সালেমেহ তার গাড়ি দেহরক্ষী নিয়ে ফাতাহ সদর দফতরে যথারীতি যাবেন। গাড়িটি সামান্য সামনে এগুলো মাত্র বোমার বিস্ফোরণ ঘটল। রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে বোমাটি ফাটনো হয়। দক্ষ মোসাদ গোয়েন্দা রিমোটটি দাবিয়ে দেয়। দুই গাড়িই বোমার আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেলে আলি হাসান সালেমেহসহ বেশ কয়েকজন নিহত হন।

দামেস্কের একটি হোটেলে আরাফাত মিটিং করছিলেন। সালেমেহর মৃত্যু

সম্বলিত টেলিগ্রামটি তার হাতে পৌঁছলে তিনি কেঁদে ফেলেন।

ঐ দিনই রাবারের একটি ডিঙ্গি যাউনিয়েহ বীচে ভিড়লে মোসাদ গোয়েন্দা কোলবার্গ ও সেই ইংলিশ রমণী লাফ দিয়ে তাতে উঠেন। তাদের মাদার শীপে পৌঁছে দেয়া হলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে তারা ইসরাইলে পৌঁছে যায়। লেবাননের পুলিশ মোসাদ গোয়েন্দাদের ভাড়া করা গাড়িটি ঐ বীচ থেকে উদ্ধার করে বটে।

পেনিলোপে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস করত। পরে সে স্থায়ীভাবে ইসরাইলে চলে যায়। সে একজন ব্রিটিশ ইহুদি। যাহোক ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর দলটি সালেমেহর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নিশ্চিহ্ন হলে গেল।

এরপর পেরিয়ে গেছে বহু বহু বছর। ১৯৯৬ সালের ড্যানিয়েল বেন সিমন নামের এক ইসরাইলি সাংবাদিককে তার বন্ধুরা জেরুজালেমের এক পার্টিতে দাওয়াত দিল। সেই পার্টিতে চোস্ত ইংরেজি বলতে পারদর্শী এক সুদর্শন তরুণের সঙ্গে সিমনের পরিচয় ঘটল। সে নিজেই পরিচিত হয়ে তার নাম বলল, আলি হাসান সালামেহ।

সিমন বলল, এই নামে বহু আগে একজন ছিলেন বটে। মিউনিখে ইসরাইলি এথলেটদের হত্যাকাণ্ডে তিনি পরিকল্পনাকারী ছিলেন।
সুদর্শন তরুণটি বলল, সেই ব্যক্তি আমার বাবা। মোসাদ তাকে হত্যা করেছে। তরুণটি আরও জানাল, সে তার মায়ের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে ইউরোপে বসবাস করছে। আরাফাতের মেহমান হয়ে এদেশে এসেছে।

সুদর্শন তরুণটি বলল, আমি বিশ্বাস করি না এমন একটা দিন আসবে সেদিন ইসরাইলি মেয়েদের সঙ্গে আমি ডান্স করতে পারব। তরুণটি ইসরাইলিদের আতিথেয়তার ভূয়সী প্রশংসা করল। ইসরাইল ও ফিলিস্তিনীদের দ্বন্দ্ব সে মেটাতে চায় বলেও জানাল। বলল, আমি একজন শান্তিবাদী মানুষ। শতকরা একশ ভাগ। আমার বাবা যুদ্ধাবস্থায় এখানে বাস করতেন। সেজন্য তিনি তার জীবন দিয়ে গেছেন। কিন্তু বর্তমানে নতুন যুগের সূত্রপাত হয়েছে। আমি আশা করি দুই দেশের জনগণের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ার প্রেরণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

সিরিয়ায় ইসরাইলি গুপ্তচরের ফাঁসি

প্রিয় নাদিয়া, প্রিয় আমার পরিবার
এই লেখাই আমার শেষ লেখা। আমি আশা করব তোমরা সকলে একত্রে সারাজীবন বসবাস করবে। আমি আমার স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইছি। আমার স্ত্রী যেন নিজ খেয়াল রাখে এবং সন্তানদের সুশিক্ষা দেয়--- আমার প্রিয়তম নাদিয়া, তুমি আবার বিয়ে করতে পার। আমার ছেলে-মেয়েরা তাহলে একটা বাবা পাবে। এক্ষেত্রে তোমাকে সর্বাত্মক স্বাধীনতা দিলাম। আমার শেষ চুম্বন নাও। প্লীজ আমার আত্মার জন্য প্রার্থনা কর। ইতি তোমার এলি।

১৯৬৫ সালে ইসরাইলি গোয়েন্দা বাহিনী মোসাদের নতুন প্রধান মেইর অমিতের টেবিলে চিঠিটি পৌছে। গোয়েন্দাগিরির ইতিহাসে অন্যতম বলিষ্ঠ গোয়েন্দা এলি কোহেন কাঁপা কাঁপা হাতে এই চিঠিটা লিখেছেন। সিরিয়র রাজধানী দামেস্কে অকাল মৃত্যু হতে যাচ্ছে এই গোয়েন্দার। মৃত্যুর আগে লেখা হয়েছে এই চিঠি।

এলি কোহেনের গোয়েন্দাবৃত্তির জীবন কুড়ি বছরের। তিনি একজন মিসরীয় ইহুদি। তরুণ, সুদর্শন এলি কোহেনের সঙ্গে বাড়ি ফেরার পথে তার এক পুলিশ বন্ধুর দেখা। কথা প্রসঙ্গে পুলিশটি বলে যে, আজ আমরা বেশ কিছু ইসরাইলি সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করব। এদের মধ্যে একজন হল শমুয়েল আজ্জর।

এলি কোহেন কথাটা শুনে চমকে গেলেও বন্ধু পুলিশ অফিসারের কাছ থেকে হাসিমুখে বিদায় নিয়ে হনহনিয়ে নিজ বাসায় গেলেন। তার ভাড়া বাসা থেকে মুহূর্তে বিস্ফোরক, হ্যান্ডগান এবং ডকুমেন্টসমূহ সরিয়ে ফেললেন। এলি কোহেন প্রকৃতপক্ষে মিসরে চোরাগুপ্তা হামলাদির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। মিসর থেকে ইসরাইলে যেতে আগ্রহী ইহুদিদের পালানোর পথ আবিষ্কারে এবং তাদের জন্য ভুয়া কাগজ তৈরির কাজেও ব্যাপৃত ছিলেন এলি কোহেন। মিসরের জেলে আটক ইসরাইলি বন্দিদের মুক্ত করতে তৎপর একটি আন্ডারগ্রাউন্ড দলের সঙ্গেও এলি কোহেন সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

১৯৫৪ সালে প্রথমার্ধে ইসরাইলি নেতারা জানতে পারেন ব্রিটিশ সরকার মিসর থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেবে। মিসর আরব দেশগুলোর মধ্যে সবচে শক্তিশালী এবং ইসরাইলকে বিন্দুমাত্র সহ্য করতে পারে না। ব্রিটিশ সৈন্য মিসরে অবস্থানের ফলে সেখানে তারা সুয়েজ খালকে ঘিরে অসংখ্য সামরিক

স্থাপনা ও বিমান ঘাঁটি নির্মাণ করে। ইসরাইল মনে করে সব মিলিয়ে মিসরের ক্ষমতাসীন সামরিক সরকারের ওপর ব্রিটিশদের প্রভাব রয়েছে। এখন ব্রিটিশরা মিসর ছেড়ে গেলে ঐ সব সামরিক স্থাপনা ও প্রভূত অস্ত্রশস্ত্র মিসরের হাতে এসে পড়বে। আবার মিসরের মধ্যে যুদ্ধংদেহী মনোভাব বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। এদিকে ইসরাইল তখন নবীন রাষ্ট্র। মাত্র ছয় বছর আগে স্বাধীনতা পেয়েছে। সর্বোপরি ইসরাইলের প্রতি মিসরের ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত। কেননা ১৯৪৮ সালের ইসরাইলের স্বাধীনতা যুদ্ধে মিসর তাদের হাতে পরাজিত হয়েছিল। নতুন শক্তি বলে বৃহৎ দেশ মিসর ইসরাইলকে এবার এক হাত দেখে নেবে।

ব্রিটিশদের মিসর থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত কী প্রত্যাহার করানো যায়? বেন গুরিয়েন এখন আর ইসরাইলের শীর্ষ পদে নেই। তিনি অবসরে গেছেন। তার স্থলাভিষিক্ত যিনি হয়েছেন সেই মোশে শ্যারেট মডারেট কিন্তু দুর্বল চিত্তের লোক। প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিনহাস ল্যাভেন প্রতিনিয়ত তার সঙ্গে কোন্দলে লিপ্ত। শ্যারেটকে না জানিয়ে এবং মোসাদের সঙ্গে কোনো আলোচনা ছাড়াই ল্যাভেন এবং সামরিক গোয়েন্দা বাহিনীর (আমান) প্রধান কর্নেল বেঞ্জামিন ভয়ংকর ও বোকাসুলভ একটা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। ব্রিটিশ ও মিসরের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ঘেঁটে তারা দেখতে পান, ব্রিটিশরা যে কোনো সময় আবার মিসরে ফিরে আসার ক্ষমতা রাখে যদি মিসরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। ইসরাইলের ঐ দুই নেতা সারল্যের সঙ্গে মিসরে অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা চাঙ্গা করান। মিসরের সর্বত্র শুরু হয় বোমাবাজি, সন্ত্রাসী হামলা ইত্যাদি। ল্যাভেন ও কর্নেল বেঞ্জামিনের নির্দেশ মোতাবেক মিসরে অবস্থিত ব্রিটিশ ও মার্কিনিদের বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা-বোমাবাজি শুরু হয়ে যায়। ঐ দুই দেশের লাইব্রেরী, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, সিনেমা, ডাকঘর এবং বেসামরিক ভবনাদি ছিল হামলার লক্ষ্যবস্তু। উদ্দেশ্য একটাই আইন, শৃঙ্খলার দোহাই দিয়ে ব্রিটিশরা যেন মিসর ছেড়ে চলে না যায়। গোয়েন্দা সংস্থা আমান মিসরের বেশ কিছু ইহুদিকে এই গোলযোগ সৃষ্টির দায়িত্ব দেয়। এসব তরুণরা আবার ইসরাইলের অনুকূলে সর্বদা জীবন দিতে প্রস্তুত। তবে এই আচরণের মাধ্যমে গোয়েন্দা বৃত্তিতে যে পূত পবিত্র এবং নৈতিক দিক থাকে তা লংঘিত হয় এবং খোদ ইসরাইলের অন্য গোয়েন্দা সংস্থা তার সমালোচনা শুরু করে। তাদের যুক্তি হল, স্থানীয় ইহুদিদের দ্বারা গোলযোগ করালে মিসরের অন্য ইহুদিদের জীবন বিপন্ন হতে পারে। সর্বোপরি এসব তরুণ-তরুণীদের দাঙ্গা করার প্রাথমিক প্রশিক্ষণও নেই।

ইহুদিদের নিক্ষিপ্ত বোমাগুলো যেমন শক্তিশালী ছিল না তেমনি অপরিণত।

চশমার খাপে কিছু বিস্ফোরক ভরে এগুলো তৈরি। কন্ডোমের মধ্যে বিস্ফোরক ভরেও কিছু দুর্বল বোমা বানানো হল। আসলে বোমাবাজির পরিকল্পনা প্রথম দিকেই ভেস্তে যায়। ২৩ জুলাই ফিলিপ নাটাসোন নামের এক লোকের পকেটেই একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। আলেকজান্দ্রিয়ার একটি সিনেমা হলের গেটে ইহুদিবাদী ফিলিপের পকেটে এই বোমাটি বিস্ফোরিত হলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। এভাবে সকল বোমাবাজ ঐ সূত্র ধরে গ্রেফতার হয়।

এলি কোহেনও গ্রেফতার হয়েছিলেন কিন্তু তার বাড়িতে আপত্তিকর কিছু না পাওয়ায় মুক্ত হন। কিন্তু মিসরের পুলিশ তার নামে একটা ফাইল খোলে। এতে তার চৌদ্দগোষ্ঠীর বৃত্তান্ত তার ছবি নথিভুক্ত করা হয়। বিবরণীতে লেখা হয়, ১৯২৪ সালে মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ায় এলি কোহেনের জন্ম। ফরাসি কলেজ থেকে এলি গ্রাজুয়েশন করেছেন এবং কায়রোর ফারুক ইউনিভার্সিটির ছাত্র।

এলি কোহেনের সাত ভাই-বোন অজানার উদ্দেশ্যে দেশান্তরী হয়েছেন। তবে মিসর পুলিশের জানা ছিল না যে, এলি কোহেনের পরিবার স্থায়ীভাবে ইসরাইলে চলে গেছেন।

গ্রেফতার হওয়া সত্ত্বেও এলি কোহেন মিসরে থেকে যেতে মনস্থ করেন। মিসরের জেলে তার সমভাবাপন্ন কর্মীদের কাকে কী পরিমাণ নির্যাতন করা হচ্ছে তা তিনি লিখে রাখতে শুরু করেন।

অক্টোবরে মিসর সরকার ইসরাইলি গোয়েন্দাদের শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়। ৭ ডিসেম্বর কায়রোতে এসব মামলার শুনানি শুরু হয়। দলবলসহ গ্রেফতার হওয়া ম্যাক্স ব্যানেট গ্রেফতার হলে কবজি কেটে আত্মহত্যা করে। সব মামলাতেই রাষ্ট্রপক্ষ মৃত্যুদণ্ড দাবি করে। এদিকে মিসরের এই কড়াকড়িতে বিশ্altবিবেক তীব্র প্রতিবাদ করে। ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রদূতবৃন্দ এবং বহু দেশের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ বিচারের নামে প্রহসনের নিন্দা করে তা বন্ধের দাবি জানান। এদিকে মিসরের একটি বিশেষ আদালত একটি মামলায় কয়েকজনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেয় এবং ড. মোশে মারজুক ও প্রকৌশলী আজরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। চারদিনের মাথায় কায়রো জেলখানায় তাদের ফাঁসি কার্যকর হয়। এই ফাঁসির প্রতিবাদে ইসরাইল সরকার দেশের মানুষের সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। সবারই প্রশ্ন, এই ধরনের বোমাবাজির বোকা বোকা পরিকল্পনার নেপথ্যে কে। বেশ কয়েকটি তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়। প্রতিরক্ষামন্ত্রী ল্যাভোন ও গিবলি পরস্পরকে দোষারোপ করেন। ল্যাভোনকে পদত্যাগে বাধ্য করে

সেখানে বেন গুরিয়োনকে ফিরিয়ে আনা হয়। কর্নেল গিবলিকে আর পদোন্নতি না দেয়ার সিদ্ধান্ত হলে এক পর্যায়ে তিনি সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করেন।

মিসরে এলি কোহেন তার কয়েকজন সেরা বন্ধুকে হারালেও তিনি সেখানেই থেকে যেতে মনস্থ করেন। আর নাশকতামূলক কার্যকলাপও তিনি সমানে চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৯৫৭ সালের সুয়েজ খাল নিয়ে যুদ্ধের পরে এলি কোহেন ইসরাইলে দেশান্তরী হন।

ইসরাইলে আসার পর এলি কোহেন প্রায় প্রতিদিনই তার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। ইসরাইলে তার শুরুর দিকটা খুব সহজ ছিল না। কয়েক সপ্তাহ ধরে চাকরি খুঁজছিলেন তিনি। তিনি আরবি, ফরাসি, ইংরেজি এমনকি হিব্রু ভাষায়ও তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। গোয়েন্দা বাহিনী আমানের একটি মাসিক পত্রিকায় অনুবাদকের কাজ পেলেন এলি কোহেন। তেলআবিবের একটি বাণিজ্যিক অফিসের ছদ্মাবরণে তাদের কাজ চলত। এলি কোহেনের বেতন খারাপ ছিল না। মাসে ১৭০ ইসরাইলি পাউন্ড বা ৯৫ মার্কিন ডলার। কয়েক মাস পরে তার চাকরি চলে যায়। এক মিসরীয় ইহুদি বন্ধু তাকে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে চাকরি দেয়। চাকরিটি বোরিং হলেও বেতন ভালো। ঐ সময় এলির ভাই ইরাকী বংশোদ্ভূত এক সুন্দরী স্মার্ট নার্সের সঙ্গে এলি কোহেনের পরিচয় করিয়ে দেন। এক মাস ডেটিং করে এলি কোহেন নাদিয়াকে বিয়ে করেন। নাদিয়ার ভাই সামি মাইকেল তখনকার একজন উঠতি বুদ্ধিজীবী। যাহোক, একদিন সকালে এলি কোহেনের অফিসে ইসরাইলি গোয়েন্দা বিভাগের এক লোক এসে নিজেকে জালমান বলে পরিচয় দেন। জালমান এলি কোহেনকে চাকরির অফার দেন।

এলি কোহেন চাকরির ধরন জানতে চাইলে জালমান জানান, খুব ভালো চাকরি। আপনি চাকরির সুবাদে ইউরোপে যথেচ্ছ ভ্রমণ করতে পারবেন। তবে সম্ভবত আমাদের গোয়েন্দা হিসেবে আরব দেশগুলোতে আপনাকে বেশি বেশি কাটাতে হবে।

এলি কোহেন ওই চাকরি প্রত্যাখ্যান করে বলেন, আমি মাত্র বিয়ে করেছি। আমি ইউরোপ কিম্বা অন্যত্র সফর করতে চাই না। ইতিমধ্যে এলি কোহেনের স্ত্রী নাদিয়া গর্ভবতী হন। নাদিয়াকে তার চাকরি ছাড়তে হয়। ওদিকে এলির চাকরিটিও চলে যায় এবং বেকার বসে থাকেন।

একদিন এলি কোহেনের ভাড়া বাড়িতে আবার আগমন ঘটে জালমানের। জালমান তাকে জিজ্ঞেস করেন, কেন আমাদের চাকরিতে আপনার অনীহা।

মাসে আমরা আপনাকে ১৯৫ মার্কিন ডলার দেব। প্রথম ছয় মাস প্রশিক্ষণ শেষে আপনি ইচ্ছে করলে চাকরি ছেড়েও দিতে পারেন। এবার এলি কোহেন আর না করলেন না। তিনি হয়ে গেলেন ইসরাইলের একজন গোয়েন্দা।

গোয়েন্দা বাহিনী আমানের কয়েক সদস্যের অভিমত অবশ্য ভিন্নতর। তাদের মতে ইসরাইলে আসার পর অতিমাত্রার যোগ্যতার কারণে এলি কোহেনের আমানে চাকরি হয়নি। মানসিক পরীক্ষায় তাকে অতিমাত্রায় আত্মপ্রত্যয়ী মনে করেছিলেন আমানের পরীক্ষকরা। কেননা তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় সাহসী। স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর। মোটকথা ঈশ্বরপ্রদত্ত অনেক গুণ প্রতিভাত হত তার মধ্যে। তবে তাকে নিয়ে সমস্যা হল নিজের সম্পর্কে তার ধারণা ছিল অতিমাত্রায় উঁচু এবং প্রয়োজন ছাড়াই বড় ধরনের ঝুঁকি নেয়ার প্রবণতা ছিল তার মধ্যে প্রকট।

ষাট দশকের শুরুতে আমানের স্পেশাল ইউনিটে সিরিয়র দামেস্কের জন্যও একজন চৌকস অফিসারের প্রয়োজন পড়ল। বিগত কয়েক বছর ধরে সিরিয় অতিমাত্রায় আগ্রাসী আরব দেশ হয়ে উঠেছিল। ইসরাইলকে সিরিয় জাতশত্রু মনে করত। আর এমন কোনো যুদ্ধ নেই যেখানে সিরিয় ইসরাইলকে আক্রমণ করেনি। গোলান উপত্যকায় সিরিয়-ইসরাইলের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছে। ইসরাইলি সীমান্তে সিরিয় অসংখ্য সন্ত্রাসী স্কোয়াড পাঠিয়েছে। সাম্প্রতিককালে সিরিয় বিশাল এক প্রকল্প হাতে নিয়েছে। উদ্দেশ্য, ইসরাইল যাতে কোনোভাবেই জর্ডান নদীর পানি না পায়।

পঞ্চাশের দশকের শেষার্ধে ইসরাইল মরুপ্রবণ নেগেভ অঞ্চলে পানি সেচের জন্য বিশাল একটা প্রকল্প স্থাপন করে। এই পানি নেয়া হচ্ছিল জর্ডান নদী থেকেই। ইসরাইলের যে অংশ দিয়ে জর্ডান নদী গেছে সেখান থেকেই পানি নেয়া হচ্ছিল। এই পানি নেয়া নিয়ে অসংখ্যবার আরব শীর্ষ সম্মেলন হয়েছে। আরব দেশগুলো অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে জর্ডান শাখানদীর পানি অন্যত্র প্রবাহিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। উদ্দেশ্য ইসরাইলের উক্ত প্রকল্পটিকে ব্যর্থ করে দেয়া এবং সিরিয়র ওপরও সে দায়িত্ব বর্তায়।

জর্ডান নদীর পানি ছাড়া ইসরাইলের অস্তিত্ব থাকবে না। ইসরাইলের উপলব্ধি হল সিরিয়কে সফল হতে দেয়া যাবে না। এজন্যই দামেস্কে তাদের একজন চৌকস গোয়েন্দা নিয়োগ জরুরি। আর সেই গোয়েন্দাকে হতে হবে বিশ্বস্ত প্রত্যয়ী এবং দুঃসাহসী। এসব গুণের কারণেই এক সময় আমান থেকে এলি কোহেন বাদ পড়েছিলেন। আর আজ এলিকেই তাদের দরকার।

ঐ সময় এ পদে আরও যাদের নাম ছিল তার মধ্যে সামি মাইকেলও ছিলেন যিনি এলির শ্যালক এবং তার স্ত্রী নাদিয়ার ভাই। কিন্তু সামি গোয়েন্দা হতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ইসরাইলে থেকে যান এবং পরবর্তীতে দেশের নামজাদা একজন কবি হন।

কোহেনের প্রশিক্ষণ ছিল দীর্ঘমেয়াদি এবং বিরক্তিকর। সকালবেলাই তাকে আমানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চলে যেতে হত। কয়েক সপ্তাহ ধরে আইজাক নামের মাত্র একজন প্রশিক্ষকের অধীনে তাকে ট্রেনিং নিতে হত। প্রথমেই তার সামনে অসংখ্য দ্রব্যসামগ্রী মেলে ধরা হত। এলি কোহেলকে তা দেখতে দেয়া হত এক/দুই সেকেন্ড সময়। এরপর চোখ বুজে তাকে বলতে হবে কী সব আইটেম তিনি দেখলেন। বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্র সম্পর্কেও তাকে ধারণা দেয়া হয়। আইজাক তেলআবিবের ব্যস্ততম রাস্তায় হয়তো এলি কোহেনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। নিউজপেপার স্ট্যান্ডে গিয়ে বললেন, পেপারগুলা পড়ুন কিন্তু কতজন আপনাকে ফলো করছে তা পরে বলতে হবে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ফিরে এলির কাছে সংখ্যা জানতে চাইতেন আইজাক। এক পর্যায়ে কতগুলো ছবি টেবিলে রাখতেন। উত্তর ঠিকঠাক না হলে বলতেন, গাছের পেছনে যে লোকটি সে-ও কিন্তু আপনাকে ফলো করছিল। এভাবে এলিকে শিক্ষা দিতেন আইজাক।

এখানে জালমান ইয়েহুদা নামে আরেক প্রশিক্ষকের সঙ্গে এলি কোহেনের পরিচয় করিয়ে দিলেন। এই প্রশিক্ষক খুবই ছোট ও সফিসটিকেটেড রেডিও ট্রান্সমিটার সম্পর্কে এলি কোহেনকে প্রশিক্ষণ দিলেন। ইয়েহুদা তার শারীরিক মানসিক স্বাস্থ্যেরও পরীক্ষা নিলেন। এরপর জালমান আরেক মহিলা প্রশিক্ষককে নিয়ে এলেন। তার নাম মারসেল্লে কাজিন।

এরপর জালমান বললেন, এটাই আপনার চূড়ান্ত পরীক্ষা। টিকবেন কি টিকবেন না সেটাই দেখা হবে। এরপর বিশাল ছবক দিয়ে বললেন, মারসেল্লে আপনাকে মিসরীয় এক ইহুদির নামে ফ্রান্সের একটা পাসপোর্ট দেবেন। ভদ্রলোকের আফ্রিকায় স্থায়ী বসবাস কিন্তু পর্যটক হিসেবে এখন ইসরাইলে। এই পাসপোর্ট নিয়ে আপনি দশদিনের জন্য জেরুজালেম যাবেন। মারসেল্লে আপনাকে বিস্তারিত বলবে যেমন মিসরে আপনার অতীত, আপনার পরিবার, আফ্রিকায় আপনার পেশা ইত্যাদি। জেরুজালেমে আপনি শুধু আরবি ও ফরাসি ভাষায় কথা বলবেন। আপনাকে প্রচুর মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে এবং তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে হবে। কিন্তু কাউকেই আপনার প্রকৃত পরিচয় দেয়া যাবে না। খেয়াল রাখবেন, কেউ যেন আপনাকে ফলো না করে।

জেরুজালেম থেকে দেশে ফেরার পর এলিকে কয়েকদিনের ছুটি দেয়া হল। তার স্ত্রী নাদিয়া সোফিয়ে নামে এক কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছে। ইহুদিদের নববর্ষ রস হাসানার পরে জালমান তার সঙ্গে দু'জন লোকের পরিচয় করিয়ে দিলেন। এদের একজন হাসিমুখে এলিকে বললেন, জেরুজালেমের পরীক্ষায় আপনি পাশ। এখন আপনার সামনে আসবে আরও অনেক বড় বড় কাজ।

আমানের অফিসের একটি ঘরে এক মুসলিম শেখ এলি কোহেনকে খুবই ধৈর্যের সঙ্গে পবিত্র কোরান ও নামাজ শিক্ষা দিলেন। এলি খুবই মনোযোগী হলেও ভুল হয়ে যাচ্ছিল। মুসলিম শেখ তাকে চিন্তিত না হতে বললেন। বললেন, কেউ আপনাকে প্রশ্ন করলে বলবেন, আপনি ধর্মপ্রাণ মুসলিম বটে কিন্তু এসব পাঠ স্কুলের পরে আর তিনি নিতে পারেননি।

যাহোক এখন এলি কোহেনকে কোনো নিরপেক্ষ দেশে পাঠানো হবে। বাড়তি প্রশিক্ষণ হিসেবে তাকে কোনো আরব দেশের রাজধানীতে পাঠানো হবে। চলে যাওয়ার সময় বললেন, আরব দেশে গেলে আপনাকে স্থানীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে হবে। আর ইসরাইলের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করার জন্য নেটওয়ার্ক তৈরি করতে হবে। কোনো রকম দ্বিরুক্তি ছাড়াই এলি কোহেন সম্মতি দিলেন। এলি কোহেন এখন অনেক বেশি আত্মপ্রত্যয়ী। কেননা সবগুলো পরীক্ষায় তিনি পাশ করেছেন।

জালমান এলিকে জানালেন, আপনাকে সিরিয় অথবা ইরাকে পাঠানো হবে। এলি বললেন, আমি ইরাকের কিছুই জানি না। আমাকে মিসরে পাঠান। এ অসম্ভব, একথা বলে জালমান বললেন, সম্প্রতি মিসর তাদের আদমশুমারি শেষ করেছে এবং পাসপোর্টপ্রাপ্তদের নামের তালিকা করেছে। ফলে মিসর এখন বিপজ্জনক। ইরাক ও সিরিয়া এ জাতীয় এখনো কিছু করেনি। তারা আপনার হদিস খুঁজে পাবে না। দুদিন পরে জালমান গং এলিকে বললেন, এখন থেকে আপনার নাম কামাল। আপনার পিতার নাম আমিন তাবেত। অতএব আপনার পুরো নাম কামাল আমিন তাবেত।

এলি কোহেনের কেস অফিসার তার এক নতুন জীবন বৃত্তান্ত তৈরি করেছেন। বিফ্রিংয়ে কেস অফিসার বলেন, প্রথমত সিরীয় বাবা-মায়ের সন্তান আপনি। আপনার মায়ের নাম সাঈদা ইব্রাহিম। আপনার এক বোন। লেবাননের বৈরুতে আপনার জন্ম। আপনার বয়স যখন তিন বছর তখন আপনার বাবা-মা লেবানন ত্যাগ করে মিসরে আসেন। কখনোই ভুলবেন না আপনি সিরীয়। এক বছর পর আপনার বোন মারা যায়। আপনার বাবা একজন অস্ত্র ব্যবসায়ী।

১৯৪৬ সালে আপনার চাচা আর্জেন্টিনায় দেশান্তরী হন। আপনার চাচা আপনার বাবাকে পরিবারসহ বুয়েন্স আয়ারসে যেতে বলেছিলেন। ১৯৪৭ সালে আপনারা সকলে আর্জেন্টিনায় যান। আপনার বাবা ও চাচা আরেকজনকে সঙ্গে নিয়ে একটা কাপড়ের দোকান দেন এবং সেটি দেউলিয়া হয়ে যায়। আপনার বাবা ১৯৫৬ সালে এবং তার তিন মাসের মধ্যে আপনার মা ইন্তেকাল করেন। আপনি চাচার সঙ্গে থেকে যান এবং ট্রাভেল এজেন্সিতে চাকরি পান। অতঃপর আপনি ব্যবসা শুরু করেন এবং আজ আপনি একজন সফল ব্যবসায়ী।

মোসাদ কিম্বা আমান এলি কোহ্নের নতুন জীবনবৃত্তান্ত তৈরি করে দিলে ঘরের জন্য অর্থাৎ নাদিয়াকে বোঝানোর জন্য এলি কোহেন একটা গল্প সাজান। নাদিয়াকে তিনি বলেন, প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি কোম্পানিতে তিনি চাকরি পেয়েছেন। ইসরাইলের সামরিক সরঞ্জামাদি তাকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে দেখাতে হবে একই সাথে নিজেদের সরঞ্জামাদির মার্কেট তৈরি করতে হবে। নাদিয়াকে তিনি আশ্বস্ত করেন যে, দীর্ঘদিনের ছুটি নিয়ে তিনি দেশে আসবেন। তবে তার পুরো বেতন ইসরাইল থেকেই তাকে দেয়া হবে। এলি বলেন, আমাদের দীর্ঘ বিচ্ছেদ দুঃসহ বটে। যাহোক, কয়েক বছরের মধ্যে ইউরোপে আমরা ফ্ল্যাট ও আসবাবপত্র কিনব।

১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারিতে একটি নম্বরবিহীন গাড়িতে করে এলি কোহেন ইসরাইল ছাড়েন। এলিকে তার প্রকৃত নামেই ইসরাইলের পাসপোর্ট, ৫ শত ডলার ও জুরিখের একটি বিমান-টিকেট ধরিয়ে দেয়া হয়।

জুরিখে এক বৃদ্ধ লোক এলি কোহেনের পাসপোর্টটি নিয়ে নেয় এবং অন্য নামে ইউরোপীয় একটি দেশের পাসপোর্ট দেয়। এই পাসপোর্টে চিলির জন্য এন্ট্রি ভিসা ও আর্জেন্টিনার জন্য ট্রানজিট ভিসার সিল দেয়া হয়েছে। লোকটি আরও বলে, বুয়েন্স আয়ার্সে আমাদের লোকজন আপনার ট্রানজিট ভিসার মেয়াদ বাড়িয়ে দেবে। আগামীকাল আপনি বুয়েন্স আয়ার্সে যাবেন এবং একদিন পর সকাল এগারটায় ক্যাফে কারিয়েন্টসে যাবেন। সেখানে আমাদের লোকজন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।

আর্জেন্টিনায় একটি ভালো হোটেলে উঠে এলি কোহেন নির্দেশিত ক্যাফেতে গেলে আব্রাহাম নামের এক বয়স্ক লোক তার টেবিলে আসেন। কোহেনকে চমৎকার একটি ফ্ল্যাটে ওঠার কথা বলা হয় এবং সেটি ইতিমধ্যেই ভাড়া করা হয়েছে বলে লোকটি জানান। আরও জানান, স্থানীয় এক শিক্ষক তাকে স্পেনীশ ভাষা শিক্ষা দেবেন। এছাড়া আপনার আর কোনো কাজ নেই। এবং

আমি আপনার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করব।

তিন মাস পর আগামী কর্তব্যের জন্য এলি কোহেন প্রস্তুত। এখন চলনসই স্পেনীশ ভাষা বলতে পারেন। আরেক প্রশিক্ষক তাকে সিরিয় উচ্চারণে আরবি ভাষা শেখালেন। এদিকে এলি কোহেন বুয়েনস আয়ার্স ভালোভাবে চিনে ফেলেছেন। আর্জেন্টিনার রাজধানীতে আরব দেশ থেকে আগত ইমিগ্রান্ট বা অভিবাসীরা যে ধরনের ধোপদুরস্ত পোশাকাদি পরেন ও আচরণ করেন এলি কোহেনও অনুরূপ করে থাকেন।

আরেকটি ক্যাফেতে আব্রাহাম আবার এলি কোহেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে একটি সিরিয় পাসপোর্ট দেন। এই পাসপোর্টে তার নাম কামাল আমিন তাবেত। আব্রাহাম তাকে সপ্তাহখানেকের মধ্যে তার ঠিকানা বদলের কথা বলেন এবং নতুন নামে ব্যাংক একাউন্ট খুলতে বলেন। তাকে আরবিয় রেস্তোরাঁগুলোতে যাওয়ার পরামর্শ এবং আরব দেশের সিনেমা দেখার কথাও বলেন। আরবদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্লাবগুলোতে নিয়মিত যাতায়াতের পরামর্শ দিয়ে তাকে যত লোকের সঙ্গে সম্ভব বিশেষ করে আরব দেশের কম্যুনিটি নেতাদের সঙ্গে সখ্যতা বৃদ্ধির কথা বলা হয়। বলা হয়, আপনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, একজন মার্চেন্ট এবং মেধাবী ব্যবসায়ী। একই সঙ্গে আপনি পরিবহন ও লগ্নি ব্যবসায় জড়িত। আরব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সংগঠনে অনুদানও দেবেন। গুডলাক!

আর্জেন্টিনায় ইসরাইলি এই গোয়েন্দার ভাগ্য সত্যিই সুপ্রসন্ন। কয়েক মাসের মধ্যেই এলি কোহেন বুয়েন্স আয়ার্সের আরব-সিরিয় কম্যুনিটির শীর্ষ মহলে সফলভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। তার মধুর ব্যবহার, আত্মবিশ্বাস, কমনসেন্স এবং সৌভাগ্য বহু আরবকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে। আর্জেন্টিনা থেকে প্রকাশিত আরব ওয়ার্ল্ড পত্রিকার প্রধান সম্পাদক আবদেল লতিফ হাসানের সঙ্গে একদিন এলি কোহেনের পরিচয় ঘটে। সিরিয় অভিবাসী এবং অন্যান্য গুণাবলির কারণে হাসান এলি কোহেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন।

এদিকে সিরিয় দূতাবাসের আমন্ত্রিত অতিথিদের তালিকায় এলির নাম যুক্ত হয়। এক পার্টিতে হাসানের মাধ্যমে আর্জেন্টিনায় নিযুক্ত সিরিয় দূতাবাসের সামরিক অ্যাটাশে জেনারেল আমিনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে।

এলি প্রায় প্রবাদপুরুষে পরিণত হয়ে গেলে অতঃপর তার গোয়েন্দাবৃত্তি শুরু হয়। আব্রাহামের সঙ্গে গোপন বৈঠকের পরদিন এলি হাসানের অফিসে যান।

তাকে বলেন, আর্জেন্টিনায় তার বসবাস তাকে অসুস্থ করে তুলেছে। সিরিয়ই তার ভালো লাগে এবং এলি সেখানে ফিরে যেতে চান। এখন হাসান কি তাকে কয়েকটি রেকোমেন্ডেশন লেটার দিতে পারেন? হাসান সঙ্গে সঙ্গে চারটি চিঠি লিখে দেন। একটি তার ছেলেকে দামেস্কে, বৈরুতে তার দুই প্রভাবশালী বন্ধুকে এবং আলেকজান্দ্রিয়ায় তার শ্যালিকাকে। এভাবে আরও কয়েকজনের কাছ থেকে এলি চিঠি সংগ্রহ করেন এবং তার ব্রিফকেস চিঠিতে ভরে যায়।

১৯৬১ সালের জুলাইয়ে ইসরাইলি গোয়েন্দা কামাল আমিন তাবেত জুরিখে যান এবং বিমান পরিবর্তন করে মিউনিখে নামেন। সেই বিমানবন্দরে ইসরাইলি এক গোয়েন্দা তাকে ইসরাইলি পাসপোর্ট ও তেলআবিবের বিমান টিকেট দিয়ে যান। এলি কোহেন দেশে ফিরে স্ত্রী নাদিয়াকে বলেন, আমি কয়েক মাস দেশেই থাকব।

এর পরবর্তী কয়েক মাস এলিকে আরও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এলি কোহেনের নতুন যে পরিচয় তার সঙ্গে তার আচরণ সম্পূর্ণরূপেই সংগতিপূর্ণ। এলির রেডিও প্রশিক্ষক ইয়েহুদা রেডিও ট্রান্সমিশনের কোড তাকে শিক্ষা দেন। কয়েক সপ্তাহের প্রশিক্ষণেই এলি কোহেন মিনিটে বার থেকে ষোল শব্দ প্রচার ও রিসিভ করতে সমর্থ হন। তাকে বাধ্যতামূলকভাবে সিরিয়র ইতিহাস, ঐতিহ্য, তার সেনাবাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র এবং কৌশলাদি সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হয়। পণ্ডিতদের এরকম অসংখ্য ব্রিফিং শেষে এলি কোহেন সিরিয়র অভ্যন্তরীণ রাজনীতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেন। ১৯৬১ সালের ডিসেম্বরে এলি কোহেন তার চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল সিরিয়র দামেস্কে পৌঁছান।

সিরিয়া-ইসরাইল সীমান্তে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছিল। এদিকে সিরিয় অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে। ১৯৪৮ সালের পর একের পর এক অভ্যুত্থানে দেশটি সবদিক থেকে কাহিল হয়ে পড়ে। সিরিয়র কোনো স্বৈরাচারেরই স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি। হয় ফাঁসি, ফায়ারিং স্কোয়াড কিম্বা আততায়ীর হাতে মৃত্যু হয়েছে।

অন্তর্কলহ ধামাচাপা দিতে ও জনগণের দৃষ্টি অন্যত্র সরাতে সীমান্ত বিরোধ আরো বেশি করে করা হত। দামেস্ক স্কোয়ারে জনগণকে কতল বা শিরশ্ছেদ ছিল নৈমিত্তিক ঘটনা। কোতোয়ালের একটাই বক্তব্য ছিল, এসব লোক ষড়যন্ত্রকারী, গুপ্তচর, রাষ্ট্রের শত্রু। আবার বলা হত এরা পূর্ববর্তী সরকারের সমর্থক।

দামেস্কে আসার কিছুদিন আগেই সিরিয়ায় একটি অভ্যুত্থান হয়। অর্থাৎ ১৯৬১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর। এই অভ্যুত্থানের ফলে সিরিয় ও মিসরের মধ্যে যে ইউনিয়ন ছিল যার নাম ছিল ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক; সেটি ভেঙে যায়।

সংগঠনটি অবশ্য খুব পুরনো ছিল না।

গুপ্তচরবৃত্তি শুরুর আগে এলি কোহেন জালমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। জালমানের সুস্পষ্ট নির্দেশনা হল, মিউনিখে জেলিঙ্গার নামে আমাদের যে লোক রয়েছে সে আপনাকে রেডিও ট্রান্সমিটার দিয়ে যাবে। দামেস্কে আসার পর সিরিয়র সরকারি প্রচারমাধ্যমের একজন কর্মচারী আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। ঐ ভদ্রলোকও আপনার মতো একজন ইমিগ্রান্ট এবং তিনিও খুব বেশি দিন হয়নি দামেস্কে এসেছেন। ঐ ভদ্রলোক আপনার প্রকৃত পরিচয় জানেন না। তাকে আপনার খোঁজার দরকার নেই। সঠিক সময়ে তিনিই আপনাকে খুঁজে নেবেন।

মিউনিখে জেলিঙ্গার এলি কোহেনকে গোয়েন্দাগিরিতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির একটি প্যাকেট দেন। এতে এমন এক ধরনের কাগজ ছিল, যে কাগজে লিখলে তা বোঝা যেত না। বিশেষ একটা টাইপ রাইটার ছাড়াও ছিল একটা ট্রানজিস্টার, যার মধ্যে লুকায়িত ছিল একটা ট্রান্সমিটার। একটা ইলেকট্রিক রেজর দেয়া হয়েছিল। এর কর্ড ট্রান্সমিটারের এন্টেনা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই প্যাকেজে ডিনামাইটের কাঠি দেয়া হয়েছিল যা লুকানো ছিল সাবানের ভেতর। আর দেয়া হয়েছিল আত্মহত্যার জন্য সায়ানাইড পিল। যদি প্রয়োজন হয়। এলি দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। কী করে সিরিয়র ইমিগ্রেশন ও কাস্টমসকে ধুলো দিয়ে এসব তিনি সিরিয়ায় ঢোকাবেন।

জেলিঙ্গার বললেন, জানুয়ারিতে গেনোয়া থেকে বৈরুতে যে জাহাজ যাবে আপনাকে তার টিকেট কাটতে হবে। জাহাজে আপনার একজন সঙ্গী থাকবে। তিনি আপনাকে বর্ডার পার করে দিলে আপনি সিরিয়ায় ঢুকতে পারবেন। জাহাজে যাত্রীদের মধ্যে অবস্থানকালে এক লোক এলি কোহেনকে নিভৃতে ডাকেন। নাম বলেন, মাজেদ শেখ এল আরদ। মাজেদ বলেন, আমার একটা গাড়ি আছে। সেই গাড়িতে আমি আপনাকে দামেস্কে পৌঁছে দেব।

১৯৬২ সালের ১০ জানুয়ারি বৈরুত থেকে আসা মাজেদের গাড়ি সিরিয়র সীমান্তে থামান হয়। ঐ গাড়িতে এলি কোহেনের ট্রান্সমিশনের সব যন্ত্রপাতি। মাজেদ এবং এলি ঐ গাড়িতেই ছিলেন। মাজেদ সিরিয়র কাস্টম ইন্সপেক্টরকে পাঁচশত ডলার ঘুষ দিলে গাড়ি ছেড়ে দেয়া হয়। এলি কোহেন সিরিয়ায় পৌঁছে যান।

সিরিয়র সামরিক বাহিনীর সদর দফতর, জাতীয় নেতৃবৃন্দের সরকারি বাসভবন, সরকারি গেস্ট হাউস, দূতাবাসসমূহ ধনী ব্যবসায়ীদের আবাসস্থলের

কাছেই বাড়ি ভাড়া নেন এলি কোহেন। বাড়িতে ঢুকেই তিনি রেডিও'র যন্ত্রপাতি ঘরের বিভিন্নস্থানে লুকিয়ে রাখেন। বাড়িতে কোনো কাজের লোকও রাখেননি যাতে তথ্যাদি পাচার হয়ে যায়। একাই বাড়িতে থাকেন তিনি।

এলি কোহেন আরও ভাগ্যবান এ কারণে যে, তার আগমনের সময়ই ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক ভেঙে যায়। প্রেসিডেন্ট নাসেরকে অপমান ও মিসরের প্রতি অবহেলার কারণ দেখিয়ে দুই দেশের রিপাবলিক ভেঙে যায়। এ সময় সিরিয়র নেতা ও সামরিক বাহিনীর মনে এই প্রত্যয় জন্মে যে, এখন কোনো অভ্যুত্থান হলে তা হবে মিসর সরকারের অনুপ্রেরণায়। ইসরাইলের দিক থেকে কোনো ষড়যন্ত্র কিম্বা বিপদ হতে পারে এমনটি তাদের মাথায় ছিল না।

এদিকে সিরিয় মরিয়া হয়ে নতুন মিত্র, সমর্থক ও তহবিল জোগাতে সক্ষম লোকদের খুঁজে পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। সিরিয় এবং বিদেশে বসবাসরত সিরিয় অভিবাসীদের দিকে তাদের নজর ছিল। ঠিক এ রকম সময় কামাল আমিন তাবেত তাদের কাছে কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিতে পরিণত হল। প্রথমত তিনি জাতীয়তাবাদী এবং কোটিপতি, তার সঙ্গে রয়েছে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের চিঠি ইত্যাদি।

কামাল আমিন তাবেত তথা এলি কোহেন দ্রুত ও কার্যকরভাবে বিভিন্ন লোকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হন। গচ্ছিত রেকোমেন্ডেশনের চিঠির মাধ্যমে তিনি বড় বড় জায়গায় স্থান করে নিতে থাকেন। হাই সোসাইটি, ব্যাংকসমূহ এবং বাণিজ্যিক সার্কেল ২৮ সেপ্টেম্বরের অভ্যুত্থানের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এদের সঙ্গে কোহেনের মধুর সম্পর্ক। এলি কোহেনের নতুন বন্ধুরা তাকে সামরিক বাহিনীসহ সবক্ষেত্রের শীর্ষ ব্যক্তিদের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে দেন। দুই শীর্ষ ব্যবসায়ী তরুণ ও সুদর্শন কোটিপতি এলি কোহেনের সঙ্গে তাদের মেয়েদের বিয়ে দেয়ার কথাও ভাবেন। এলি কোহেন তথা তাবেতের টাকায় দামেস্কের হত-দরিদ্রদের জন্য একটি খাবার ঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়। এলি ব্যাপক জনপ্রিয় হওয়ার কারণে প্রশাসন তাকে সমীহ করতে শুরু করে। সিরিয়র বর্তমান শাসকদের থেকে তিনি অবশ্য দূরত্ব বজায় রাখতেন। কেননা তার অন্তর্গত মন বলত, এরা খুব ক্ষণস্থায়ী। তাছাড়া মিসর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর সিরিয়ায় নতুন অনেক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে।

দামেস্কে আসার এক মাস পর জর্জ সালেম সেইফের সঙ্গে এলি কোহেন তথা তাবেতের পরিচয় হয়। সালেম সেইফ সিরিয়র সরকারি বেতারে কাজ করেন। বিদেশে বসবাসরত সিরিয়দের উদ্দেশে তিনি একটি অনুষ্ঠান উপস্থাপন করেন।

ইসরাইলে জালমান সর্বশেষ বিফ্রিংয়ে এই সেইফের কথাই বলেছিলেন। এলি তথা তাবেতের দামেস্কে আসার সামান্য কিছু আগে সেইফ এসেছেন। সেইফের বাড়ির পার্টিতে আসায় সিরিয়র রাজনৈতিক ঘটনাবলি যেমন অনুধাবনে সক্ষম হলেন তেমনি সিরিয়র প্রচার নীতিমালাও জেনে নিলেন। ফলে এলি কোহেন তার গোপন রেডিয়োতে কী প্রচার করবেন আর কী করবেন না তার ধারণা পেলেন।

আল আরদ, সেইফ কারোই এলি কোহেন তথা তাবেতের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। তাদের ধারণা এলি কোহেন একজন ফ্যানাটিক জাতীয়তাবাদী এবং তার নিজস্ব রাজনৈতিক এজেন্ডা রয়েছে।

এলি কোহেন নিশ্চিত যে, তার মতো নিঃসঙ্গ গোয়েন্দা পৃথিবীতে আর দুটি নেই। না আছে তার কোনো বন্ধু, না কারো প্রতি তিনি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছেন। এমনকী দামেস্কে থেকে ইসরাইলি কোনো নেটওয়ার্ক প্রচারের পরিণতিও তিনি বুঝতে পারছেন না।

এলি কোহেনের এখন যে অবস্থান তাতে তাকে মেরুদণ্ড সোজা রেখে এগিয়ে যেতে হবে। মাঝে-মধ্যে তিনি স্ত্রী নাদিয়ার কাছে যান বটে কিন্তু তাকে বলা যাবে না সত্যি কথাগুলো; আবার তাকে বিভ্রান্তও করা যাবে না।

এলি কোহেন প্রতিদিন সকাল আটটায় তার বার্তা ইসরাইলে পাঠানো শুরু করলেন। বিকেলেও পাঠাতেন। তার প্রচারণা নির্বিঘ্নই ছিল। তার ট্রান্সমিটার তার বাড়িতে বসানো হয়েছিল। সিরিয়র সামরিক সদর দফতরের কাছেই এটি অবস্থিত। এখানে অবশ্য অসংখ্য ট্রান্সমিশন বসানো। এর মধ্যে কোনোটা এলি কোহেনের তা ঠাহর করা কঠিন। আর আর্মির ট্রান্সমিশনগুলো পুনঃপুনঃ অসংখ্য বার্তা উগড়ে দিচ্ছে।

মাঝে ইসরাইলে ফিরে এলে অফিস থেকে তাকে একটি মিনিয়েচার ক্যামেরা দেয়া হয়। এর মাধ্যমে তিনি ছবি তুলতে পারবেন। তার এই ক্যামেরা লুকিয়ে রাখাও একটা সমস্যা। তিনি ঐ ক্যামেরা পাশা খেলার একটি বক্সে রাখতেন। আর্জেন্টিনার বন্ধুদের মাধ্যমে তিনি ঐ সব ছবি ইসরাইলে পাচার করতেন।

ক্যামেরার মাধ্যমে প্রথম যে ডকুমেন্টটি তিনি পাঠান তাহল, সিরিয়ায় সামরিক বাহিনীর মধ্যে অস্থিরতার এবং বাথ পার্টির উত্থান সংক্রান্ত। এলি কোহেন অনুভব করেন যে, সিরিয়র রাজনীতি কোনো পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তিনি বাথ পার্টির নেতাদের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তোলেন এবং তাদেরকে মোটা

অঙ্কের চাঁদা দেন।

এলি কোহেনের ধারণা সত্য বলে প্রমাণিত হয় ১৯৬৩ সালের ৮ মার্চ। সামরিক বাহিনী সরকার উৎখাত করলে বাথ পার্টি ক্ষমতা গ্রহণ করে। বুয়েন্স আয়ার্স থেকে এলি কোহেনের বন্ধু জেনারেল হাফেজ সালাহ্ আল বিতারের মন্ত্রিসভায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী হন। জুলাই মাসে আরেকটি অভ্যুত্থান হলে জেনারেল হাফেজ সিরিয়র রেভ্যুলশনারি কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট হন। একই সঙ্গে তিনি রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তি। এলি কোহেন তথা তাবেতের বন্ধুরা মন্ত্রিসভায় স্থান পেতে থাকেন। সামরিক বাহিনীতেও তার বন্ধুরা ভালো ভালো পদ পান। ইসরাইলি এই গোয়েন্দা আজ সিরিয়র ইনার সার্কেলের একজন সদস্য বনে যান।

দামেস্কে একটা গ্লামারাস পার্টি চলছে। মন্ত্রী, বাথ পার্টির নেতা, জেনারেল, ব্যবসায়ী—কে নেই পার্টিতে! অনেককে দেখা গেল সালিম হাতুমকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। সাম্প্রতিক অভ্যুত্থানের তিনিই নেতা, ট্যাঙ্ক নিয়ে রাস্তায় নেমেছিলেন এবং বর্তমান প্রেসিডেন্ট হাফেজকে তিনিই ক্ষমতায় বসান। ঐ ভিলায় প্রেসিডেন্ট হাফেজ সপত্নীক আসেন। কিছুটা বিলম্বে। কিন্তু তার গায়ে যে কোটটি সেটি এলি কোহেন বা তাবেতের দেয়া। সিরিয় ইমিগ্র্যান্টদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা স্বরূপ টোকেন হিসেবে কোটটি দেয়া হয়েছিল।

মিসেস হাফেজকেই তিনি উপহার দিয়েছেন তা নয়। বহু মহিলাকে অলংকার সেট, জেনারেলদের গাড়ি উপহার দিয়েছেন তিনি। রাজনৈতিক নেতারা তাবেতের টাকা নিজ নিজ একাউন্টে জমা করেছেন।

ঐ বাড়ির লিভিংরুমে সামরিক বাহিনী ও প্রশাসনের শীর্ষ ব্যক্তিরা ইসরাইলের সীমান্ত থেকে ফিরে এসে আলোচনা করছিলেন। আলোচনার অন্যতম বিষয়, জর্ডান নদী থেকে ইসরাইল যাতে পানি না পায় সে লক্ষ্যে সিরিয়র বিশাল প্রকল্প নিয়ে। সিরিয় রেডিও'র প্রধান এলি কোহেন বললেন, অভিবাসী সিরিয়দের নিয়ে নিয়মিত একটা শো করাতে। সেখানে এলি কোহেন যেন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদি বিশ্লেষণ করেন।

এলি কোহেন তথা তাবেতের মতো ভাগ্যবান লোক আর হয় না। আজ সব দরজা তার জন্য উন্মুক্ত। সামরিক বাহিনীর সদর দফতরে তার নিয়মিত বৈঠক থাকে। বাথ পার্টির নীতিনির্ধারণী বৈঠকে তার উপস্থিতি প্রায় বাধ্যতামূলক।

এলি কোহেন তথা তাবেতের হাতে এখন তথ্যের ভাণ্ডার। টপ সিক্রেট মিলিটারি নির্দেশাবলি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের সব গোপন বিষয়াদি,

জেনারেলদের মনোভাবনা এমনকি কোনো নেতার সঙ্গে কার বন্ধুত্ব ও বিরোধ সবই কোহেন তাৎক্ষণিকভাবে রেডিওমাধ্যমে পাঠিয়ে চলেছেন। সর্বোপরি ইসরাইলের ব্যাপারে সিরিয়র নীতি ও মানসিকতাও তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

সিরিয় নতুন কী অস্ত্র কিনল, ইসরাইল সীমান্তে সিরিয় কী ধরনের ক্যান্টনমেন্ট বানাতে যাচ্ছে– সবই মুহূর্তের মধ্যে ছবি ম্যাপসহ ইসরাইলের কাছে চলে যাচ্ছিল। এক শীর্ষ জেনারেল ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, সেনাবাহিনীর কোনো গোপন বিষয়ই এলি কোহেনের কাছে গোপন থাকছে না।

এলি কোহেন নির্বিঘ্নে ইসরাইলের তথ্য পাচারে সমর্থ হলেও একদিন সিরিয়র লে. জাহেরের কাছে প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ করেই জাহের তার বাড়িতে এসে উপস্থিত। এলি কোহেন যন্ত্রপাতি সরাতে পারলেও কিছু কাগজ তার টেবিলে রয়ে গিয়েছিল। জাহের জানতে চাইলেন এগুলো কী। এলি কোহেন বললেন, এ হল ক্রসওয়ার্ডের কাগজ। প্রকৃতপক্ষে ঐ সব কাগজে গোপন কালি দিয়ে অনেক কিছুই লেখা ছিল।

ইসরাইলে গোপন তথ্য পাচারে এলি কোহেনের নিজস্ব রেডিও তো ছিলই– তিনি সিরিয়র সরকারি রেডিও'র মাধ্যমেও তেলআবিবে সংবাদ পাঠাতে লাগলেন। সাংকেতিক শব্দাবলি ও প্রবাদ-প্রবচনের মাধ্যমে তিনি সংবাদ পাঠাতেন। ইসরাইলি গোয়েন্দারা সেসব শব্দ অবমুক্ত করে নিত।

আরো আরো গোপন সংবাদাদি পেতে মরিয়া এলি কোহেন মেয়েদের কাজে লাগাতে লাগলেন। সিরিয়র সরকারি মহলে কানাঘুষা চলছিল যে, এলি কোহেনের বাড়িতে সেক্স পার্টি হয়ে থাকে নিয়মিত। এলির ঘনিষ্ঠ লোকজন এতে অংশ নিতেন এবং সুন্দরী বিদুষী রমণীরা তাদের সঙ্গ দিতেন। এসব মেয়েদের মধ্যে যেমন রাস্তার পতিতারা থাকত তেমনি ভালো ঘরের মেয়েরাও থাকত। এলি কোহেন তথা তাবেতের অতিথিরা সবরকম সেক্স করলেও মেজবান থাকতেন ধীরস্থির। এলি কোহেন তার উচ্চ পর্যায়ের বন্ধুদের কাছেও মেয়ে পাঠাতেন। তার এরকম একজন বন্ধু হলেন কর্নেল সেলিম হনতুম। কর্নেলের কাছ থেকে যা যা শুনত মেয়েটি হুবহু তা এলি কোহেন তথা তাবেতের কাছে এসব বর্ণনা করত।

বক্তৃতাকালে তাবেত সিরিয়র প্রতি দেশপ্রেম দেখাতে গিয়ে ইসরাইলকে যাচ্ছেতাই ভাষায় গালাগালি করতেন এবং ইসরাইল যে সিরিয়র এক নম্বর শত্রু তা উল্লেখ করতেন। তিনি ইসরাইলের বিরুদ্ধে অপপ্রচার আরও বৃদ্ধির জন্য সিরিয়র নেতাদের কাছে তদবির করতেন। মিসরের পাশাপাশি সিরিয়র

বিরুদ্ধেও একটা ফ্রন্ট খোলার কথা তিনি বলতেন। তার বন্ধুরা ইসরাইলের আগ্রাসী আচরণের বিরুদ্ধে যথেষ্ট পদক্ষেপ নিচ্ছে না বলেও তিনি অনুযোগ করতেন। এসব বলে এলি কোহেন তার লক্ষ্যে পৌঁছতে আরও সমর্থ হলেন। এলি কোহেনের সামরিক বাহিনীর বন্ধুরা তাকে বলতেন, ইসরাইলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে তাদের বেশ ভালো প্রস্তুতি রয়েছে। এবং ইসরাইলের ব্যাপারে এলি কোহেনের আশংকা যে অমূলক একদিন তারা তা প্রমাণ করবেন। এ উপলক্ষে সিরিয়র সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তারা এলি কোহেনকে নিয়ে তিন বার ইসরাইল সীমান্তে যান এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র কী ভাবে তাক করা আছে তা দেখান। তারা এলি কোহেনকে সিরিয়র দুর্গসমূহ, বাঙ্কার, অস্ত্রের গুদাম ইত্যাদি দেখান। সিরিয়র রণকৌশলও এলি কোহেন তথা তাবেতের কাছে ব্যাখ্যা করেন। এখানে বিপুল পরিমাণ নতুন কেনা অস্ত্র মজুদ ছিল। এলি কোহেন তথা তাবেত চতুর্থবার যখন ইসরাইলের সীমান্তে যান সেদিন মিসরের জেনারেল আলি আমিরও তাদের সফরসঙ্গী ছিলেন। ঐদিন বেসামরিক ব্যক্তিদের মধ্যে একমাত্র তাবেতই ছিলেন। আলি আমিরকে সর্বজন শ্রদ্ধেয় জেনারেল গণ্য করা হয়; আবার তিনি ইউনাইটেড আরব কমান্ডের প্রধানও। মিসর, সিরিয় ও ইরাক ইসরাইলের বিরুদ্ধে একযোগে কীভাবে যুদ্ধ করবে তারও পরিকল্পনাকারী ও কমান্ডার আলি আমির।

আমীরের সঙ্গে সীমান্তভ্রমণের কয়েকদিনের মধ্যে বাথ পার্টির নেতারা তাবেতকে জর্ডানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সফরে পাঠান। বার্থ পার্টির বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা সালাহ্ আল বিতার সেখানে তথাকথিত চিকিৎসায় রয়েছেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিতারকে তাড়িয়েছেন বর্তমান সরকারপ্রধান জেনারেল হাফেজ। বিতারকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য তাবেতকে পাঠানো হয় এবং সেখানে তিনি বেশ কিছু দিন বিতারের সঙ্গে কাটান।

দামেস্কে ফিরে এলি কোহেন ওরফে তাবেত প্রেসিডেন্ট হাফেজকে প্যারিসের পথে বিদায় দিতে বিমানবন্দরে যান। প্রেসিডেন্টকে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হচ্ছিল। কয়েক সপ্তাহ্ পরে প্রেসিডেন্ট হাফেজ যখন আবার দেশে ফেরেন তখনো তাবেতকে টারমাকে দেখা যায়। অর্থাৎ সব দিক দিয়েই তার মিশন সফল।

এলি কোহেন ও নাদিয়া দম্পতির তৃতীয় সন্তানটি ছেলে। তার নাম শাওল। এই পর্যায়ে কিছুদিন ইসরাইলে ছিলেন এলি। তার স্বজনরা পরবর্তীতে বলেছেন, এই দফায় এলি কোহেনকে অনেক বেশি নার্ভাস ও হিংস্র মনে হয়েছে। এলি কোহেন তাদেরকে চাকরি ছেড়ে দেয়ার কথাও বলেন। পরের

বছর তিনি চাকরি ছেড়ে ইসরাইলে থাকতে শুরু করবেন বলেও জানান। কেননা পরিবার তার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এ বছর নভেম্বরে এলি কোহেন তথা তাবেত স্ত্রী নাদিয়া ও তিন সন্তানকে চুমু দিয়ে সিরিয়র পথে বিদায় নেন। নাদিয়া জানতেন না এলি কোহেনের এটাই শেষ গুডবাই।

১৯৬৪ সালের ১৩ নভেম্বর তেলধান সীমান্তের কাছে বেসামরিক জোনে কর্মরত ইসরাইলি ট্রাক্টরের ওপর সিরিয়া গুলি করতে শুরু করলে ইসরাইল ট্যাংক কামান এবং মিরেজ ও ভাউচার বিমান নিয়ে ইসরাইলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইসরাইলি বিমান সিরিয় বাহিনীর ওপর গোলাবর্ষণ করতে করতে চালাকি করে জর্ডান নদীর সেই স্পর্শকাতর অংশে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।

ইসরাইলকে জর্ডান নদীর পানি দেবে না বলে গৃহীত প্রকল্পের জন্য যেসব ট্রাক্টর বুলডোজারসহ বৃহদাকার মেকানিক্যাল যন্ত্রপাতি সিরিয় এনেছিল– ইসরাইল পরিকল্পনার মাধ্যমে তা ধ্বংস করে দেয়। সিরিয়র বিমান বাহিনী ছিল নিশ্চল। কেননা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আনীত মিগ ফাইটারগুলো তারা তখনো ব্যবহার শুরু করেনি।

সিরিয়র আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ইসরাইলি তাণ্ডব বিশ্বব্যাপী নজর কাড়ে। কয়েক ঘণ্টা পরে সিরিয়র সামরিক কর্মকর্তারা অনুধাবন করেন যে, ইসরাইলি আক্রমণের পরিকল্পনাকারী হলেন এলি কোহেন। এলি কোহেন ঐ যুদ্ধকালে ইসরাইলে ছিলেন। এলি কোহেনকে ধন্যবাদ এ কারণে যে, তার মাধ্যমেই ইসরাইল জেনে যায় গরিব রাষ্ট্র সিরিয়র বিমান বাহিনীর পক্ষে ইসরাইলের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। সিরিয়য় দুর্গপ্রাকারের অবস্থান এবং জর্ডান নদীর পানি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার প্রকল্পটা সম্পর্কে ইসরাইল ছিল সম্যক অবহিত। এমনকি সিরিয়ার অস্ত্র এবং কোনো ঘাঁটি ও বাঙ্কার থেকে ইসরাইলের বিরুদ্ধে কত গুলি ছোঁড়া হবে তা-ও তারা জানত। এলি কোহেন অবশ্য এর চেয়েও বেশি জানতেন। সিরিয়র জর্ডান নদীর পানি প্রকল্পের এই প্রথম কাজটি পেয়েছিলেন এক সৌদি ঠিকাদার।

সিরিয়র এই প্রকল্পটি কোথায় কতখানি গভীর হবে, কোথায় কোথায় খনন করা হবে তার পরিকল্পনারও দায়িত্বে ঐ ঠিকাদার। এলি কোহেন তার সঙ্গে দোস্তালি পাতালেন। জেনে নিলেন সব তথ্য এবং জেনে গেল ইসরাইলও। একই সঙ্গে ক্যানেলের প্রস্থের পরিমাপ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ধরনসহ কারিগরি সব তথ্যই ইসরাইলের নখদর্পণে।

এলি কোহেন তথা তাবেতকে তার ঠিকাদার বন্ধু আরও তথ্য ফাস করলেন। ক্যানেলের ক্যাপাসিটি কত হবে এবং ক্যানেলটি রক্ষায় কৌশলগত অস্ত্র কিভাবে বসানো হবে। এলি কোহেনের এই ভালো বন্ধুটির নাম বিল লাদেন। ওসামা বিন লাদেনের পিতা তিনি।

ঐ প্রকল্পকে টার্গেট করে ইসরাইল সেখানে বহুবার আক্রমণ চালিয়েছে। আক্রমণে জর্জরিত আরব দেশগুলো ১৯৬৫ সালে ঐ প্রকল্প স্থায়ীভাবে বন্ধের নির্দেশ দেয়।

যুদ্ধাবস্থার অবসানে ১৯৬৫ সালের জানুয়ারিতে স্বামী এলি কোহেনের ফরাসি ভাষায় লেখা একটি পোস্টকার্ড পান নাদিয়া। আমার প্রিয়তমা নাদিয়া সম্বোধন করে এলি কোহেন উল্লেখ করেন, নববর্ষ উপলক্ষে তোমাকে দুয়েকটি লাইন লিখছি। আশা করি নববর্ষ তোমাদের সবার জীবনে আনন্দের বার্তা বয়ে নিয়ে আসুক। ফিকি, আইরিখ ও শাউলকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ভালোবাসা জানাচ্ছি।

নাদিয়ার হাতে যখন এই পোস্টকার্ড পৌছায় এলি কোহেন তখন দামেস্কের কারাগারের মেঝেতে শুয়ে। তাকে মেরে হাড়-গোড় প্রায় ভেঙেই ফেলা হয়েছে।

কয়েক মাস ধরেই সিরিয়র সিক্রেট সার্ভিস সিরিয়ন মুখাভারত সারা দেশজুড়ে উচ্চ মাত্রার সতর্কতা জারি করে রেখেছে। ফিলিস্তিনি গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান টায়ারা'র পরামর্শ মোতাবেক এই সতর্কতা। টায়ারা সিরিয়র প্রশাসনকে জানান, ১৯৬৪ সালের গ্রীষ্মকাল থেকে সিরিয়র ব্যাপারে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে চলেছে। সিরিয় সরকার বিকেল কিম্বা রাতে হোক যখনই কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়, ইসরাইলের সরকারি বেতারে তা ঘন্টাখানেকের মধ্যে প্রচারিত হয়ে থাকে। রুদ্ধদ্বার কক্ষে নেয়া সিরিয়র অনেক গোপন সিদ্ধান্তও জনগণ জেনে ফেলছে। নভেম্বরের ১৩ তারিখে ইসরাইল সিরিয়র লক্ষ্যবস্তুতে যেভাবে নির্ভুলভাবে বোমা ফেলেছে তাতেও টায়ারা বিস্মিত। তার যৌক্তিক উপসংহার হল, ফ্রন্টলাইনে সিরিয় যেভাবে সেনাবাহিনী মোতায়েন করে রেখেছে তা ইসরাইলের নখদর্পণে। এবং সেই আলোকেই হামলা চালিয়েছে। কী করে এ সম্ভব! টায়ারা নিশ্চিত হন যে, সিরিয় সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে কোনো গোয়েন্দা ঢুকে পড়েছে। ঐ গোয়েন্দা থেকে প্রাপ্ত তথ্যই ইসরাইলি সরকারি বেতার ঘন্টাখানেকের মধ্যে প্রচার করে থাকে। আর এর অর্থ হল ওয়ারলেসযোগে ঐ গোয়েন্দা খবর পাঠাচ্ছে। কিন্তু কোথায় ট্রান্সমিটার?

১৯৬৪ সালের শেষার্ধে টায়ারা এবং তার সহকর্মীরা সোভিয়েত নির্মিত যন্ত্রপাতি দিয়ে গোপনে স্থাপিত ট্রান্সমিটারের সন্ধান চালিয়েও তা পেতে ব্যর্থ হন। কিন্তু ভাগ্য তাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হয় ১৯৬৫ সালের জানুয়ারিতে।

সিরিয়র লাতাকিয়া বন্দরে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিপুল পরিমাণ নতুন সম্প্রচার যন্ত্রপাতি আনলোড করছিল। ৭ জানুয়ারি ঐসব যন্ত্রপাতি পরীক্ষার জন্য সিরিয় সেনাবাহিনী ২৪ ঘণ্টা তাদের সকল ট্রান্সমিটার বন্ধ রাখে। দেশজুড়ে সিরিয় সেনাবাহিনীর যাবতীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা যখন বন্ধ ছিল তখন এক আর্মি অফিসার একটি সচল ট্রান্সমিটারের অস্তিত্ব টের পান। তিনি নিশ্চিত হন এটাই গোয়েন্দা ট্রান্সমিটার।

সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত প্রদত্ত ডিটেক্টর সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন সিরিয় গোয়েন্দারা। কিন্তু ট্রান্সমিটারের কাছাকাছি আসামাত্রই সেটি বন্ধ করে দেয়া হয়। কিন্তু টেকনিশিয়ানরা ঠিকই এলি কোহেন তথা কামাল আমিন তাবেতের বাসাটি চিহ্নিত করে ফেলে।

এক সিনিয়র গোয়েন্দা কর্মকর্তা অবশ্য বলেছিলেন, এ উদঘাটন সঠিক নয়। হয়তো কোথাও ভুল হচ্ছে। তার বক্তব্য তাবেতকে আগামী মন্ত্রিসভার বাথ পার্টির নেতারা মন্ত্রী করতে যাচ্ছেন। তার পক্ষে গোয়েন্দা হওয়া অসম্ভব। এলি কোহেন বা তাবেত সব সন্দেহের ঊর্ধ্বে।

কিন্তু বিকেলে ঐ ট্রান্সমিটারটি আবার চালু পাওয়া গেলে সিরিয় গোয়েন্দারা সেখানে হাজির হন। সকাল আটটায় চার সিরিয় গোয়েন্দা বন্দুক হাতে দরজা ভেঙে ঐ বাড়িতে ঢুকে পড়েন। গোয়েন্দা সেখানেই রয়েছে। কিন্তু ঘুমে নয়। তাকে হাতে-নাতে ধরা হয়। তখনো ট্রান্সমিশন চলছিল। ইসরাইলি ঐ গোয়েন্দা লাফিয়ে পড়ে সিরিয় গোয়েন্দাদের মুখোমুখি হন। ইসরাইলি গোয়েন্দা পালানোরও চেষ্টা করেননি আবার গ্রেফতার এড়াতেও চাননি। বিস্ময়বিভূত কমান্ডিং অফিসার। কামাল আমিন তাবেত তথা এলি কোহেন এই ট্রান্সমিটার চালাচ্ছেন।

ঝড়ের গতিতে দামেস্ক জুড়ে এই খবর ডালপালা ছড়াতে থাকে। সিরিয়র নেতারা এ খবর শুনলেন, কেউ বললেন, ননসেন্স, কেউ বললেন অসম্ভব, কেউ বললেন ফ্যান্টাস্টিক. ইমপসিবল ইত্যাদি। দামেস্ক জুড়ে একটাই প্রশ্ন, প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত বন্ধু, ক্ষমতাসীন দলের নেতা, একজন কোটিপতি তাবেত কী করে একজন গোয়েন্দা হন।

কিন্তু সব প্রমাণ তো হাজির। তাবেত জানালার শাটারের পেছনেসহ বিভিন্ন স্থানে ট্রান্সমিটারের যন্ত্রপাতি বসিয়েছেন। এ লোক রাষ্ট্রদ্রোহী না হয়ে যায় না।

সিরিয় জুড়ে যখন তাবেতকে নিয়ে ঝড় বয়ে যাচ্ছে– প্রশাসন ব্যাপক অনুসন্ধানের নির্দেশ দিল। আশংকা দেখা দিল প্রশাসনের অনেকের মনে। তাবেত কি তাদেরও জড়াতে পারেন? প্রেসিডেন্ট হাফেজ নিজে ছুটে গেলেন জেলখানায়। জিজ্ঞাসাবাদ করলেন তাবেতকে।

পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট হাফেজ বলেছেন, জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাবেতের চোখের দিকে তাকাতেই আমার মনে সন্দেহ দানা বাঁধে। আমার মনে হতে লাগল, আমার সামনে যে লোকটি দাঁড়িয়ে সে কোনো আরব নয়। কোরান ও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে আমি তাকে সতর্কতার সঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন করি। আমি তাকে সুরা ফাতেহা তেলাওয়াত করতে বলি। তাবেত কয়েকটি আয়াত ভুলভাবে পাঠ করেন বটে। নিজেকে নির্দোষ দাবি করে তাবেত বলেন, খুব ছোটবেলায় তিনি সিরিয়া ত্যাগ করেছেন। স্মরণশক্তি তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। প্রেসিডেন্ট হাফেজ বলেন, কিন্তু ঐ মুহূর্তেই আমি ধরে ফেলি যে, লোকটি ইহুদি।

অন্ধকারাচ্ছন্ন সেলে অচেতন অবস্থায় সারা শরীরে নানা আঘাতের চিহ্ন নিয়ে শুয়েছিলেন তাবেত। তার নখ উৎপাটন করা হয়েছিল। এদিকে তার জবানবন্দি প্রেসিডেন্ট জেনারেল হাফেজের কাছে পাঠানো হয়েছে। উপসংহার হল, লোকটি তাবেত নন, এলি কোহেন, ইসরাইলি ইহুদি।

১৯৬৫ সালে ২৪ জানুয়ারি দামেস্ক সরকারিভাবে একজন গুরুত্বপূর্ণ ইসরাইলি গোয়েন্দাকে গ্রেফতারের তথ্য প্রকাশ করে। এক সিনিয়র অফিসার সাংবাদিক সম্মেলনে রাগে গজগজ করতে করতে বলেন, ইসরাইল হল শয়তান আর সেই শয়তানের গোয়েন্দা এলি কোহেন।

দামেস্ক তথা সিরিয় জুড়ে আতঙ্ক, গুজব, গুঞ্জন। প্রশ্ন হল এলি কোহেন কি গোয়েন্দা চক্রে এককভাবে জড়িত, নাকি দলের নেতা তিনি।

একজন একজন করে ৬৯ জনকে গ্রেফতার করা হল। এর মধ্যে ২৭ জন নারী। সন্দেহভাজনদের মধ্যে আরও আছেন মাজেদ শেখ এল আরদ, সালেম সেইফ, লে. জাহের আলদিন, বেশ কয়েকজন সম্প্রচার কর্মকর্তা এবং যৌন কর্মী। এদের বাইরে আরও যেসব মহিলারা রয়েছেন তাদের পরিচয় প্রকাশ করা হচ্ছে না সংগত কারণেই। তাবেতের সঙ্গে জড়িত চারশত লোককে

জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই জিজ্ঞাসাবাদে কিছু সমস্যা ছিল। সিরিয়র বেশ কিছু রাজনৈতিক, সামরিক ও বয়স্ক নেতা এলি কোহেনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তদন্ত করেও তাদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। এমনকি তাদের নামও উল্লেখ করা যাবে না। তারাও গোয়েন্দাগিরির সঙ্গে যুক্ত এমন ধারণা সাধারণ্যে তৈরি হতে পারে। আরেকটি সমস্যা হল, তাবেত তার সঙ্গে যুক্তদের কোনো তালিকা কখনো তৈরি করেননি। ফলে চক্রটিকে ডিটেক্ট করা কঠিন।

এদিকে ইসরাইলের সামরিক বাহিনী এলি কোহেনের গ্রেফতার সম্পর্কিত কোনো সংবাদ প্রকাশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ইসরাইলিরা আশাবাদী তারা এলি কোহেনকে ছাড়িয়ে আনতে পারবেন। ফলে সংবাদ ছাপানোর ওপর এই নিষেধাজ্ঞা। এরই মধ্যে এক লোক এলি কোহেনের বাড়িতে গিয়ে তার ভাইকে গ্রেফতারের কথা জানায়। ইসরাইলের পক্ষে গোয়েন্দাগিরির জন্য এই গ্রেফতার।

গ্রেফতারের খবরে এলি কোহেনের ভাইয়েরা বিস্ময়াবিভূত। এক ভাই মায়ের বাসায় গিয়ে তাকে এলির গ্রেফতারের খবর দিলে তিনি প্রায় বোবা হয়ে যান। তিনি প্রশ্ন করেন সিরিয়ায় এলি কী করে গ্রেফতার হয়। এলি কি ভুল করে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে সিরিয়ায় চলে গিয়েছিল? এক পর্যায়ে বেহুঁশ হয় যান এলির মা।

নাদিয়া তার তিন সন্তানসহ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে। এমনকি তার সব সময়ই মনে হত তার স্বামী সব কথা তাকে বলছে না। নাদিয়া কখনোই ধারণা করতে পারেননি তার স্বামীর কাজের ক্ষেত্রটা কী। এলি কোহেনের সহকর্মীরা তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছিলেন। তাকে জানানো হল, এখনই তোমার প্যারিসের ফ্লাইট। কোহেনের ঐ সহকর্মীর আশ্বাস, আমরা সবচে ভালো উকিল নিয়োগ দেব। তাকে বাঁচানোর যা যা দরকার আমরা তা করব। মোসাদ-প্রধান মেইর অমিত ব্যক্তিগতভাবে এলি কোহেনকে বাঁচানোর দায়িত্ব নেন।

৩১ জানুয়ারি এলি কোহেনকে বাঁচাতে ফ্রান্সের সুপরিচিত আইনজীবী জ্যাকুয়েস মারসিয়ার সিরিয়ায় আসেন। সরকারিভাবে তার নিয়োগকর্তা এলি কোহেনের পরিবার বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে ইসরাইল সরকার তাকে প্রচুর টাকা দিয়ে নিয়োগ দিয়েছে। মারসিয়ার এই মিশন ছিল মিশন ইমপসিবল।

পরবর্তীতে মারসিয়ার এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, দামেস্কে আসার পর প্রথম দিনই আমার মনে হয়েছে এলি কোহেনের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। তাকে অবশ্যই ফাঁসি দেয়া হবে। তবে সময়ক্ষেপনোর মাধ্যমে কোনো প্যাকেজ বলে

তাকে বাঁচানোর লক্ষ্যে আমরা কাজ করতে থাকি।

প্রথমেই মারসিয়ার ট্রায়াল ঠেকানোর চেষ্টা করেন। মারসিয়ার সিনিয়র নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এলি কোহেনের সঙ্গে কথা বলা ও তার সই সংগ্রহের তদবির করেন। কিন্তু এলির সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়টি প্রথমবারেই না করে দেয়া হয়। সিরিয় সরকারের কিছু কর্মকর্তার সঙ্গে তার সখ্যতা ছিল। তারা বিশ্বজনমতও বেশ তোয়াক্কা করেন। এই মহলটি চাইছিলেন যাতে আসামির অধিকার ক্ষুণ্ন না হয়। তারা আসলে ভিন্ন কারণে ঐ অধিকার সমর্থন করেছিলেন। সামরিক বাহিনীর এই আমলা শ্রেণিটি মূলত প্রেসিডেন্ট হাফেজের ঘোরতর শত্রু। প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এলি কোহেন ওরফে তাবেত যে অনেক অপকর্মের হোতা তার বিচার প্রকাশ্য আদালতে হলে সরকারের ভাবমূর্তি অনেক ক্ষুণ্ন হবে। কিন্তু এই আবেদনে সরকারের আরেকটি অংশ ঘোরতরভাবে বিরোধিতা করে। তারাও জানতেন, প্রকাশ্য আদালতে বিচার হলেও কোহেনের ফাঁসি হবে। তারা এলি কোহেনকে অবিলম্বে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার পক্ষপাতী ছিলেন।

এতসব বাদানুবাদের পর অবশেষে একটি বিশেষ সামরিক আদালতে কোহেনের বিচার শুরু হল। মামলার যুক্তিতর্কের একটি অংশ সিরিয়র রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে দেখানোও হয়। অবশ্য এলি কোহেনের পক্ষে-বিপক্ষে কোনো আইনজীবী ছিল না। এলি কোহেন যখন তার পক্ষে একজন আইনজীবী নিয়োগের দাবি করেন তখন প্রিসাইডিং জজ এজলাসে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তিনি এলি কোহেনকে বলেন, আপনার জন্য কোনো আইনজীবীর দরকার হবে না। দুর্নীতিপরায়ণ গণমাধ্যম আপনার পক্ষে রয়েছে। রেভিল্যুশন-বিরোধীরাও আপনার পক্ষে। প্রকৃতপক্ষে প্রিসাইডিং জজই হয়ে ওঠলেন প্রসিকিউটর, প্রশ্নকারী ও বিচারক। তবে এই প্রিসাইডিং জজের জন্য স্পর্শকাতর বিষয়টি হল তিনিও তাবেতের সাবেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু। নাম ব্রিগেডিয়ার সালাহ্ ডালি। তাবেতের আরেক ঘনিষ্ঠতম বন্ধু কর্নেল সেলিম হাতুমও ছিলেন এই আদালতের আরেকজন বিচারক। হাতুমের সঙ্গে এলি কোহেনের সুসম্পর্কের গুজব ভণ্ডুল করতে হাতুম আদালত কক্ষে তাকে প্রশ্ন করেন; আপনি কি সালিম হাতুমকে চেনেন? মামলার আসামি এলি কোহেন একজন সুঅভিনেতার মতো আদালতের কোনোগুলো পর্যবেক্ষণ করে হাতুমের দিকে তাকিয়ে বলেন, না আমি তাকে এই কক্ষের কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।

এলি কোহেন ও সেলিম হাতুমের এই প্রশ্নোত্তরপর্বটি সিরিয়র সরকারি টিভিতে দেখানো হলে দামেস্কের সব মানুষ হাসিতে ফেটে পড়ে। ফরাসি আইনজীবী

মারসিয়ার বলেন, এটাকে মামলার শুনানি না বলে সার্কাস বলাই সংগত।

টেলিভিশন ক্যামেরা পুনঃপুনঃ এলি কোহেনের সহযোগী আলদিন, সেইফ ও কিছু যৌনকর্মী দেখালেও অন্য বান্ধবীরা কোথায়? সিনিয়র কর্মকর্তাদের পত্নীরা যারা ভিড় করে থাকতেন এলি কোহেনের কাছাকাছি। বাথ পার্টির সেই নেতারাই বা কোথায়? এলি কোহেনকে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে আটক করা হলে ইসরাইলে তিনি কী সব তথ্য পাঠিয়েছে তা কিন্তু মামলার আলোচনায় মুখ্য বিষয় ছিল না। এমনকি রেডিও বা ট্রান্সমিটারের প্রসঙ্গও উঠেনি। ক্যামেরা এলি কোহেনের বিধ্বস্ত চেহারা ও শরীরটাই বারে বারে দেখাচ্ছিল। আর এ যে তাকে নিষ্ঠুরভাবে মারধরের ফল তা সহজেই অনুমেয়।

ইসরাইল নীরবে এই বিচারকার্য পর্যবেক্ষণ করছিল। এলি কোহেনের পরিবারকে ইসরাইল সরকার একটা টেলিভিশন সেট ধার দিয়েছিল। এলির পরিবার টিভিতে প্রতিদিন তাকে দেখার সুযোগ পেত। ছেলে-মেয়েরা, নাদিয়া এবং এলির ভাইরা টিভিতে এলি কোহেনকে দেখে নীরবে কাঁদত। এলির ছবি যখনই পর্দায় ভেসে উঠত এলি কোহেনের মা সেই ছবিতে চুমু খেতেন। এলির মেয়ে সোফিয়া তার বাবাকে পর্দায় দেখে বলত, এই হল আমার বাবা। হি ইজ এ হিরো। নাদিয়া নীরবে কাঁদতেন।

৩১ মার্চ সামরিক আদালত তার রায়ে এলি কোহেন, মজিদ শেখ আল আর্দ এবং লে. জাহের আলদিনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়।

এলি কোহেনের ফরাসি আইনজীবীরা তার মক্কেলকে বাঁচাতে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন। ১৯৬৫ সালের এপ্রিল ও মে মাসে তিনি তিনবার দামেস্কে সফর করেন। তিনি ইসরাইল সরকারের একাধিক প্রস্তাব নিয়ে সেখানে যান। প্রথমত ইসরাইল সিরিয়কে ওষুধ ও কৃষির উন্নয়নে কোটি কোটি ডলারের আধুনিক যন্ত্রপাতি দিতে আগ্রহী। সিরিয় এই প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। ইসরাইলের কারাগারে এগারজন সিরিয় গোয়েন্দা আটক রয়েছে। তাদেরকে ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাবও সিরিয় প্রত্যাখ্যান করে। তবে একটা কথা বলে যে, প্রেসিডেন্ট যদি ক্ষমা করে দেন তাহলে ভিন্ন কথা।

১ মে এল আর্দের মৃত্যুদণ্ডের সাজা কমিয়ে যাবজ্জীবন করা হয়। ৮ মে এলি কোহেনের সাজার কথা সরকারিভাবে ঘোষিত হয়। মোসাদ অতঃপর নাদিয়াকে দিয়ে তার স্বামীকে নির্দোষ ঘোষণার জন্য সিরিয় দূতাবাসে একটা আবেদন করায়। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে এলি কোহেনকে ছেড়ে দেয়ার বিবৃতি আসতে শুরু করে। পোপ পল, দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল, বেলজিয়ামের রাণি,

ইটালির কার্ডিনাল ও মন্ত্রীরা, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ২২জন সদস্য, হিউম্যান রাইটস লিগ, আন্তর্জাতিক রেডক্রস এলি কোহেনকে মুক্তি দেয়ার দাবি জানায়। মূলত এ তালিকা ছিল দীর্ঘ।

১৮ মে মধ্যরাতে জেলার এলি কোহেনকে ঘুম থেকে জাগান। তাকে সাদা রংয়ের বিশাল একটা গাউন পরানো হয় এবং দামেস্কের মার্কেটপ্লেসে নেয়া হয়। তাকে তার পরিবারের উদ্দেশে একটি চিঠি লেখার সুযোগ দেয়া হয়। দামেস্কের ইহুদি সম্প্রদায়ের এক ধর্মগুরু বা রাব্বি নিসিমের সঙ্গেও তাকে দু'একটি কথা বলতে দেয়া হয়। সিরিয়র সেনাবাহিনী তার বুকে বিশাল একটি পোস্টার ঝুলিয়ে দেয়। তাতে আরবিতে বড় বড় অক্ষরে তার মৃত্যুদণ্ডের কথা লেখা হয়। দুই সারি সশস্ত্র সৈন্যদের মাঝখান থেকে একাকী এলি কোহেনের ফাঁসির মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাওয়া টিভি ও পত্রিকার ক্যামেরার প্রধান দ্রষ্টব্য হয়ে দাঁড়ায়।

জল্লাদ বসেই ছিল। সে দ্রুত ফাঁসির রজ্জু এলি কোহেনের গলায় ঝুলিয়ে দেয়।

এলি সমবেত জনতার দিকে একবার তাকালেন। নিশ্চুপ তিনি। কিন্তু পরাজয়ের কোনো গ্লানি তার চোখে-মুখে দেখা যায়নি। জনতা শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় সমবেত। ফাঁসি হয়ে গেল এলি কোহেনের। ইসরাইলি গোয়েন্দার ফাঁসি হওয়ায় সিরিয় জনতার সে কী উল্লাস! কয়েক ঘণ্টা ধরে রাত জেগে দামেস্কের মানুষ এলি কোহেনের মৃতদেহ দেখতে থাকে।
এদিকে ফাঁসি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এলি কোহেন ইসরাইলের জাতীয় বীরে পরিণত হন। হাজার হাজার লোক তার জন্য শোক করতে থাকে। তার নামে ইসরাইলে স্কুল, রাস্তা এবং পার্কের নামকরণ করা হতে থাকে। এলি কোহেনের গুণগান করে অসংখ্য লেখা ছাপা হতে থাকে।

এলি কোহেন তার অন্তিম চিঠিতে স্ত্রী নাদিয়াকে পুনর্বার বিয়ে করতে বললেও নাদিয়া সে কথা রাখেননি। মৃত্যুর ৪৬ বছর পরও সিরিয় এলি কোহেনের লাশ ফেরত দিতে এবং ইসরাইলে সমাধিস্থ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছে। এলি কোহেনকে মোসাদের একজন বীর বা হিরো হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

এতদসত্ত্বেও কিছু লোক এলির পরিণতির জন্য মোসাদকে দায়ী করে থাকে। এলি কোহেনের পরিবার এবং বহু লেখকের অভিমত মোসাদ তাকে যথেচ্ছভাবে কাজে লাগিয়েছে। প্রতিদিনই তাকে দিয়ে রেডিও ট্রান্সমিশন করিয়েছে। কোনো কোনো দিন দু'বার। মোসাদ সিরিয় পার্লামেন্টের বাদানুবাদ এলি কোহেনকে নিয়মিত পাঠানোর নির্দেশ দেয়। কিন্তু এই রিপোর্টের

প্রয়োজনীয়তা ছিল শূন্য। এসব উদ্দেশ্যহীন কাজ এলি কোহেনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়।

এলি কোহেন ছিলেন 'মহান' এক গোয়েন্দা। তার জীবন-অবসানের মধ্য দিয়ে মহান গোয়েন্দাদের অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে।
মোসাদের অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাস এবং কাজ আদায়ে বাড়াবাড়ি তার লোকদের মৃত্যুঝুঁকি যে বাড়িয়ে দেয়, তা বলাই বাহুল্য।

মিসরের মারণাস্ত্র প্রকল্প ভণ্ডুল

১৯৬৩ সালের আগস্টে মাদ্রিদের একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিতে দু'জন লোক ঢুকে মালিকের সঙ্গে দেখা করতে চাইল। অস্ট্রিয়ার এই মালিকের নাম অট্টো স্করজেনি। তারা মালিককে ন্যাটোর অফিসার পরিচয় দিল এবং পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করা তার স্ত্রীর কাছে একটা চিঠি লিখে দিতে বলল।

খুব অল্পতেই ঐ সম্মানিত ব্যবসায়ী বুঝলেন, আগতরা তার অতীত-বর্তমান সবই জেনে এসেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় স্করজেনি ছিলেন একজন ডাকসাইটে কর্মকর্তা। আসলে তার চেয়েও অধিক। এবং অবশ্যই জার্মানিতে। সুদর্শন, ডেয়ারডেভিল এই কম্যান্ডোর অভিযানগুলো ছিল তুলনা রহিত এবং দর্শনীয়। ১৯৪৩ সালের ১২ সেপ্টেম্বর ছত্রী-সেনাদের একটি ব্যাটেলিয়ন নিয়ে অত্যন্ত সুরক্ষিত স্থান থেকে ফ্যাসিস্ট ডিকটেটর বেনিতো মুসোলিনিকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছিলেন। নাজিবিরোধী ইটালী সরকার মুসোলিনিকে জেল দিয়েছিল। এসএস ক্যাপ্টেন স্করজেনি মুসোলিনিকে হিটলারের সামনে উপহার দিলে তাকে অনেক পদক ও পদোন্নতি দেয়া হয়। স্করজেনি অসংখ্য বিপজ্জনক অভিযান সফলভাবে পরিচালনা করেছিলেন। এজন্য তাকে ইউরোপের সবচে ভয়ানক মানুষ হিসেবে খেতাব দেয়া হয়েছিল।

যুদ্ধাপরাধ আদালত থেকে মুক্ত হয়ে স্করজেনি স্পেনে বসবাস শুরু করেন এবং তার ব্যবসাও বেশ জমে উঠে।

স্করজেনির কাছে আগত এই দুই যুবক বলল, আমরা আসলে ন্যাটোর গোয়েন্দা নই। আমরা ইসরাইলি গোয়েন্দা বিভাগের লোক। এই দুই লোক হল রাফি এইতান ও জার্মানিতে নিযুক্ত মোসাদ বাহিনীর প্রধান আব্রাহাম।

স্করজেনির মুখটা ইসরাইলের কথা শুনে বিমর্ষ হয়ে পড়ল। কেননা বছরখানেক আগে ইহুদি হত্যার জন্য তারা এডলফ আইচম্যানকে ফাঁসি দিয়েছে। এবার কি তার পালা? সামনে বসা ছোটখাট লোকটা স্করজেনির ভয়টা ভাঙিয়ে দিল। গোয়েন্দাটি বলল, আপনার মিসরে খুব ভালো যোগাযোগ রয়েছে। একটা ব্যাপারে আমরা শুধু আপনার সহযোগিতা চাই।

১৯৬২ সালের ২১ জুলাই ইসরাইলে ইয়েসেলির আগমনের দুই সপ্তাহ পরে মিসর ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির সংবাদ জানিয়ে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিল। এর মধ্যে দুটি ক্ষেপণাস্ত্রের শক্তি ১৭৫ মাইল করে, বাকি দু'টির ৩৫০ মাইল করে। ২৩ জুলাই মিসরের বিপ্লব দিবসের প্যারেডে বহু মিসাইল থরে থরে সাজিয়ে

প্রদর্শিত হল। মিসরের প্রেসিডেন্ট গামাল আবদেল নাসের এক বিশাল সমাবেশে বললেন, তাদের মিসাইল বহু বহু দূরের টার্গেটে হিট করতে সক্ষম।

প্রেসিডেন্ট নাসেরের মূল টার্গেট হল ইসরাইল। অর্থাৎ ইসরাইলের যে কোনো স্থান তা আঘাতে সক্ষম। মিসরের এই সাফল্য ইসরাইলকে বিস্মিত করল এবং ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা মোসাদ-প্রধান ইসার হারেলের প্রতি ক্রোধপূর্ণ সব মন্তব্য করতে লাগলেন। কেন মোসাদ তাদেরকে আগে-ভাগে কিছু জানাতে পারল না। কেউ কেউ এমনও বললেন, নাসের যখন সাংঘাতিক সব অস্ত্র বানাচ্ছেন সেখানে হারেল ক্ষুদে ইয়েসেলিকে উদ্ধারে দেশ-বিদেশ করছেন।

উদ্বিগ্ন বেন গুরিয়ান আইসার হারেলকে ডেকে মিসরের রকেট-ক্ষেপণাস্ত্রের আপডেট দিতে বললে তিনি তাতে সম্মতি দেন। আইসার হারেল এক দক্ষ গোয়েন্দাকে এ ব্যাপারে মিসরে পাঠালেন। মাস-খানেকের মধ্যে হারেল বেন গুরিয়ানকে মিসরের চারটি ক্ষেপণাস্ত্র লঞ্চিং সংক্রান্ত তথ্যাদি দিলেন।

আইসার হারেল রিপোর্টে লিখলেন যে, জার্মানির বিজ্ঞানীরা মিসরকে এ প্রকল্পে সহায়তা করছে।

১৯৫৯ সালে নাসের আনকনভেনশনাল অস্ত্র বানানোর লক্ষ্যে গোপন একটি প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করেন।
নাসের এই প্রকল্পের দায়িত্ব দেন সাবেক এয়ারফোর্স ইন্টেলেজিন্সের কমান্ডার জেনারেল খলিলকে। স্পেশাল মিলিটারি প্রোগ্র্যামস ব্যুরোর তিনি প্রধানও। তার ওপর দায়িত্ব পড়ল যুদ্ধবিমান, রকেট মিসাইল একই সাথে রাসায়নিক ও তেজস্ক্রিয় অস্ত্র বানানোর। এই খাতে প্রচুর বরাদ্দও দেয়া হল।

জেনারেল খলিলের প্রথম কাজ হল, এসব অস্ত্র বানাতে সক্ষম ব্যক্তিদের এনে জড়ো করা। এবং তিনি জানতেনও, লোক কোথায় পাওয়া যাবে।

নাজি জার্মানিতে রকেট ইত্যাদি অত্যাধুনিক অস্ত্রাদি বানিয়েছে এমন দক্ষ বিজ্ঞানী, বিশেষজ্ঞদের অনেক বেতন, ভাতা, বোনাস ও হাজারো সুবিধা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জেনারেল খলিল তাদের মিসরে এনে জড়ো করলেন। এদের সংখ্যা তিন শতাধিক।

মিসরের একটি প্রকল্পের নাম ৩৬। এখানে যোগ দিলেন যুদ্ধবিমান বানাতে দক্ষ উইলি মেসেরস্পীট। তিনি একটি মিসরীয় যুদ্ধবিমান এসেম্বলিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মেসেরস্পিটকে মারাত্মক যুদ্ধবিমান তৈরির জনক বলা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাজি বিমান বাহিনীতে তিনি এই পদবি পান।

জেনারেল মোট তিনটি প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করে জগৎজোড়া বিজ্ঞানীদের সেখানে নিয়োগ দেন। তিনটি প্রকল্পের মধ্যে ৩৩৩ নম্বর প্রকল্পটি ছিল গোপন ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে। এখানেও হিটলারের লোকজন ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে তৎপর ছিলেন।

মোসাদ-প্রধান আইসারের পর্যবেক্ষণ হল ১৯৬০ সালের পর প্রেসিডেন্ট নাসেরের অত্যাধুনিক অস্ত্র নির্মাণের প্রকল্পগুলো পূর্ণ উদ্যমে কাজ শুরু করে। ঐ বছরই আমেরিকার একটি বিমান থেকে তোলা ছবির সূত্র ধরে বলা হয় ইসরাইল পরমাণু বোমা বানানোর প্রকল্প হাতে নিয়েছে। বিশ্ব গণমাধ্যম ব্যানার হেডিং করে সেই খবর ছাপে। ইসরাইল যতই বলল, ওটা টেক্সটাইল কারখানা– কেউ তাতে কর্ণপাত করে না। এদিকে মিসরসহ আরব দেশগুলো ইসরাইলের বিরুদ্ধে হুমকি দেয়। মিসর সিদ্ধান্ত নেয়, ইসরাইলের পারমাণবিক বোমার বিরুদ্ধে তাদের অত্যাধুনিক অস্ত্র বানানোর প্রকল্পগুলো আরও জোরেসোরে এগিয়ে নিতে হবে।

জার্মানিতে রকেট বানাতেন যে বিজ্ঞানীরা তাদের প্রধান ছিলেন প্রফেসর ইউজেন স্যাঙ্গার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি কয়েক বছর ফ্রান্সে কাটান; সেখানে তিনি ভেরোনিক রকেট বানান। এটি জার্মানিদের ভি২ রকেটের একটি সংস্করণ। এভাবে মিসরে জড়ো হওয়া জার্মান বিজ্ঞানীরা জার্মানিতে বটেই পরবর্তীতে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে বিস্ময়কর অস্ত্র বানাতে শুরু করেন। ইউজেন স্যাঙ্গার মিসরীয় প্রকল্পে যোগ দিলে তার সঙ্গী সাথী বিজ্ঞানীদেরও সেখান নিয়ে আসেন। জার্মান ও মিসরীয়রা মিলে এসব প্রকল্পের জন্য কয়েকটি ফ্রন্ট অফিস খোলেন। হাসান কামিল নামের এক মিলিয়নিয়ার বাস করতেন সুইজারল্যান্ডে। তিনি লিয়াজোঁ করতেন মিসরীয় প্রকল্পে। তারা সুইজারল্যান্ডে দুটি ডামি কোম্পানিও প্রতিষ্ঠা করেন। ছয়টি কোম্পানির কাজ ছিল মিসরীয় প্রকল্পের জন্য নানারকম যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ সংগ্রহের।

১৯৬১ সালে স্যাঙ্গার এবং কয়েকশত দেশি-বিদেশি বিজ্ঞানী ও টেকনিশিয়ান মিসরীয় ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ শুরু করেন। কিন্তু বছরের শেষ দিকে জার্মান সরকার জানতে পারে যে, তাদের স্টুটগার্টের প্রকল্পের কিছু লোক মিসরীয় প্রকল্পে কাজ করছে। জার্মান সরকার অতঃপর স্যাঙ্গারকে জার্মান যেতে বাধ্য করে। প্রফেসর পিলজ মিসরীয় প্রকল্পের প্রধান হন।

১৯৬২ সালের জুলাইয়ে মিসরের ৩৩৩ প্রকল্প ত্রিশটি মিসাইল বানিয়ে ফেলে। তার মধ্যে চারটি মিসাইল নির্দিষ্ট অতিথি ও সাংবাদিকদের দেখান হয়। কুড়িটি মিসাইল সে দেশের পতাকা জড়িয়ে কায়রোর রাস্তায় প্রদক্ষিণ করে।

মোসাদ-প্রধান হারেল আগস্ট মাসে বেন গুরিয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সময় পিলজের লেখা একটি চিঠি সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। চিঠিটি মিসরের ৩৩৩ প্রকল্পের পরিচালক কামিল আজবকে লেখা। ঐ চিঠিতে পিলজ টাইপ টু'এর পাঁচশত মিসাইল টাইপ পাঁচশত মিসাইল বানানোর জন্য ৩৭ লক্ষ সুইস ফ্রাঙ্ক বরাদ্দের কথা বলেন। ঐ সব ক্ষেপণাস্ত্রের মেশিন পার্টস ও যন্ত্রপাতির জন্য ঐ টাকার প্রয়োজন। অর্থাৎ নয়শত মিসাইল বানাচ্ছে মিসর।

এই চিঠি দেখে ইসরাইলি শীর্ষ পর্যায়ে মাথা খারাপের যোগাড় হয়। মোসাদ-প্রধানের আশংকা জার্মানির বিজ্ঞানীরা প্রতারণার মাধ্যমে ইসরাইলকে ধ্বংস করতে চায়। এসব অস্ত্র দিয়ে তারা পৃথিবীতে রোজ কেয়ামত ঘটিয়ে ছাড়বে। মিসরের অস্ত্রভাণ্ডারে এমন অস্ত্র আসছে যা যে কোনো জীবন্ত প্রাণীর অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম হবে। ইসরাইলের ভূখণ্ডে এমন একটি নারকীয় গ্যাস তারা ছাড়তে সক্ষম হবে যার অস্তিত্ব বহুদিন অনুভূত হবে ইত্যাদি।

ঐ সময় ইসরাইলের চিফ অব স্টাফ ছিলেন জেনারেল জভি জুর। পরবর্তীতে তিনি বলেছেন, মিসরের অস্ত্র বানানোর বিষয়টি তারা খুবই গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ইসরাইলি বিজ্ঞানীরা সৌখিন এবং তথ্যের ব্যবহার তারা জানে না।

মোসাদ-প্রধানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সব সময়ই ঈর্ষণীয়। সবাই তাকে ভালো বাসতেন, ভালো জানতেন। কিন্তু আইচম্যানকে আটকের পর তার মানসিকতা ও চালচলনে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। স্টিলের মতো শক্ত এই মানুষটি এখন জার্মানির বিরুদ্ধে লেগেছেন। কেননা জার্মানির বিজ্ঞানীরা ইসরাইল ও ইহুদি জনগোষ্ঠীকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়। মোসাদ-প্রধান বেন গুরিয়ানকে বললেন, জার্মান চ্যান্সেলরের সঙ্গে কথা বলতে। বেন গুরিয়ান জার্মান চ্যান্সেলর কোনোরাদ এডেনাউয়ের সঙ্গে তাদের বিজ্ঞানীদের ব্যাপারে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানালেন। কেননা সম্প্রতি জার্মানি ইসরাইলের একটি মরুভূমির উন্নয়নে পাঁচশত মিলিয়ন ডলার সাহায্য দিয়েছে। গুরিয়ান ও জার্মান চ্যান্সেলরের মধ্যে সম্প্রতি ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।

জার্মান চ্যান্সেলর এবং তার প্রতিরক্ষামন্ত্রী ফ্রানিজ যোশেফ ইসরাইলকে শত শত কোটি টাকার আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ট্যাংক, কামান, হেলিকপ্টার, যুদ্ধবিমান ইত্যাদি। সবই বিনামূল্যে। হালোকাস্টের মাধ্যমে জার্মানির পক্ষ থেকে ইহুদিদের ওপর যে ভয়াবহ নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ হয়েছে তার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এই উপহার। বেন গুরিয়ান বর্তমান জার্মান সরকারকে

বিশ্বাস করেন এবং মিসরকে কেন্দ্র করে তিনি এই সম্পর্ক কোনোভাবেই নষ্ট করতে চান না। গুরিয়েন তার প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী শিমন পেরেজকে একটি ব্যক্তিগত চিঠি লেখার পরামর্শ দেন।

কিন্তু এতটুকুতে মোসাদ-প্রধান আইসার সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি মিসরে জার্মানদের কর্মকাণ্ড প্রতিহত করতে ব্যক্তিগতভাবে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর প্রতিজ্ঞা করেন।

১৯৬২ সনের ১১ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে দশটায় এক অপরিচিত ব্যক্তি মধ্যপ্রাচ্যের অধিবাসীর চেহারার একজনকে সঙ্গে নিয়ে মিউনিখে মিসরীয়দের উল্লেখিত একটি প্রকল্প অফিসে আসে। আধঘণ্টার মধ্যে হেনজ ক্রুগকে নিয়ে তারা ভবন ত্যাগ করে।

পরদিন সকালে মিসেস ক্রুগ পুলিশকে জানান যে, তার স্বামী নিখোঁজ। দুদিন পরে পুলিশ ক্রুগের সাদা মাইক্রোবাস গাড়িটি মিউনিখের শহরতলী থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে। গাড়িটি কাদা দিয়ে ল্যাপা ছিল এবং ট্যাঙ্কে এক ফোঁটাও পেট্রোল ছিল না। অচেনা এক লোক ফোন করে ক্রুগের মৃত্যুর সংবাদ দেয়। পুলিশ অবশ্য অন্য একটি সূত্র থেকে জানতে পেরেছিল, মোসাদ ক্রুগকে অপহরণ করে ইসরাইলে নিয়ে গেছে। যাহোক এখন সন্দেহাতীত যে, ক্রুগ মারা গেছেন।

২৭ নভেম্বর পিলজের সেক্রেটারি ওয়েন্ডি তার ৩৩৩ ফ্যাক্টরির অফিসে একটি খাম দেখতে পান। প্রেরক হামবুর্গের বিশিষ্ট আইনজীবী। ওয়েন্ডি খামটি খোলামাত্র একটা বিস্ফোরণে অফিসটি কেঁপে উঠে। পিলজের সেক্রেটারি কয়েক মাস হাসপাতালে কাটালেও তার চোখ অন্ধ হয়ে যায়। তার মুখমণ্ডল বিকৃত এবং তিনি কালো হয়ে যান।

পরের দিন মিসরের ৩৩৩ নম্বর ফ্যাক্টরির ঠিকানায় এক বই প্রকাশকের অফিস থেকে একটা প্যাকেট আসে। প্যাকেটে লেখা ছিল বই। যখন এক মিসরীয় ক্লার্ক সেটি খোলে অমনি তা বিস্ফোরিত হলে পাঁচজন লোক নিহত হয়। প্যাকেটে প্রকাশকের যে ঠিকানা ছিল তা স্পষ্টতই ভুয়া ছিল।

এরপর জার্মানি থেকে এবং মিসরের ভেতর থেকে এরকম প্যাকেট আসতে থাকে। সেগুলো বিস্ফোরিত ও লোকজন আহত হতে থাকে।

পরবর্তীতে মিসরের অস্ত্র নির্মাণ প্রকল্প থেকে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়। সেনাবাহিনী বেশ কিছু বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয়ও করে। মিসরবাসী এবং সাংবাদিকদের বুঝতে বাকি থাকে না কায়রোতে এর প্রেরক ইসরাইলি

গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ। আরও পরে জানা যায় কিছু পার্সেলের প্রেরক 'শ্যাম্পেন স্পাই' নামের এক গোয়েন্দা। মিসরেই ভিন্ন পরিচয়ে তিনি থাকেন এবং জার্মানির সাবেক এসএস অফিসার বলে পরিচয় দেন। জার্মান স্ত্রীকে নিয়ে তিনি কায়রোতে স্থায়ী এবং মিসরের হাই সোসাইটি ও শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তাদের খুব ঘনিষ্ঠ।

পত্রবোমা জার্মান বিজ্ঞানীদের আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে এবং তাদের প্রাণ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে বলে ধারণা করেন। প্রেসিডেন্ট নাসেরের প্রকল্পে তাদের এবং তাদের স্বজনদের কাজ না করার জন্য বেনামে ফোন দেয়া হতে থাকে। নাসেরের তিন প্রকল্পে কড়া নিরাপত্তা দেয়া শুরু হয়। জার্মানিতেও তাদের অফিসে কড়া নিরাপত্তা চালু হয়। বিজ্ঞানীরা যখন ইউরোপ যেতেন তখন তারা একসঙ্গে থাকতেন এবং জার্মান পুলিশের সাহায্য নিতেন। এর ফলে সম্ভবত প্রফেসর পিলজের ১৯৬২ সালের শেষার্ধে একবার জীবন রক্ষা পায়। তাকে মোসাদ ফলো করলেও হত্যার সুযোগ পায়নি।

মোসাদ-প্রধান আইসার ১৯৬২ সালের অধিকাংশ সময় মিসর-ইস্যুতে ইউরোপেই কাটান একং মোসাদ গোয়েন্দাদের নানাকাজে নিয়োগ করেন। রাফি এইতান বিজ্ঞানীদের চিঠিপত্র গায়েবে ওস্তাদ এবং এজেন্ট নিয়োগের পরিবর্তে এ কাজে তিনি সাফল্য দেখান। এইতানের মতে, চিঠিপত্রের মাধ্যমে ফার্স্টক্লাস ম্যাটেরিয়াল পাওয়া যায়।

অপ্রচলিত পন্থায় অভিযান চালানোর জন্য এইতানের কিছু ইলেকট্রোনিক যন্ত্রপাতি দরকার। কিন্তু সেগুলো দোকানে পাওয়া যায় না। এসব যন্ত্রপাতি সিআইএসহ কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থা ব্যবহার করে। পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের সূত্র ধরে এইতান ল্যান্সকি নামের এক ডাকাতের সন্ধান পান মিয়ামিতে। সে-ও ইহুদি। তাকে ফোনে পাওয়া গেলে সে জানায়, সুইজারল্যান্ডে এক মাসের মধ্যে সে এইতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। ল্যান্সকি এইতানের শিকাগোর এক লোকের ঠিকানা দিলে তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনেক যন্ত্রপাতি পাওয়া যায়।

মোসাদ-প্রধানের এবারের টার্গেট ড. অট্রো জোকলিক। সূত্র মতে, ড. জোকলিক একজন অস্ট্রীয় বিজ্ঞানী এবং পরমাণু রেডিয়েশনে তার বিশেষ ব্যুৎপত্তি রয়েছে। তার আরেকটি বিশেষত্ব হল স্বল্প সময়ে তিনি পরমাণু বোমা বানাতে পারেন। ড. অট্রো জোকলিকের জন্য তেজস্ক্রিয় পদার্থ ক্রয়ের জন্য মিসর অস্ট্রিয়ায় একটি ফ্রন্ট অফিস খোলে। ওখান থেকে মালামাল মিসরে পাঠানো হবে। জোকলিক মিসরের জন্য দুটি পরমাণু পরীক্ষা চালাবেন এবং

বেশ কিছু পরমাণু বোমা বানাবেন যা ক্ষেপণাস্ত্রের ওভারহেডে যুক্ত করা হবে।

এসব ঘটনায় সহজেই অনুমেয় জোকেলিক একজন ভয়ংকর মানুষ। এমনও হতে পারে জার্মানির বিজ্ঞানীদের মধ্যে সবচে ভয়ংকর। মোসাদ জরুরি ভিত্তিতে জোকলিককে খুঁজে বের করতে ইউরোপে তাদের সব গোয়েন্দার কাছে বার্তা পাঠায়।

১৯৬২ সালের ২৩ অক্টোবর মোসাদ-প্রধান আইসার একটি ঘটনায় স্তম্ভিত। ইউরোপে ইসরাইলি দূতাবাসের কলিংবেল টিপে এক লোক নিরাপত্তা কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন। সেখানে তিনি বললেন, আমিই অট্টো জোকলিক। মিসরের জন্য আমি যেসব মারণাস্ত্র বানাচ্ছি তার একটি প্রতিবেদন ইসরাইলকে দিতে আমি প্রস্তুত।

দুই সপ্তাহ বাদে ব্যাপক গোপনীয়তার মধ্যে জোকলিক ইসরাইল যান। বেশ কয়েকমাস পরে জোকলিকের স্বপক্ষ ত্যাগের বিষয়টি যখন প্রকাশ্যে এল তখন ইউরোপের সাংবাদিকরা লিখতে শুরু করলেন যে, তিনি ইসরাইলিদের সঙ্গে ভিড়েছেন। বিশেষ করে ক্রুগের মৃত্যুর পরে। প্রকৃতপক্ষে জোকলিক সব সময়ই ক্রুগের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। ক্রুগ অপহৃত হলে জোকলিক আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তার আশংকা ক্রুগ যদি ইসরাইলিদের দ্বারা অপহৃত হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি অবশ্যই তার নাম বলেছেন। মিসরীয়দের অস্ত্র প্রকল্পে তার গুরুত্বের কথা বলেছেন। ফলে জোকালিক ভাবলেন, ইহুদিদের হাতে তার মৃত্যু অবধারিত। ফলে তিনি স্বপক্ষ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং ইসরাইলিদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। আর জীবন বাঁচাতে যে তিনি এটা করেছেন তা বলাই বাহুল্য।

জোকলিক ইসরাইলে ছিলেন। মোসাদ তাকে সার্বিক নিরাপত্তা দিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে রেখেছিল। মোসাদ-প্রধান তাকে বিশেষ দুটি কাজে লাগাতে চাইলেন। প্রথমত, তার মাধ্যমে মিসরীয় প্রজেক্ট সম্পর্কে তথ্য পাওয়া; আরেকটি হল মিসরে ফিরে গিয়ে মোসাদের পক্ষ হয়ে কাজ করা। এক কথায় ডাবল এজেন্ট।

অট্টো জোকলিক ইসরাইলিদের জানান, একজন সিনিয়র জার্মান ক্লার্কের মাধ্যমে তার সঙ্গে জেনারেল খলিলের পরিচয় ঘটে এবং নিয়োগ লাভ করেন।

মিসরীয়দের একটি প্রকল্পের নাম ছিল ক্লিওপেট্রা। এই প্রকল্পের দুটি পরমাণু বোমা বানানোর কথা। জোকলিক এক্ষেত্রে প্রতিভাদীপ্ত দুটি প্রক্রিয়ার কথা

বলেন। তার যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপ থেকে ২০ ভাগ সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম কিনে জার্মানি ও হল্যান্ডে তা আরও সমৃদ্ধ করে বিশেষ পরমাণু শক্তিতে রূপান্তর করার পরিকল্পনা ছিল। এক্ষেত্রে জার্মানি ও হল্যান্ডের তিনজন জগৎবিখ্যাত বিজ্ঞানীকে তিনি তালিকাভুক্ত করেন। আর ঐ সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম দিয়েই পরমাণু বোমা বানানো হবে।

জোকলিক সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম কেনার জন্য যুক্তরাষ্ট্র যান। তিনি জার্মান বিজ্ঞানীদের সঙ্গে ব্যাপকভাবে কথাও বলেন এবং মিসরে পরমাণু বোমা বানানোর দাওয়াত দেন। ইউরোপ থেকে তিনি বেশ কিছু নিকেল জাতীয় জিনিস কেনেন এবং তা কায়রোতে পাঠাতে সক্ষম হন।

জোকলিকের রিপোর্ট বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেননি। প্রথমত শতকরা কুড়ি ভাগ সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম পাওয়া কঠিন। আরও কিছু হিসাব কষে বিশেষজ্ঞরা বললেন, জোকলিকের ফর্মুলা ভুল।

বিশেষজ্ঞদের শীতল মন্তব্য মিসরের নেতাদের দমাতে ব্যর্থ হল। মিসরীয়রা রাসায়নিক অস্ত্র বানাচ্ছে এ নিয়ে রিপোর্ট ছাপা হলে তারা আরও সতর্ক হয়। ১৯৬৩ সালের ১১ জানুয়ারি মিসর ইয়েমেনে সঙ্গে যুদ্ধে পয়জন গ্যাস ব্যবহার করে। ফলে বিশ্ববাসী ও উল্লেখিত বিজ্ঞানীরা বললেন, তাদের ধারণা অমূলক নয়। ইসরাইলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গোল্ডা মেয়ার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডিকে বিষয়টি জানান। গোল্ডা মেয়ার তাকে বলেন যে, মিসর আনকনভেনশনাল ওয়ারহেড ব্যবহার করে মিসাইল বানাচ্ছে। কেনেডিকে তিনি হস্তক্ষেপ করতে বলেন। কিন্তু কেনেডি এ নিয়ে কিছুই করেননি।

আনকনভেনশনাল ওয়ারহেডস খুবই ভয়ানক। কিন্তু মিসর তাদের প্রথম অগ্রাধিকার দিল মিসাইল গাইডেন্স সিস্টেমকে বাধাগ্রস্ত করার কাজে।

১৯৬৩ সালের শীতকালে মিসরের ৩৩৩নং ফ্যাক্টরির গাইডেন্স বিশেষজ্ঞ ড. ক্রেইনওয়াচার কয়েক সপ্তাহের জন্য জার্মান আসেন। নিজের ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে অন্ধকার ও সরু গলি দিয়ে তিনি তার বাসায় যাচ্ছিলেন। রাস্তায় অনেক পুরু বরফও ছিল। হঠাৎ বিপরীত দিক থেকে একটি গাড়ি এসে তার পথ আটকায়। গাড়ি থেকে একটি লোক নেমে ক্রেইনওয়াচারের দিকে এগোতে থাকে। বিজ্ঞানী তৃতীয় একটি লোককেও গাড়িতে দেখতে পান। আগত ব্যক্তিটি ক্রেইনওয়াচারের কাছে জানতে চান ড. সেনকার কোথায় থাকেন? উত্তরের জন্য কোনো অপেক্ষা না করেই লোকটি তার সাইলেন্সার লাগানো রিভলবার দিয়ে ক্রেইনওয়াচারকে গুলি করে। গুলিতে গাড়ির সামনের কাচ

ভেঙে যায় এবং ক্লেইনওয়াচারের উলের মাফলারে আটকে যায়। ক্লেইনওয়াচার তার রিভলবার বের করার আগেই আততায়ী দ্বিতীয় একটি গাড়িতে চড়ে পালিয়ে যায়।

পুলিশ দেখে যে, ঘটনাস্থল থেকে একশ গজ দূরে প্রথম গাড়িটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। আগত তিনজনই আরেকটি গাড়িতে করে পালিয়েছে। তারা আলি সামিরের একটি পাসপোর্ট ফেলে যায়। আলি সামির হলেন মিসরীয় গোয়েন্দা বাহিনীর একজন প্রধান। তিনি তখন কায়রোতে। যাহোক, ক্লেইনওয়াচারের ওপর হামলাকারীদের কাউকেই খুঁজে পাওয়া যায়নি। সবগুলো পত্রিকারই একই মন্তব্য, এ হত্যা প্রচেষ্টা ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের। যদিও এবারের হত্যা চেষ্টা সফল হয়নি।

মোসাদের এবারের টার্গেট সুইজারল্যান্ডে জার্মান বংশোদ্ভূত ড. পলে গোয়েরকেকে নিধন!
ক্লেইনওয়াচারের অনুরূপ গোয়েরকে মিসরের মিসাইল প্রজেক্টে গাইডেন্স সিস্টেমে কর্মরত। তিনি মিসরের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে মর্যাদা পান। মোসাদের কাছেও ভিন্ন কারণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ।

গোয়েরকের মেয়ে হেইদির জার্মানিতে সুইস সীমান্তের কাছে বসবাস। ক্লেইনওয়াচারের ওপর মোসাদের হামলার পর ড. জোকলিক হেইদিকে ফোন করে বলেন যে, তার বাবার সাথে মিসরে তার দেখা হয়েছে। সেখানে তিনি ইসরাইল ধ্বংস করার লক্ষ্যে বিপজ্জনক অস্ত্র বানাচ্ছেন। জোকলিক হেইদিকে ইংগিত করেন যে, তার বাবা যদি ঐ বিপজ্জনক কাজ থেকে ফিরে না আসে, তাহলে তার জীবন বিপন্ন হতে পারে। এর বিকল্প হল, যদি তিনি মিসর ত্যাগ করেন, তাহলে ভয়ের কিছু নেই।

জোকলিক উপসংহারে হেইদিকে বলেন, যদি তুমি তোমার বাবাকে ভালোবাস, তাহলে শনিবার ২ মার্চ বিকাল ৪টায় আমার সঙ্গে বাসেলের থ্রি কিংস হোটেলে দেখা কর। অস্থির হেইদি অবিলম্বে সাবেক নাজি অফিসার এইচ মানের সঙ্গে যোগাযোগ করে। মান আবার মিসরের অস্ত্র প্রকল্পে নিয়োজিত বিজ্ঞানীদের দায়িত্বে নিয়োজিত। মান পুলিশকে বিষয়টি জানালে তারা আবার তা সুইস কর্তৃপক্ষকে জানায়। জোকলিক এবং তার বন্ধু যখন থ্রি কিংস হোটেলে ঢোকেন তখন হোটেলের পেছনে পুলিশের বেশ কিছু গাড়ি মোতায়েন করা। লবিতে গোয়েন্দা মোতায়েন, হেইদিরা যে টেবিলে বসবে সেখানে টেপরেকর্ডার সেট করা– সব আয়োজনই সমাপ্ত।

জোকলিকের সঙ্গে ছিলেন মোসাদ গোয়েন্দা যোশেফ বেন গাল। তারা ফাঁদে পা দিলেন। তারা এসবের কিছুই সন্দেহ করেননি এবং হেইদির সঙ্গে ঘণ্টা খানেক কথা বলেন। সতর্ক থাকার কারণে তারা হেইদিকে কোনো ভয় দেখাননি বরং যদি তার বাবা মিসরে উল্লেখিত কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকেন, তাহলে কী ধরনের ক্ষতির আশংকা তার নজির দেখালেন। তারা হেইদিকে কায়রোর একটি বিমান টিকেট দিতে চাইলেন। তাদের বক্তব্য, হেইদি যেন মিসরে গিয়ে তার বাবাকে বুঝায় এবং জার্মানিতে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। জার্মানিতে তাদের পরিবারের কারো কোনো ভয় নেই।

মিটিংশেষে তারা দু'জনই জুরিখে চলে যান। সেখান থেকে তাদের পৃথক যাত্রা শুরু হয়। জোকলিক যখন আরেকটি ট্রেনের জন্য অপেক্ষমাণ তখনই সাদা পোশাকের পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। মোসাদ গোয়েন্দা বেন গালকে ইসরাইলি কনস্যুলেটের কাছে গ্রেফতার করা হয়। ঐ দিনই অপরাহ্নে জার্মান পুলিশ সুইস কর্তৃপক্ষকে ঐ দুই ব্যক্তিকে এক্সট্রাডিয়েট করতে বলে। হেইদিকে ভয় দেখানো এবং ড. ক্রেইনওয়াচারের ওপর হামলায় অংশ নেয়ার অভিযোগ আনা হয় তাদের বিরুদ্ধে।

ইউরোপের সদর দফতরে বসেই মোসাদ-প্রধান আইসার সুইস কর্তৃপক্ষকে বেনগাল এবং জোকলিককে ছেড়ে দিতে বলেন। কিন্তু জার্মানির এক্সট্রাডিশন অনুরোধের কারণে তা সম্ভব নয় বলে সুইস পুলিশ জানায়। আইসার অবশেষে ইসরাইল ফিরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী গোল্ডা মেয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শেষদিকে তারা দু'জনই মিসরকে নিয়ে জার্মানির আচরণে বিরক্ত ছিলেন।

গোল্ডা মেয়ার বলেন, ইসরাইল যদি জার্মান চ্যান্সেলরকে বলে তাহলে হয়তো পশ্চিম জার্মানি এক্সট্রাডিশনের অনুরোধ তুলে নিতে পারে।

মোসাদ-প্রধান দ্রুত টাইবেরিয়াসে চলে যান। সেখানে তখন ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেন গুরিয়ান অবকাশে ছিলেন। মোসাদ-প্রধান অবিলম্বে পশ্চিম জার্মানির রাজধানী বনে প্রতিনিধি পাঠাতে প্রধানমন্ত্রীকে বলেন। এই প্রতিনিধিদল পশ্চিম জার্মানির চ্যান্সেলরকে প্রমাণাদিসহ দেখাবে যে, মিসরে জার্মানির বিজ্ঞানী রকেট ইত্যাদি বানাতে লিপ্ত। এ এক ধ্বংসযজ্ঞের আয়োজন। একই সাথে জার্মানি যেন এক্সট্রাডিশনের অনুরোধ তুলে নেয়।

কিন্তু ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেন গুরিয়েন এতে অস্বীকৃতি জানান।
আইসার নাছোড়বান্দা। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, যদি গ্রেফতারের বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায় তাহলে পুরো ব্যাপারটিই নস্যাৎ হয়ে যাবে। আইসার

বলেন, বেন গালের গ্রেফতারের বিষয়টি জানাজানি হওয়ামাত্র জার্মান বিজ্ঞানীদের মিসরের কার্যকলাপ প্রকাশ্যে এসে যাবে। তখন ইসরাইল বলতে পারবে বেনগালের ভূমিকা ও কর্মকাণ্ড সংগতিপূর্ণ ছিল। আমরা এ কথাও বলতে পারব যে, মিসর রকেট বানানোসহ অন্যান্য প্রকল্পে জার্মানির বিজ্ঞানীদের কাজে লাগিয়েছে।

বেন গুরিয়েন কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন এবং অবশেষে বললেন 'সো বি ইট'।

প্রধানমন্ত্রী বেন গুরিয়েন ও মোসাদ-প্রধান আইসারের সম্পর্কে এই প্রথমবারের মতো চিড় ধরল।

১৯৬৩ সালের ১৫ মার্চ ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনাল জোকলিক ও বেনগালের গ্রেফতারের সংবাদটি ছাপল। মিসর সরকারের প্রকল্পে কর্মরত জার্মান বিজ্ঞানীর মেয়েকে ভয় দেখানোর কারণে এই গ্রেফতার।

মোসাদ-প্রধান আইসার দৈনিক পত্রিকার প্রধান সম্পাদকদের নিয়ে গোপন বৈঠক করলেন। সেখানে তিনি জোকলিকের ভূমিকার উল্লেখ করলেন। বললেন, জোকলিক মিসরের প্রজেক্টে কাজ করতেন কিন্তু এখন পক্ষ বদলেছেন। আর সেখানে একটি ধ্বংসযজ্ঞ বাধানোর কাজে জোকলিক লিপ্ত ছিলেন। এখন সেই ক্ষতি পোষাতে স্বেচ্ছায় তিনি ইসরাইলের পক্ষে কাজ করছেন।

এদিকে মোসাদ-প্রধানের সহযোগীরা ইসরাইলের সাংবাদিকদের ব্রিফ করতে লাগলেন। ইসরাইলের তিন সাংবাদিক বিস্তারিত রিপোর্ট করতে ইউরোপ যান। তারা ইউরোপ থেকে জার্মান বিজ্ঞানীদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট লিখে পাঠাতে থাকেন। মোসাদ গোয়েন্দাদের বিদেশে পাঠিয়ে ইসরাইলিপন্থী সাংবাদিকদের দিয়েও জার্মান বিজ্ঞানীদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানো হয়।

মোসাদ-প্রধান আইসার হারেল ঠিক বুঝতে পারছেন না, জার্মানইস্যু ইসরাইলে কেন এতেঠ স্পর্শকাতর ব্যাপার হয়ে উঠল। জার্মানির প্রতি তার লাগামহীন আক্রমণে ইসরাইলের মানুষ যেন ফুঁসে উঠেছে। ঘরে ঘরে জার্মানির বিজ্ঞানীদের ব্যাপারে নেতিবাচক প্রচারণা চলছিল।

এদিকে মার্চের ১৭ তারিখ থেকে ইসরাইল ও বিদেশিদের তুলোধোনা শুরু হল পত্র-পত্রিকায়। পত্রিকায় আরও বলা হল, পশ্চিম জার্মানির এসব বিজ্ঞানীরা সাবেক নাজি। তারা এমন মারণাস্ত্র নেই যা মিসরের হয়ে বানাচ্ছে না। এমনও বলা হল, ঐ বিজ্ঞানীরা ইসরাইলে প্লেগ ছড়িয়ে দেবে। এমন বিষাক্ত বিষ ছাড়বে যা ইসরাইলের বাতাসে নব্বই বছর ধরে বহমান থাকবে। পত্রিকাগুলো

এমন লেখাও লিখল যে, হিটলারের পন্থা অবলম্বন করেই জার্মানি নতুন করে ইহুদিনিধনে মেতেছে। জার্মান সরকারকেই এজন্য দায়ী করা হল।

বেনগাল ও জোকলিকের সাজা হল সামান্যই। তাদেরকে দু'মাস করে জেল দেয়া হল। হঠাৎ বিচারক লক্ষ করলেন, একটি লোক আদালতে বন্দুক নিয়ে ঢুকেছে। রেগে গিয়ে বিচারক বললেন, কোনো সাহসে আপনি বন্দুক নিয়ে আদালতে ঢুকেছেন?

বন্দুকধারী বললেন, চব্বিশ ঘণ্টা বন্দুক নিয়ে ঘোরার অনুমতি রয়েছে আমার। মিসরে জার্মান বিজ্ঞানীদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার। তিনি তার নাম বললেন, এইচ মান। মান হলেন সেই লোক; বিজ্ঞানীর মেয়ে হেইদি গোয়েরকে যাকে প্রথম ঘটনাটা জানিয়েছিল।

এই মানই জার্মান পুলিশকে সতর্ক করেছিলেন।
সাদা পোশাকের এক মোসাদ গোয়েন্দা আদালতকক্ষ থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে পুরো বিষয়টি তার সুপিরিয়ারদের জানাল। আরেক মোসাদ গোয়েন্দা দ্রুত চলে গেল ভিয়েনায়। দেখা গেল নাজিদের এক আততায়ী সিমনের সঙ্গে। সিমন মোসাদকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিল।

মোসাদ গোয়েন্দা সিমনের কাছে জার্মান নাগরিক মানকে চেনেন কিনা জানতে চাইল। সিমন কিছুক্ষণ পর আর্কাইভ থেকে এইচ মানের ফাইলটি নিয়ে এল। জানাল, মান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এসএস অফিসার ছিল। কর্নেল অট্টোর অধীনে সে একটা কমান্ডো বাহিনীতে কাজ করত। এক পর্যায়ে স্করজেনি'র নাম আসে। এই রচনার শুরুতেই স্করজেনি'র উল্লেখ রয়েছে। মোসাদের দু'জন গোয়েন্দা তার কাছেই গিয়েছিল। কেননা স্করজেনি'র পক্ষেই সম্ভব তার অধীনস্থ সাবেক কর্মী মান সম্পর্কে তথ্য প্রদানের। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা স্করজেনি'র স্ত্রীকে প্রথম খুঁজে বের করা হল। মহিলা প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দিয়ে সহযোগিতা করলেন মোসাদ গোয়েন্দাদের।

মোসাদ স্করজেনিকে তাদের গোয়েন্দা হতে বলল। স্করজেনি মোসাদের লোকদের বললেন, আমি তোমাদের কী করে বিশ্বাস করব? কেননা তোমরা যুদ্ধাপরাধের দায়ে আইচম্যানকে ফাঁসি দিয়েছ। এরপর তোমরা যে আমাকে ফাঁসি দেবে না তার নিশ্চয়তা কী।

মোসাদ গোয়েন্দা বললেন, আপনার ভয়ের কোনো কারণ ঘটবে না সে গ্যারান্টি আমরা আপনাকে দিচ্ছি। মোসাদ গোয়েন্দা এক পাতা কাগজ নিয়ে

ইসরাইল রাষ্ট্রের পক্ষে তাকে সফল অপকর্ম থেকে অব্যাহতিপত্র দিলেন এবং তার প্রতি কোনো সহিংস আচরণ করা হবে না বলেও লিখিত প্রতিশ্রুতি দিলেন। স্করজেনি অবশেষে ইসরাইলের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করতে সম্মত হলেন। যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তার হাতে খুন হয়েছে অসংখ্য ইহুদি।

কয়েক মাসের মধ্যে স্করজেনি এইচ মানের সহযোগিতায় মিসরে দায়িত্বরত জার্মান বিজ্ঞানীদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচরণ এবং মিসরের মারণাস্ত্র প্রকল্পের অগ্রগতির সর্বশেষ খবর মোসাদের হাতে পৌঁছে দিলেন।

এদিকে ইসরাইলে জার্মানবিরোধী প্রচারণা আরও তুঙ্গে উঠল। প্রবন্ধ, প্রতিবেদন কার্টুনের মাধ্যমে বলা হচ্ছিল যে, ১৯৩৩ সালের জার্মানি ১৯৬৩ সালেও বদলায়নি। তখন তারা ৬০ লক্ষ ইহুদিনিধন করেছে। এখন মিসরের মাধ্যমে নতুন করে ইহুদি নিধনে জার্মানরা মত্ত। ইসরাইলের সংসদে মেনাহেম বেগিন কঠোর ভাষায় প্রধানমন্ত্রী বেন গুরিয়েনের সমালোচনা করলেন। গোল্ডা মেয়ারের সঙ্গে মোসাদ-প্রধানের মিত্রতা ছিল। তিনিও সংসদে তারস্বরে বললেন, মিসর যে অস্ত্র বানাচ্ছে তাতে ইসরাইলের নাগরিকসহ সব প্রাণীই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

কিন্তু ইসরাইলের আরেকটি প্রভাবশালী গোয়েন্দা সংস্থা আমান মোসাদের ভয়াবহ বিবরণের বিরোধিতা করল। তারা এ-ও বলল, মিসরে যেসব জার্মান বিজ্ঞানী মারণাস্ত্র বানাচ্ছে তারা মাঝারি মানের। ইসরাইলের সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান জেনারেল মেই'র অভিমতও অনুরূপ।

প্রধানমন্ত্রী বেন গুরিয়েনের হাতে আমানের রিপোর্টটি পৌঁছলে তিনি মোসাদ-প্রধান আইসার হারেলকে ডেকে পাঠান। তিনি হারেলের কাছে তার সংবাদের উৎস জানতে চান এবং প্রতিটি বিষয়ের ব্যাখ্যা চান। মোসাদ-প্রধান ইউরোপে ইসরাইলি সাংবাদিক প্রেরণের কথা স্বীকার করেন এবং মিসরের বিষাক্ত গ্যাস কিম্বা নিকেলের তৈরি বোমা বানানোর ব্যাপারে তার কাছে তথ্য নেই বলে জানান। পরের দিন আমান-প্রধান প্রধানমন্ত্রীকে আরও বলেন, মিসরের কর্মকাণ্ড বিপজ্জনক বটে কিন্তু ইসরাইলি শাসকদের যেভাবে আতঙ্কিত করা হচ্ছে সে রকম কিছু নয়।

প্রধানমন্ত্রী বেন গুরিয়েন মোসাদ-প্রধান আইসারকে আবার ডেকে পাঠান। এই সময় প্রধানমন্ত্রী ও মোসাদ-প্রধানের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য-বিনিময় হয়। প্রধানমন্ত্রী জার্মানির সঙ্গে ইসরাইলের সম্পর্ক খারাপ হওয়ার প্রসঙ্গ তোলেন। আইসার এক পর্যায়ে নিজের অফিসে চলে আসেন। নিজের পদত্যাগপত্র লিখে পাঠিয়ে দেন।

বেন গুরিয়েন তার সংস্থা থেকে বের হয়ে না যাওয়ার জন্য আইসারের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন। কিন্তু আইসার ছিলেন অ্যাডামেন্ট।
শেষ হয়ে গেল একটি অধ্যায়ের।

প্রধানমন্ত্রী বেন গুরিয়েন নতুন কাউকে মোসাদ-প্রধান না করা পর্যন্ত তাকে ঐ পদে থাকতে বললেও আইসার তাতে রাজি হননি। আইসার একজনকে বলেন, বেন গুরিয়েন যেন কাউকে পাঠিয়ে তার কাছ থেকে চাবির গোছা নিয়ে নেন।

বেন গুরিয়েন তার সেক্রেটারিকে আমোসের সঙ্গে দেখা করতে বলেন। কেননা মোসাদ-প্রধানের পদ তো খালি রাখা যায় না।
কিন্তু সাবাক-প্রধান আমোস তখন বিদেশে, স্বজনদের সঙ্গে কাটাচ্ছেন।
বেন গুরিয়েন অতঃপর জেনারেল মেইর অমিতকে ডেকে পাঠালেন। তিনি ছিলেন এক অভিযানে। রেডিওবার্তার মাধ্যমে তাকে অবিলম্বে তেলআবিবে আসতে বলা হল। ফিরে এসে তিনি শুনলেন, তাকে মোসাদের উপ-প্রধান করা হয়েছে। কয়েক সপ্তাহ পরে মেইর অমিতকে মোসাদের প্রধান করা হয়।

জার্মানিতে লেখা পেরেজের চিঠির ফলশ্রুতিতে জার্মান সরকার আরেক বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর মাধ্যমে মিসরে কর্মরতদের দেশে ফিরিয়ে আনলেন। তাদের জার্মানির বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ দেয়া হল। কয়েকজন নিজের থেকেই মিসর ত্যাগ করলেন। তারা মিসাইল বানানো শেষ না করেই চলে এসেছিলেন।

ড. ওয়েনহারকে নাসা'র ব্লু আইড বয় বলা হয়। জার্মানির বিজ্ঞানীদের তালিকা দেখে তিনি এক লেখককে বলেন যে. উক্ত দ্বিতীয় শ্রেণির বিজ্ঞানীদের পক্ষে কার্যকর মিসাইল বানানো অসম্ভব।

জার্মান বিজ্ঞানীদের কারণেই আইসার হারেলের পতন হল। এদিকে মেইর অমিত যতদিন মোসাদ-প্রধান ছিলেন ততদিন তাকে আইসার হারেলের কটু ও বিদ্বেষপূর্ণ কথা শুনতে হয়েছে।

জার্মান বিজ্ঞানীদের নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়ায় প্রধানমন্ত্রী বেন গুরিয়েনের রাজনৈতিক কারিশমা নিয়ে প্রশ্ন উঠে। কয়েক মাসের মধ্যে বেন গুরিয়েন প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করেন।

যারা কখনো ভুলবে না

১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বরে চল্লিশের কাছাকাছি বয়সী বলিষ্ঠ ও সানগ্লাস পরা এক লোক প্যারিস থেকে হল্যান্ডে এসে নামল। অ্যান্টন কুঞ্জলে নামে একটি নামি হোটেলে সে উঠল। পরিচয় দিল অস্ট্রিয় ব্যবসায়ী। ডাকঘরে সে অ্যান্টন কুঞ্জলে নামেই একটা পোস্টবক্স ভাড়া করল। তিন হাজার ডলার জমা দিয়ে ব্যাংকে একটা একাউন্ট খুলল। একই নামে সেই বিজনেস কার্ড বানাল। সেখানে তার পরিচয় একটি লগ্নিকারক প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার। সেখান থেকে সে গেল ব্রাজিলের কনস্যুলেটে এবং ব্রাজিলে টুরিস্ট হিসেবে যাওয়ার জন্য একটা ফর্ম ফিলাপ করল। ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে ভাসাভাসাভাবে সে চেকআপ করাল এবং মেডিকেল সার্টিফিকেট নিল। অতঃপর চোখের ডাক্তার দেখিয়ে মোটা ম্যাগনিফায়িং গ্লাসের অর্ডার দিল। চোখের ডাক্তারের কাছে সে মিথ্যা বলেছে এবং ম্যাগনিফায়িং গ্লাসের তার দরকারও নেই।

পরের দিন সে জুরিখে গিয়ে ৬ হাজার ডলার জমা দিয়ে ক্রেডিট সুইস ব্যাংকে একাউন্ট খুলল। সেখান থেকে প্যারিসে ফিরে এক মেকাপম্যানকে দিয়ে ঝোপঝাপের মতো গোঁফ লাগিয়ে মোটা চশমা পরে পাসপোর্টের জন্য কতগুলো ছবি তুলল। রডেরড্যামে ফিরে ব্রাজিলের কনস্যুলেটে গিয়ে ব্রাজিলের টুরিস্ট ভিসার সিল সে তার অস্ট্রিয়ান পাসপোর্টে লাগাল। এখন সে রিওডি জেনেরিওতে যাওয়ার জন্য প্লেনের টিকেট কিনতে পারবে। সে সাওপাওলো এবং উরুগুয়ের মন্টেভিডিওতেও যাবে। সে যেখানেই যাবে, ভাষা তার জন্য কোনো সমস্যা নয়। বাকপটুও সে। সর্বত্রই সে তার রমরমা ব্যবসার কথা বলবে। বড় ব্যবসায়ীর ভড়ং ধরতে হয় বিধায় সে সব সময়ই ভালো হোটেল ও ক্যাফেতে গিয়ে থাকে। আর এভাবেই মোসাদ গোয়েন্দা আইজাক সারিদ (প্রকৃত নাম নয়) তার নিজের জন্য একটা ফুলপ্রুফ আদল তৈরি করে নিয়েছে।

মাত্র কয়েকদিন আগে প্যারিসের এক বৈঠকে সারিদকে উপস্থিত থাকতে হয়। মোসাদের কায়েসারা নামের একটি অভিযান পরিচালনাকারী ইউনিটের সে সদস্য। সেখানে বস ইয়ারিব তাকে বিফিং দেয়। ইয়ারিব তাকে বলে, পশ্চিম জর্ডান সরকার পার্লামেন্টে একটা যুদ্ধাপরাধী আইন করতে যাচ্ছে। সেই আইনে যেসব যুদ্ধাপরাধী নাজি আত্মগোপনে রয়েছে তাদেরকে জনসম্মুখে আসার সুযোগ দেয়া হবে। তবে তারা নতুন করে আর অপরাধকর্মে জড়াবে না মর্মে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। ইয়ারিব জানায়, জার্মানি চাইছে অতীত খুঁড়ে আর লাভ নেই। এদিকে ইসরাইল দীর্ঘদিন পালিয়ে থাকা নাজি যুদ্ধাপরাধী আইচম্যানকে

ধরে ফাঁসি দেয়ার পর যুদ্ধাপরাধীদের ধরার অভিযান অনেকখানি স্তিমিত হয়ে পড়ে। এদিকে ইসরাইলের মনোভাব হল, নাজি যুদ্ধাপাধীদের বিচার চলতে থাকাই বাঞ্ছনীয়। কেননা বিশ্ববাসী দেখুক, অপরাধীদের নিস্তার নেই।

ইয়ারিব এ পর্যায়ে মোসাদ গোয়েন্দা সারিদকে দায়িত্ব দেয় 'রিগার কসাই' নামে খ্যাত লাটভিয়ার এক নাজিকে ধরার জন্য। তার নির্দেশে ত্রিশ হাজার ইহুদি নিধন হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। তাকে সঠিকভাবে চিহ্নিতও করা হয়েছে। সে ব্রাজিলে তার প্রকৃত নাম হারবার্ট কুকুরস নামেই পরিচিত। মোসাদ-প্রধান মেইর অমিত কুকুরসকে পাকড়াও করতে সবুজ সংকেত দিলেন।

ইয়ারিব জানেন, গোয়েন্দা হিসেবে সারিদের দক্ষতার কথা। আইচম্যানকে ধরার অভিযানে সারিদ ছিল। জার্মানিতে জন্ম সারিদের বাবা-মা দু'জনই হলোকাস্টে নিহত। ইয়াবিরের পরামর্শ, সারিদকে বলা হল, তুমি প্রথমে টার্গেটে হারবার্ট কুকুরসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করবে। তারপর অভিযান। আর তোমার নতুন নাম অ্যান্টন কুঞ্জলে।

বিদেশে এককভাবে অভিযান পরিচালনা সারিদের এই প্রথম। ফলে তার টেনশনও ছিল। এদিকে কুকুরস সব সময়ই জানত, একদিন তাকে ধরা পড়তেই হবে। কেননা ত্রিশ হাজার ইহুদিকে হত্যার সঙ্গে সে জড়িত। কুঞ্জলেও ভালো করে জানত সামান্য একটু ভুলে পুরো অভিযানটি ব্যর্থ হতে পারে।

ত্রিশের দশকে কুকুরস ছিল একজন নামি বিমানচালক। ছোট্ট একটি বিমান সে নিজে নিজে বানিয়েছে। এক পর্যায়ে এই তরুণ লাটভিয়ার জাতীয় নায়কে পরিণত হয়েছিল। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বহু পুরস্কারও সে পেয়েছে। তাকে লাটভিয়ার ঈগল উপাধি দেয়া হয়েছিল।

রিগা'র যুদ্ধ-যাদুঘরে কুকুরসের একটি বিমান রাখা হয়েছে এবং সেটি বহু লোক দেখতে আসে।
লাটভিয়ার দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদী কুকুরসের বহু বন্ধু ইহুদি। সে ফিলিস্তিন সফর করেছে এবং ইহুদিদের নানা ক্ষেত্রে উন্নতি দেখে অভিভূত। ফিলিস্তিনে তার উদ্দীপনামূলক ভাষণ শুনে অনেকেই তাকে লাটভিয়ার ইহুদিদের মিত্র বলে মনে করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে রাশিয়া প্রথম লাটভিয়া দখল করে। তখন কুকুরস তাদের গুণগান করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু জার্মানি যখন লাটভিয়া দখল করে তখন কুকুরস জার্মানির গুণগানে মত্ত হয়ে পড়ে। ধর্মান্ধ ফ্যাসিস্ট সংস্থা

থান্ডার ক্রসের সদস্য এবং জাতীয়তাবাদী হিসেবে কুকুরস নাজিদের সাহায্যে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এগিয়ে আসে। পরিণতিতে সবচে নিষ্ঠুর ও স্যাডিস্টিক হত্যাকারীতে সে রূপান্তরিত হয়। এভাবে সে রিগা'র কসাই নামে পরিচিতি পায়। কুকুরস ও তার সৈন্যরা প্রথম যে অপকর্মটি করে তাহল ইহুদিদের একটি ধর্মস্থানে এক সঙ্গে বসবাসরত তিনজন ইহুদিকে পুড়িকে মারা। সে ইহুদিদের গ্রেফতার করে রাইফেলের বাট দিয়ে হত্যা করত। এরপর সে শতাধিক ইহুদিকে গুলি করে হত্যা করে। গোঁড়া ইহুদিরা তার অবমাননা ও হত্যার শিকার হয়। বহু ইহুদি শিশুর মাথা দেয়ালে থেঁতলে সে মেরে ফেলে। এক রাতে ইহুদি বন্দিদের সামনে এক ইহুদি কিশোরীকে সে উলঙ্গ করে। তারপর ইহুদিদের এক বৃদ্ধ পুরোহিতকে বাধ্য করে মেয়েটির শরীর লেহন করতে। এই সময় মদ্যপ লাটভিয়ার সেনারা হাসিতে ফেটে পড়ছিল। গ্রীষ্মকালে কুলদিগা লেকে একসঙ্গে বার শত ইহুদিকে সে ডুবিয়ে মারে। ১৯৪১ সালের নভেম্বরে রিগাতে ত্রিশ হাজার ইহুদিকে হত্যা করা হয় কুকুরসের নির্দেশে। রুমবুলা ফরেস্টে প্রথমে তাদের নগ্ন করা হয় এবং জার্মান সৈন্যরা ঠাণ্ডা মাথায় তাদের হত্যা করে।

সারিদ কুকুরসের ফাইল ঘেঁটে আরও দেখতে পায় কিছু লোক অবশ্য তার হাত থেকে অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছিল। যাহোক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে কুকুরস ভুয়া দলিলপত্র নিয়ে তার প্লেন নিয়ে ফ্রান্সে চলে যায়। কৃষক সেজে একটি নৌকায় করে সে রিওডি জেনোরিওতে চলে যায়। সঙ্গে নিয়ে যায় মিরিয়াম কেইটজার নামের এক ইহুদি নারীর একটি রহস্যজনক ইন্সুরেন্স পলিসি। এই মেয়েটিকে অবশ্যই যুদ্ধের সময় সে বাঁচিয়েছিল। সেই মেয়েটি ব্রাজিলে কুকুরসের গুণগানে ব্যস্ত। মেয়েটিকে সে রিগায় বাঁচিয়েছিল।

রিওতে কুকুরস ব্রাজিলের বহু ইহুদির সঙ্গে উষ্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলে। সর্বত্রই সে মিরিয়ামের গল্পটি বলে থাকে। গল্পটি এরকম: নাজি মিরিয়ামকে লাটভিয়ায় আটক করে। তাকে নিষ্ঠুর প্রক্রিয়ায় মেরে ফেলা হত। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মেয়েটিকে সে বাঁচিয়েছে ইত্যাদি। একটি ইহুদি মেয়েকে বাঁচানোর জন্য শহরের সকলে লাটভিয়ার এই নায়ককে প্রভূত শ্রদ্ধা করত। ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে সে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও একদিন মদের ঘোরে সে বেফাঁস করে তার অতীত। ইহুদিদের ইউরোপে ব্যাপকভাবে হত্যার কথাও সে স্বীকার করে। কত ইহুদিকে সে পিটিয়ে মেরেছে, পুড়িয়ে মেরেছে, ডুবিয়ে মেরেছে– সবই সে ফাঁস করল। লাটভিয়ার তার ইহুদি বন্ধুরা এতে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তারা তদন্ত শুরু করল। এর ফলাফল এককথায় লোমহর্ষক।

কুকুরসের প্রকৃত পরিচয় জানাজানি হলে সে গায়েব হয়ে গেল। যদিও সে রিও ছাড়ল না। পাশের একটি শহরে গেল মাত্র। সে যে মিরিয়ামের গল্প বলত এখন তা বন্ধ করে দিয়েছে। মিরিয়াম স্থানীয় এক ইহুদিকে বিয়ে করে ব্রাজিলের সমাজের সাথে মিশে গেল। এদিকে কুকুরস তার স্ত্রী ও তিন ছেলেকে নিয়ে আসল।

এভাবে দশ বছর অতিবাহিত হল। একটি এয়ার ট্যাক্সি কোম্পানির শ্রদ্ধাভাজন মালিক হল সে। আবার তাকে রিও শহরে ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা গেলে এলাকাবাসী তার বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করল। ছাত্ররা কুকুরসের এয়ার ট্যাক্সি অফিসের দরজা-জানালা ভাঙ্গল। কুকুরস রিও ছেড়ে সাওপাওলোতে স্থায়ী হল।

সাও পাওলোতে কুকুরসের ব্যাপারে কারো কোনো মাথাব্যথা নেই। কিন্তু সব সময়ই ভয়ে ভয়ে থাকত। নতুন কাউকে দেখলেই অজানা আশংকায় সে ভীত হয়ে পড়ত। ১৯৬০ সালে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে আইচম্যানের ফাঁসি হলে সে সাওপাওলো পুলিশের কাছে গিয়ে নিরাপত্তা চাইল। পুলিশ তার জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলেও সে নিউজটি মিডিয়ায় প্রকাশিত হল। কুকুরসের দ্বারা যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তাদের জানতে বাকি রইল না সে কোথায় আছে।

বছর যত যায়, কুকুরসের ভয় তত বাড়ে। সে তার স্ত্রী ও ছেলেদের বলে যে, ক্ষতিগ্রস্ত ইহুদিরা ঠিকই একদিন তাকে খুঁজে বের করবে এবং তাকে হত্যা করবে। তাকে যারা হত্যা করতে পারে তারও একটা তালিকা সে করল। এই তালিকায় যাদের নাম ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম সিনেটর আহারোন স্টেইনব্রাক, ড. আলফ্রেড গাটেনবার্গ প্রমুখ।

কুকুরস তার প্রকৃত নাম না বদলালেও বাড়িটি বানাল দুর্গের মতো করে। সব দিক থেকেই বাড়িটি ছিল সুরক্ষিত। বেশ কয়েকটি ব্যবসা শুরু করলেও সেগুলো জমেনি। কুঞ্জলে তার সম্পর্কে সর্বশেষ যেসব তথ্য নথিভুক্ত করেছে তার মধ্যে রয়েছে– তার সর্বশেষ ঠিকানা হল সাও পাওলের বাইরে একটি কৃত্রিম লেক মেরিনায়। সে কয়েকটি বোট ভাড়া দিত। তাছাড়া তার যে সি প্লেনটি ছিল তাতে সে পর্যটকদের উঠিয়ে শহর ঘুরে দেখাত।

কুঞ্জলে ভালো করেই জানত, যদি সে সরাসরি কুকুরসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাহলে তার ফলাফল ভালো না-ও হতে পারে। সে কয়েকদিন রিও শহরে কাটাল। কুঞ্জলে এই শহরে পর্যটনের বিকাশ ঘটাতে চায় বলে নিজেই কয়েকজন লগ্নিকারকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। ঘুরে-ফিরে সে কম দেখল না। দেখল সাম্বা নৃত্যও। সাও পাওলো'র পর্যটন ব্যবসা যারা ম্যাটার করে তাদের

সঙ্গে রিকোমেন্ডেশন চিঠিসহ সে সাক্ষাৎ করল।

সাওপাওলোতে ঢুকেই সে কুকুরসের ম্যারিনা প্রথমে খুঁজে বের করল। জেটির সাথে বাঁধা আনন্দবিহারের বোটগুলোর সাথেই ছিল তার পুরানো সি প্লেনটি। সেখানেই কৃশকায় হারবার্টস কুকুরসকে সে দেখতে পেল। গায়ে পাইলটের পোশাক।

বোটের টিকেট বিক্রি করছিল একটি জার্মান মেয়ে। কুঞ্জলে মেয়েটিকে স্থানীয় পর্যটন শিল্প সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে তার অপরাগতা প্রকাশ করে। তবে পাশে দাঁড়ানো একটি লোককে দেখিয়ে দেয়। সেই লোকটিই কুকুরস। আর মেয়েটি তার বড় ছেলের স্ত্রী।

কুঞ্জলে কুকুরসের কাছে নিজেকে একজন অস্ট্রিয়ান লগ্নিকারক হিসেবে পরিচয় দিয়ে পেশাগত কিছু প্রশ্ন করলে সে তেমন আগ্রহ দেখায় না। কিন্তু প্লেনে চড়ে শহর ঘুরে দেখার কথা বললে সে নড়ে-চড়ে বসে। কুঞ্জলে জানে কী করে মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হয়। প্লেনে করে আকাশ চক্কর দেয়ার সময় তারা দু'জন বন্ধুতে পরিণত হয়। ফেরার সময় কুকুরস কুঞ্জলেকে বোটে নিয়ে যায় এবং ব্রান্ডি খাওয়ায়।

ব্রান্ডি খাওয়ার সময় কুকুরস হঠাৎ করেই উত্তেজিত হয়ে বলে, আমাকে যুদ্ধাপরাধী বলা হচ্ছে। অথচ আমি যুদ্ধের সময় ইহুদি বালিকাকে রক্ষা করেছি।

কুকুরসের প্রশ্নের জবাবে কুঞ্জলে জানায় সে-ও রাশিয়ান ফ্রন্টে যুদ্ধ করেছে। কুঞ্জলে তার শার্টের বোতাম খুলে কুকুরসকে যুদ্ধকালীন একটা ক্ষতচিহ্নও দেখায়।

কুঞ্জলে কুকুরসের বর্তমান অবস্থা পরিমাপের চেষ্টা করে। সে বুঝে নেয় কুকুরসের আর্থিক অবস্থা এখন ভালো নয়। তার বোট ও প্লেন দুটোই জরাজীর্ণ। কুঞ্জলে তাকে এমন ধারণা দেয় যে, তার সঙ্গে থাকা মানে অবস্থাটা ফিরল বলে। অতঃপর কুঞ্জলে তার কোম্পানি ও পর্যটন নিয়ে আলোচনা করে এবং ল্যাটিন আমেরিকায় প্রচুর লগ্নি করার কথা বলে। কুকুরসকে তার কোম্পানিতে যোগদানেরও আভাস দেয়। কুকুরস তার মেহমানের ব্যাপারে আগ্রহান্বিত হওয়ামাত্র কুঞ্জলে তাড়াতাড়ি সটকে পড়ে। লোভে পড়ে কুকুরস কুঞ্জলেকে তার বাসায় দাওয়াত দেয় এবং সেখানে ব্যবসা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে বলে জানায়।

ঐ দিন রাতেই কুঞ্জলে ইয়াবিরকে সাংকেতিক ভাষায় একটি টেলিগ্রাম পাঠায়। ইয়াবির কুকুরসের অভিযানের নাম দিয়েছিল 'দ্যা ডিসিসড'।

কুকুরসও এদিন ডাইরি লেখে। সেখানে সে তার চরম শত্রুদের নামের তালিকায় আরেকটি নাম যুক্ত করে। নামটি হল অ্যান্টন কুঞ্জলে।

এক সপ্তাহ পরে কুকুরসের দুর্গ আকারের সুরক্ষিত বাড়িতে যায় কুঞ্জলে। বাড়িটি চারদিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা এবং বিদ্যুতের তার লাগানো। সুরক্ষিত বাড়ির গেটে এক তরুণ এবং একটি হিংস্র কুকর রয়েছে। তরুণটি তার ছেলে।

কুকুরস কুঞ্জলেকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায় এবং বাড়িটি ঘুরে দেখায়, স্ত্রী মিল্ডার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। যুদ্ধের সময় পাওয়া পনেরটি পদক দেখায় যার উপর নাজিদের স্বস্তিকা প্রতীক ছিল। কুকুরস আরেকটি ড্রয়ার খুলে কুঞ্জলেকে তার ব্যক্তিগত অস্ত্রগুলো দেখায়। এর মধ্যে রয়েছে তিনটি হেভি রিভলবার ও একটি সেমি অটোমেটিক রাইফেল। কুকুরস গর্ব করে বলে, ব্রাজিলের গোয়েন্দা বাহিনী এসব অস্ত্র ব্যবহারে তাকে অনুমতি দিয়েছে। সে বেশ গর্বের সঙ্গে আরও বলে, কিভাবে নিজেকে রক্ষা করতে হয় তা তার জানা। কুঞ্জলের বুঝতে বাকি থাকে না, এসব তাকে ভয় দেখানোর ইংগিত। সে বোঝাতে চায়, আমি একজন সশস্ত্র মানুষ এবং ভয়ংকর।

হঠাৎ করেই কুকুরস কুঞ্জলেকে তার তিনটি খামার দেখতে এবং সেখানে একটি রাত কাটানোর আমন্ত্রণ জানায়।

কুঞ্জলে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যায়। কিন্তু হোটেলে ফেরার পথে সে একটা স্বয়ংক্রিয় চাকু– যার ফলা সুইচ টিপলেই বেরিয়ে যায় তা কিনতে ভোলেনি। কয়েকদিনের মাথায় তারা দু'জন কুঞ্জলের ভাড়া করা গাড়িতে পাহাড়ের দিকে বেড়াতে যায়।

কুঞ্জলের জন্য এই ভ্রমণটা ছিল টেনশন ও অস্বস্তির। কুকুরসের কাছে রয়েছে অস্ত্র আর তার কাছে রয়েছে স্বয়ংক্রিয় একটা চাকু। কুঞ্জলে অবশ্য কুকুরসকে ইজি মানির লোভ দেখিয়ে তাকে হত্যার দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল। এদিকে তার গাড়িতে পাশে বসা কুকুরস বলিষ্ঠ কিন্তু দরিদ্র। আবার সহযাত্রীকে তার ব্যাপক সন্দেহ। সাথে ব্যাগভর্তি অস্ত্র।

কুঞ্জলের মনে হল বিড়াল-ইঁদুরের এই খেলায় সে ভিকটিম হবে। পর্যটনশিল্প নিয়ে যে গল্প করছে কুকুরস তা বিশ্বাস করেনি। তাকে বরং পাহাড়ের দিকে নিয়ে মেরে ফেলবে।

ওরা একটা অবহেলিত খামারে ঢুকল। এখানে কুকুরস হঠাৎ করেই রিভলবার ও সেমি অটোমেটিক রাইফেলটি বের করল। কুঞ্জলে ভাবল, দুটি অস্ত্র সে এক সঙ্গে বের করছে কেন।

আসলে কুকুরস গুলিচালনার একটা প্রতিযোগিতা শুরু করল। কুঞ্জলে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লড়েছে তার একটা পরীক্ষা। সে গাছে একটা কাগজ ঝুলিয়ে রাইফেল বের করে পরপর দশটা গুলি করল। ব্যাগ থেকে কাগজ বের করে এবার কুঞ্জলেকে রাইফেল দিল। ব্রিটিশ ও ইসরাইলি আর্মির চৌকষ অফিসার কুঞ্জলে রাইফেল উঁচিয়ে পরপর দশটা গুলি করে কুকুরসের চেয়েও ভালো ফল দেখাল। কুকুরস ভূয়সী প্রশংসা করল কুঞ্জলের।

ওরা দ্বিতীয় দিন বিশালাকায় আরেকটি খামারে গেল। এখানে রয়েছে গভীর অরণ্য ও নদী। কুমিরগুলো এখানে অলস সময় কাটায়। কুকুরস যত এগিয়ে যাচ্ছে কুঞ্জলে ভাবছে সে একটা ফাঁদে পড়ছে। কোনো প্রমাণ না রেখেই কুকুরস এখানে তাকে নিশ্চয়ই গুলি করে মেরে ফেলবে।

হাঁটতে গিয়ে কুঞ্জলের পায়ের একটি নখ থেঁতলে গেলে সে তার জুতা খুলে ফেলে। বেশ রক্ত বেরুচ্ছিল। কুঞ্জলে এক পর্যায়ে ভাবল, এই হল তার অন্তিম সময়। লাটভিয়ার কুকুরস তাকে কুকুরের মতো মেরে ফেলবে। যদিও কুকুরসও কুঞ্জলেকে একবার তার বন্দুক দিয়েছিল। কিন্তু জায়গাটা এমন— মাইলখানেকের মধ্যে কোনো লোকের অস্তিত্ব নেই। এদিকে কুঞ্জলের হাতের রাইফেলে গুলি ভরা। সে এই মুহূর্তে কুকুরসকে শেষ করে দিতে পারে। কিন্তু তার পরিবর্তে কুঞ্জলে তার ক্ষতবিক্ষত নখটি ভালো করে ব্যান্ডেজ করল এবং রাইফেলটি তার মালিককে ফেরত দিল।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে তারা দু'জন একটি অস্থায়ী হাটে উপস্থিত হল এবং সঙ্গে থাকা খাবার খেল। পুরনো দুটি লোহার খাটে তারা স্লিপিংব্যাগ পাতল। কুঞ্জলে দেখল, কুকুরস তার বালিশের নিচে অস্ত্রগুলো রেখে ঘুমাল। অমঙ্গলের আশংকায় কুঞ্জলে তার সঙ্গে থাকা চাকুটা পকেট থেকে বের করে প্রস্তুত করে রাখল। কিন্তু ঘুম আর তার আসল না।

মধ্যরাতে কুঞ্জলে কুকুরসের বিছানার দিকে একটা শব্দ শুনল। নাজি নেতা বন্দুকসহ নিচে নামল। কেন নামল? কুঞ্জলে বোঝার চেষ্টা করল বাইরের শব্দের। সে বুঝতে পারল কুকুরসই প্রসাব করছে। অবশ্য বাইরে চুপিসারে ঘুরে বেড়ানো জন্তুর শব্দও কুঞ্জলে শুনতে পেয়েছিল। পরের দিন তারা নিরাপদে সাওপাওলো ফিরল। কুঞ্জলে হোটেলে ওঠার পর কিছুটা স্বস্তি বোধ করল।

কুঞ্জলে অতঃপর কুকুরসকে নামি-দামি হোটেলে দাওয়াত দিয়ে খাওয়াতে শুরু করল। দামি নাইটক্লাব, বার, সব কিছুই তার জন্য উন্মুক্ত। কুঞ্জলে অনুভব করল, গরিব হয়ে পড়ার কারণে কুকুরস কতদিন এরকম ভালো ভালো খাবার খায়নি। কুঞ্জলে অভ্যন্তরীণ রুটে কুকুরসকে নিয়ে বেশ কয়েক জায়গায় ঘুরল। তারা কয়েকটি সেরা পর্যটনস্পটে গেল। কুকুরস কুঞ্জলের টাকায় কয়েকদিন ভালো হোটেলে থাকল এবং উপাদেয় সব খাবার খেল।

কুঞ্জলে এবার তাকে নিয়ে উরুগুয়ের রাজধানী মন্টেভিডিও যেতে চাইল। সে বলল, তার পার্টনাররা সেখানে বিশাল পর্যটন এলাকা গড়তে চায়। কুঞ্জলের টাকায় কুকুরসের পাসপোর্ট তৈরি হল। কুঞ্জলে মন্টেভিডিও যাওয়ার কয়েকদিন পর কুকুরস সেখানে গেল। যদিও এই লাটভিয়াবাসীর সন্দেহ ও ভয় কাটেনি। মন্টেভিডিও বিমানবন্দরে কুকুরস কুঞ্জলের বেশ কয়েকটি ছবি তুলে ফেলল। কুঞ্জলের সঙ্গে যারা ছিল প্রত্যেকেই সে তার হত্যাকারী বলে সন্দেহ করল।

কুঞ্জলে বেশ বড় গাড়ি ভাড়া করল এবং ওখানকার সবচে দামি হোটেলে রুম ভাড়া করল। কোম্পানির সদর দফতর এখানে বানানোর জন্য তারা কয়েকটি অফিসও দেখাল। কুকুরসকে এখানেও জবরদস্ত খাওয়া, ক্যাসিনো, সাইট সিয়িং করানো হল। অর্থাৎ বন্ধুর মন জয়ের জন্য সবই করল কুঞ্জলে। ওদিকে কুকুরস খুব খুশি। অবশেষে কুঞ্জলে তার বন্ধুকে ছেড়ে কয়েক মাসের জন্য ইউরোপের পথে পাড়ি জমাল। কুকুরস সাওপাওলেতে ফিরে গিয়ে তার স্ত্রীকে বলল, কিছু লোক তাকে ফলো করেছে মন্টেভিডিওতে। ফলে তাকে আরও সাবধানে চলাফেরা করতে হবে।

প্যারিসে কুঞ্জলে আবার ইয়ারিব ও তার সহকর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তারা অবিলম্বে কুকুরসকে পাকড়াও করার সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্ত হয় কুকুরসকে মন্টেভিডিওতে হত্যা করা হবে। ব্রাজিলে নয়। কেননা ব্রাজিলে সেখানকার পুলিশ তাকে নিরাপত্তা দেয়। ফলে সেখানে সমস্যা হতে পারে। দ্বিতীয়ত ব্রাজিলের ইহুদিরা নব্য নাজি কিম্বা যেসব জার্মানি প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মরিয়া তাদের কোপানলে পড়তে পারে। তৃতীয়ত ব্রাজিলে মৃত্যুদণ্ড বিদ্যমান। মোসাদ গোয়েন্দাদের কেউ যদি গ্রেফতার হয় এবং তার বিচার হয় তাহলে নিশ্চিত ফাঁসি।

আততায়ীদের টিমে দলনেতা ইয়ারিবসহ পাঁচজন মোসাদ গোয়েন্দা অন্তর্ভুক্ত হয়। এদের মধ্যে একজন মোসাদ-প্রধান মেইর অমিতের চাচাতো ভাই; নাম জিভ অমিত। আর কুঞ্জলেসহ আরও দু'জন।

১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে টিমটি মন্টিভিডিওতে এসে উপস্থিত হয়। গোয়েন্দা অসওয়াল্ড একটি গাড়ি ও বাড়ি ভাড়া করে। শেষ মুহূর্তে ইয়ারিব পরিকল্পনা কিছুটা পরিবর্তন করে একটি ট্রাঙ্কও কিনতে বলে। উনবিংশ শতাব্দীতে যে ধরনের ট্রাঙ্ক প্রচলিত ছিল, সেই ধরনের। নাজি নেতা কুকুরসের লাশ ঐ ট্রাঙ্কে সাময়িকভাবে রাখার জন্য এই ব্যবস্থা।

কুঞ্জলে কুকুরসকে আবার মন্টিভিডিওতে আমন্ত্রণ জানায়।

১৯৬৫ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি কুকুরস ব্রাজিলে পুলিশের সদর দফতরে গিয়ে জানায় যে, সে একজন ব্যবসায়ী। বেশ কয়েক বছর ধরে আমি ব্রাজিল পুলিশের নিরাপত্তার মধ্যে রয়েছি। আর আমার জীবনের ওপর ঝুঁকি থাকার অনেক কারণ বিদ্যমান। এখন ইউরোপের এক ব্যবসায়িক অংশীদার আমাকে মন্টিভিডিও যেতে বলছে। এখন আপনারা কি মনে করেন আমার কি উরুগুয়ে সফর করা উচিত? এই সফর কি ঝুঁকিপূর্ণ হবে?

ব্রাজিল পুলিশের কর্মকর্তা ফিলাহো তাকে যেতে নিষেধ করেন। বলেন, আমরা এখানে আপনাকে নিরাপত্তা দিচ্ছি বিধায় আপনি শান্তিতে ও নিরাপদে রয়েছেন। যে মুহূর্তে আপনি ব্রাজিল ছাড়বেন আপনার কোনো নিরাপত্তা থাকবে না। কুকুরস মুহূর্তকাল ভাবল। তারপর বলল, আমি সব সময় একজন সাহসী মানুষ। আমি ভয় পাই না। আমি জানি নিজেকে কিভাবে রক্ষা করতে হয়। আমি সব সময়ই অস্ত্র বহন করি। আজ এতদিন পরও আমি বলব যে, আমার টার্গেট লক্ষ্যভেদী।

২৩ ফেব্রুয়ারি কুকুরসের সঙ্গে মন্টিভিডিওতে সাক্ষাৎ করে কুঞ্জলে। ফাঁদ পাতা সম্পন্ন। কুঞ্জলে একটি ভাড়া গাড়িতে করে কাসা কুবারতিনির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সেখানে হিট টিম অপেক্ষমান। কুঞ্জলে পথে বেশ কয়েকটি বাড়ি তাদের অফিসের জন্য উপযুক্ত কীনা তা খতিয়ে দেখে। এদিকে ঘটনাস্থলে গাড়ি থেকে নেমে একটি বাড়ির দিকে এগিয়ে যায় কুঞ্জলে। তাকে অনুসরণ করে কুকুরস। কুঞ্জলে অন্ধকার বাড়ির একটি ঘরে ঢুকে দেখতে পায় শুধুমাত্র জাঙ্গিয়া পরে হিট টিমের সদস্যরা দেয়ালের সঙ্গে লেপটে আছে। তারা ভালো করেই জানে, কুকুরসের সঙ্গে তাদের সিরিয়স ও রক্তাক্ত একটা লড়াই অনিবার্য। ফলে গায়ে রক্ত লেগে যেতে পারে। একারণেই জাঙ্গিয়া।

কুকুরস বাড়িতে ঢুকতেই কুঞ্জলে দরজা বন্ধ করে দেয়। তিন খুনি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। জিভ অমিত কুকুরসের টুটি চেপে ধরে। এই প্রশিক্ষণ তাকে প্যারিসে দেয়া হয়েছে। অন্যরা দুই পাশ দিয়ে তাকে জাপটে ধরে।

লাটভিয়ার নাগরিক কুকুরস ভালোই লড়াই করে। আক্রমণকারীদের ঝাঁকুনি দিয়ে সরিয়ে সে দরজার দিকে এগুতে থাকে। দরজার হ্যান্ডেলটা সে ঝাকি মেরে খোলার চেষ্টা করে। অতঃপর তার পকেটে রাখা একটি অস্ত্র বের করে জার্মান ভাষায় চিৎকার করে বলে, আমাকে কথা বলতে দাও। লড়াইকালে কুকুরস যাতে চিৎকার করতে না পারে সে জন্য ইয়ারিব তার মুখটা চেপে ধরে। কুকুরস ইয়ারিবের আঙ্গুলগুলো এমনভাবে কামড়ে ধরে সেগুলো বিচ্ছিন্ন হওয়ার উপক্রম হয়। সে ব্যথায় ককিয়ে উঠে। ঐ সময় অমিত নির্মাণকাজে ব্যবহৃত বিশাল একটা হাতুড়ি দিয়ে সজোরো কুকুরসের মাথায় আঘাত করে। রক্তের ধারা বইতে শুরু করে ক্ষতস্থান থেকে। আক্রমণকারী ও ভিকটিম মেঝেতে বেদম লড়াইয়ে লিপ্ত হয় এবং তখনো কুকুরস তার অস্ত্র দিয়ে গুলি করতে আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। পুরো কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার। ইতিমধ্যে মোসাদ গোয়েন্দা আরিয়ে কুকুরসের মাথা লক্ষ্য করে দু'রাউন্ড গুলি করে। তার অস্ত্রে সাইলেন্সার লাগানো ছিল। ফলে আশপাশের লোকজন শব্দ শুনতে পায়নি।

কুকুরস নিস্তেজ হয়ে পড়ে যায়। তার রক্তে ঘরের মেঝে, টাইলস ভরে যায়। আততায়ীদের শরীরেও রক্ত লেগে যায়। অভিযানের বেশ পরে হিট টিমের এক সদস্য জানায়, তাদের উদ্দেশ্য ছিল কুকুরসকে জীবিত পাকড়াও করা। হত্যা নয়। কিন্তু তার শরীরে এতই জোর তাকে হত্যা না করে উপায় ছিল না। তাকে হত্যার বিষয়টি অপরিকল্পিত ও অপ্রয়োজনীয় ছিল। জীবিত ধরতে পারলে কোর্ট মার্শাল করে তাকে শাস্তি দেয়া যেত।

মোসাদ এজেন্টরা কুকুরসের লাশ ট্রাঙ্কে ভরে। এর উদ্দেশ্য ছিল দুটি। পুলিশ যেন বুঝতে পারে আক্রমণকারীরা তাকে অপহরণ করে উরুগুয়ের বাইরে নেয়ার জন্য ট্রাঙ্ক নিয়ে এসেছিল। খুনিরা লাশের সাথে ইংরেজিতে টাইপ করা একটি নোটও রেখে যায়। ঐ নোটে লেখা ছিল, কুকুরসের অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর। ত্রিশ হাজার ইহুদি নারী, পুরুষ ও শিশু হত্যার সঙ্গে সে জড়িত। এই অপরাধীকে ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৫ সালে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হল। নিচে উল্লেখ করা হল, যে ঘটনা কখনো ভোলার নয়, যে মানুষেরাই হন্তারক।

ঘাতকরা ঐ ভবন ত্যাগ করে চলে যায়। ইয়ারি তার মৃত্যু পর্যন্ত হাতের ব্যথায় ভুগেছেন। সারা জীবন তিনি একটি আঙ্গুল যথাযথভাবে কার্যকর করতে পারেননি। কুঞ্জলে এবং টাউসিগা গাড়িতে করে হোটেলে আসে এবং হোটেল ত্যাগ করে। পুরো টিমই মন্টেভিডিও ত্যাগ করে এবং জটিল পথে ইউরোপ হয়ে ইসরাইলে পৌছায়। হিট টিমের লোকজন ল্যাটিন আমেরিকা ত্যাগের পর এক মোসাদ গোয়েন্দা জার্মানিতে সংবাদ সংস্থাকে এক নাজি অপরাধীর

মৃত্যুদণ্ডের কথা প্রকাশ করে।

রিপোর্টাররা প্রথম দিকে এই খবর খারিজ করে দেয়। তাদের ধারণা ছিল এ এক কৌতুক। মোসাদ এজেন্ট অবশেষে কুকুরসের ব্যাপারে বিস্তারিত বিশ্বাসযোগ্য তথ্য একটি বার্তা সংস্থাকে দেয়। মন্টেভিডিও'র এক রিপোর্টারকেও নিউজটি দেয়া হয়। সে পুলিশকে বিষয়টি অবহিত করে। কুকুরস নিহত হওয়ার দশদিন পর অকুস্থল থেকে পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে।

পরের দিন বিশ্বজুড়ে কুকুরসের মৃত্যুর খবর হেডলাইন হিসেবে ছাপা হয়। অ্যান্টন কুঞ্জলে ও অসওয়ার্ল্ডের নাম খুনি হিসেবে প্রকাশ পায়। কয়েকদিন পর রিওতে একটি সাপ্তাহিকী কুঞ্জলের অসংখ্য ছবি প্রকাশ করে। কুকুরস এই ছবিগুলো তুলেছিল। ইসরাইলের একটি পত্রিকা ঐ ছবি থেকে কুঞ্জলের একটি ছবি প্রকাশ করলে তারা বন্ধুরা কুঞ্জলের সংযুক্তির কথা জানতে পারে।

কয়েকদিন পর কুকুরসের বাড়িতে একটা চিঠি আসে। এটি কুঞ্জলের লেখা বলেই অধিকাংশের অভিমত।

চিঠিতে আমার প্রিয় হারবার্টাশ কুকুরস বলে সম্বোধন করা হয়। চিঠিতে বলা হয়, ঈশ্বরের সাহায্য ও কতিপয় স্বদেশবাসীর সহযোগিতায় আমি নিরাপদে চিলি এসে পৌঁছেছি। দীর্ঘ সফর শেষে আমি কিছুটা পরিশ্রান্ত। আমি নিশ্চিত আপনিও শীঘ্র দেশে ফিরে যাবেন। যা হোক, আমার ধারণা, একজন পুরুষ ও একজন নারী আমাদের দু'জনকে ফলো করত। সেক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক হতে হবে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিতে হবে। আমি আপনাকে বরাবরই বলেছি, স্বনামে কাজ করা এবং সফর করা আপনার জন্য একটা বিরাট ঝুঁকি। এটা আমাদের জন্য বিপর্যয়কর হতে পারে।

যাহোক আমি মনে করি, উরুগুয়ের জটিল ঘটনাবলি আপনার ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষণীয় হবে। সেজন্য আপনাকে এখন থেকেই দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে হবে। যদি আপনার বাড়ির কাছাকাছি সন্দেহজনক কিছু ধারণা করেন তাহলে এবারও আমার পরামর্শ হল আত্মগোপন করুন। ভেন লীডের কথা মনে করুন। এই নারী নেতা কায়রোতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। জার্মানি থেকে চলে যাওয়া একটি গ্রুপের সঙ্গে ছিলেন। এ্যামনেস্টির বিষয়টি সুরাহা পর্যন্ত এক-দুই বছর তারা আত্মগোপনে ছিল। আপনি এই চিঠি পাওয়ার পর চিলির শান্তিয়াগোর ঠিকানায় আমাকে উত্তর দেবেন। ইতি অ্যান্টন কুঞ্জলে। কুঞ্জলে তার গোয়েন্দা পরিচয় ঢাকার জন্য এই চিঠি লিখলেও সকলেই বুঝল যে, চিঠির প্রেরক কুঞ্জলেই। কুকুরসের স্ত্রী মিলদারের এক কথা– কুঞ্জলেই তার

স্বামীর হত্যাকারী।

কুকুরসের হত্যাকারীদের কেউ বেঁচে নেই। জিভ অমিত মারা যায় ইয়োম কিপ্পুর যুদ্ধে- ১৯৭৩ সালে। কুকুরস হত্যাকাণ্ডের এই মিশন সফল হয়েছিল। জার্মানি ও অস্ট্রিয়া নাজি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আওতার বাইরে রাখার জন্য যে আইন করতে চেয়েছিল তা তারা বাতিল করে।

কয়েক বছর পরে সাবেক মোসাদ-প্রধান আইসার হারেল এই গ্রন্থের এক লেখককে বলেন যে, তার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু সাক্ষাৎপ্রত্যাশী। হারেল বিস্তারিত কিছু বলেননি। শুধুমাত্র তেলআবিবের একটা ঠিকানা দিলেন। এই গ্রন্থের লেখক সেই ঠিকানায় গিয়ে টেকো মাথার বলিষ্ঠ এক লোকের সন্ধান পায়।

সেই ব্যক্তিই কুঞ্জলে। অ্যান্টন কুঞ্জলে।

রানি মারিয়ামের দেশে

সাদা কাপড় পরা কালো চামড়ার ইথিওপীয় শিশুরা জেরুজালেমের বিশাল এক সমাবেশের মঞ্চে গান গাইতে এসেছে। শিশুদের চোখে-মুখে ব্যাপক কৌতূহল এবং গর্ব। ইসরাইলের বিশিষ্ট সুরকার শ্লোমো গ্রোনিচ পিয়ানো হাতে মঞ্চে উপস্থিত। প্রায় ম্রিয়মাণ হয়ে বসে থাকা দর্শক শিশুদের সমবেত সংগীতের কয়েক চরণ শুনেই উজ্জীবিত। শিশুদের গানটি এরকম: চাঁদ আমাদের দেখছে। আমার পিঠের ব্যাগে রয়েছে খাবার। আমার মা আমার ছোট ভাইদের পা চালিয়ে যেতে বলছে। বলছে, আর একটু আগাও। আরেকটু। এরপরই জেরুজালেম।

কবি হেইম ইদিসিসেরজার্নি সংশীর্ষক এই গানে ইথিওপিয়ার ইহুদিদের জেরুজালেমে আসার বর্ণনা রয়েছে। গানটি শুনে দর্শক মুহুর্মুহু করতালি দিতে লাগল। ইথিওপিয়ায় বসবাসরত ইহুদিদের জেরুজালেমে ফিরিয়ে আনতে যে ধকল গেছে, যা ছিল মিশন ইমপসিবল– সেকথা মনে করে শ্রোতা-দর্শক ছিল উত্তাল। আর গানটির বিশেষত্বও তাই। অন্যকিছু নয়।

সমবেত সংগীতের বাণীতে আরও ছিল: আমাদের খাবারের ব্যাগ গেল হারিয়ে। রাতে ডাকাতরা আমাদের আক্রমণ করল। তারা ছিল চাকু ও শানিত অস্ত্রসহ। বিশালাকায় মরুভূমিতে তারা আমার মাকে হত্যা করল। চাঁদ এর একমাত্র সাক্ষী। আমি আমার ছোট ভাইদের বললাম, আরেকটু পা চালাও। আরেকটু পা চালাও। এরপরই পূরণ হবে স্বপ্ন। সহসাই আমরা ইসরাইলের নাগাল পেয়ে যাব।

ইসরাইল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ইহুদিদের জেরুজালেমে ফিরিয়ে এনেছে। তারা ফিলিস্তিনিদের জমি অন্যায়ভাবে দখল করে রেখেছে। বহু ফিলিস্তীনীকে হত্যা করেছে। সেই হত্যাকাণ্ড আজও অব্যাহত। তবে ইথিওপিয়া থেকে ইহুদি উপজাতিদের ইসরাইলে ফিরিয়ে আনতে তাদের অভিযান ছিল খুবই সংকটাপন্ন ও ঝুঁকিবহুল।

সেই ঘটনা জীবন্ত কিম্বদন্তি হয়ে উঠেছে। আফ্রিকার ইথিওপিয়ায় বসবাসরত এই ইহুদি উপজাতিরা সারা বিশ্ব থেকে ছিল পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। তারা ইথিওপিয়ার বিভিন্ন পাহাড় ও উপত্যকায় বসবাস করত। আর দেশটি রানি শেবার নিয়ন্ত্রণাধীন। তবে এই উপজাতি ইহুদিদের বিশেষত্ব হল হাজার বছর ধরে তারা বাইবেলে বর্ণিত উল্লেখিত ধর্মকে অদম্য মনোযোগের সঙ্গে

অবিকৃতভাবে ঐ বিশ্বাসের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে রেখেছিল।

এই শান্ত ও লাজুক ইহুদিরা ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়েই গিয়েছিল। তাদের শ্রদ্ধেয় নেতা বেসিম ঢোলা সাদা গাউন পরিধান করত। জায়নবাদের প্রাচীনতম নিয়মনীতি অণুসরণ করত। একই সাথে আধুনিক জীবনের নিয়মনীতিও মেনে চলত। তারা বরাবরই শান্তিপ্রিয় ছিল। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখত। এর পাশাপাশি দীর্ঘকাল তারা নিষ্ঠুর শাসনের হাতে ব্যাপকভাবে নিগৃহীতও হয়েছে। তবে ওদের জন্য দুঃখের বিষয় ছিল ইহুদিদের ধর্মীয় নেতা রাব্বি ও আধ্যাত্মিক নেতারা। বিশ্বব্যাপী তারা প্রচার করত যে, ইথিওপিয়ার ইহুদিরা যারা ফালাসা নামে পরিচিত– তারা প্রকৃত অর্থে ইহুদি নয়।

ইথিওপীয় ইহুদিরা তাদের ধর্মীয় নেতাদের ফতোয়া সত্ত্বেও মনোবল হারায়নি। যুগ যুগ ধরে তারা জায়নবাদীদের ঐতিহ্য অনুসরণ করে আসছিল। বাবা থেকে ছেলে, মা থেকে মেয়ে ইহুদিবাদে অবিচল থেকে তারা একদিন তাদের কথায় পবিত্র ভূমি ইসরাইলে চলে আসার স্বপ্ন দেখত।

ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে প্রায় ত্রিশ বছর ইথিওপিয়া থেকে বেশ কিছু ইহুদি ইসরাইলে সমর্থ হয়েছিল। সম্রাট হাইলে সেলাসি ছিলেন ইসরাইলের বিশেষ মিত্র ও সুহৃদ। তার সময়ে সুযোগ থাকলেও ইথিওপিয়ার ইহুদিদের ইসরাইলে ফিরিয়ে আনার তেমন কোনো প্রয়াস চালানো হয়নি। প্রকৃতপক্ষে তাদের ইসরাইলে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গৃহীত হয় ১৯৭৩ সালে। ঐ সময় ইসলাইলের প্রধান রাব্বি বা ধর্মীয় নেতা ওভাদিয়া ইয়োসেফ এক দ্ব্যর্থহীন রুলিংয়ে বলেন যে, ইথিওপিয়ার ইহুদিরা যারা নিজেদেরকে বেটা ইসরাইল বলে পরিচয় দেয় তারা পরিপূর্ণভাবেই ইহুদি। মূলতঃ এরপর থেকে তাদের ইসরাইলে ফিরিয়ে আনার তৎপরতা শুরু হয়। দু'বছর পর ইসরাইল ইথিওপিয়ার ইহুদিদের দেশে ফিরিয়ে আনতে আইন পাস করে। অতঃপর ১৯৭৭ সালে মোনাচেম বেগিন প্রধানমন্ত্রী হলে তিনি এ কাজে মোসাদ-প্রধান জেনারেল আইজাক (হাকা) হোফিকে ডেকে পাঠান। বেগিন মোসাদ-প্রধানকে ইথিওপিয়ার ইহুদিদের দেশে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দেন।

মোসাদের অবকাঠামোতে বিটজুর নামে একটা বিশেষ ইউনিট রয়েছে। বহু দেশের ইহুদিদের নিরাপত্তা বিধান এবং তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার কাজ এই ইউনিটের ওপর ন্যস্ত। বিটজুরের নাম পরিবর্তিত হয়ে রাফরিরিম করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী বেগিনের নির্দেশ পেয়ে মোসাদ-প্রধান হাসা ডেভিড কিমহিকে ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায় পাঠান। কিমহি মোসাদের সহকারী

পরিচালক এবং টেভেল নামে একটি গোয়েন্দা ইউনিটের প্রধান। এই ইউনিট আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়াদি গোপনে দেখভাল করে। সে ইথিওপিয়ার শাসক মেনগিস্তু হাইলে মারিয়ামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। ঐ সময় ইহুদি দেশত্যাগীদের জন্য ইথিওপিয়ার দরজা বন্ধ ছিল। একই সাথে গৃহযুদ্ধের তাণ্ডবে ইথিওপিয়ায় তখন ব্যাপক বিশৃঙ্খলা চলছিল। মারিয়াম বিদ্রোহীদের দমনে ইসরাইলের সহায়তা চাইলেন। কিমহি বিদ্রোহীদের দমনে হাইলে মারিয়ামের প্রস্তাবে না বললেও অস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে সম্মত হন। তবে সিদ্ধান্ত হয় হাইলে মারিয়াম ইথিওপিয়ার ইহুদিদের দেশত্যাগে বাধা দেবেন না।

আরও সিদ্ধান্ত হয়, হারকিউলিস বিমানে করে ইসরাইল থেকে ইথিওপিয়ায় অস্ত্রশস্ত্র যাবে। ঐ বিমানেই ইহুদিরা ইসরাইলে ফিরে আসবে। উল্লেখ্য, সেভাবেই ছয় মাস কাজ চলতে থাকে। কিন্তু ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইসরাইলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোশে দায়ান একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলেন। একটি সুইস পত্রিকায় মোশে দায়ান ভুল করে বলে ফেলেন যে, হাইলে মারিয়ামের সেনাবাহিনীতে ইসরাইল অস্ত্র সরবরাহ করছে। অনেকের মতে মোশে দায়ানের ঐ উক্তি ভুলবশত ছিল না, ছিল উদ্দেশ্যমূলক। কেননা সোভিয়েত সমর্থিত হাইলে মারিয়ামের সরকারকে অস্ত্র প্রদান তার মনঃপূত ছিল না।

হাইলে মারিয়াম মোশে দায়ানের মন্তব্যে অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। ইসরাইলের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি মারিয়াম জনসমক্ষে ফোকাসের বিরুদ্ধে ছিলেন। এর ফলে ইথিওপিয়ার ইহুদিদের সরাসরি ইসরাইলে আসার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। যদিও মোসাদ-প্রধান হাকার প্রতি বেগিনের নির্দেশ বহাল ছিল।

ইথিয়পিয়ার সঙ্গে ইসরাইলের দরজা বন্ধ হয়ে যায় আরেকবার। এদিকে ইথিওপিয়ার প্রতিবেশী দেশ সুদানের রাজধানী খার্তুম থেকে মোসাদ সদর দফতরে একটি চিঠি এসে পৌঁছায়। এই চিঠিতে ইথিওপিয়া থেকে বিকল্প একটি রুট দিয়ে ইহুদিদের পালানোর পরিকল্পনার বিবরণ দিল। ঐ চিঠির প্রেরক ফেরেডা আকলুম নামের ইথিওপিয়ার ইহুদির। সে একজন শিক্ষক। ইথিওপিয়া থেকে সে পালিয়ে বর্তমানে সুদানে বসবাসরত।

এদিকে ইসরাইলের দৃষ্টিতে সুদান হল তাদের শত্রুরাষ্ট্র। দুর্ভিক্ষ, খরা, সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ ও উপজাতিদের বিরোধে দেশটি বিপর্যস্ত। সুদানের কয়েক হাজার উদ্বাস্তু থাকে তাঁবুতে। ইথিওপিয়ার বহু শরণার্থীরও বাস এসব তাঁবুতে। ইথিওপিয়ার ইহুদিদের রক্ষায় আকলুম ইসরাইলসহ বিভিন্ন দেশের ত্রাণ

সংস্থাকে চিঠি পাঠিয়েই চলেছে। অবশ্য তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হল, ইথিওপিয়ার ইহুদিরা যাতে কোনো প্রকারে ইসরাইলে পৌঁছতে পারে। আকলুম একটি চিঠিতে মোসাদের কাছে বিমানের একটি টিকেট চায়। মোসাদ তাকে বিমানের টিকেট না পাঠিয়ে তাদের একজন গোয়েন্দাকে পাঠায়। মোসাদের ড্যানি লিমোর গিয়ে আকলুমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তাদের দু'জনের মধ্যে সিদ্ধান্ত হয় আকলুম শরণার্থী শিবিরে ইহুদিদের খুঁজে বের করবে এবং তা ড্যানিকে অবহিত করবে। এই সময় আকলুমকে সদস্য হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়। কয়েক মাসের ব্যবধানে আকলুম ত্রিশ জন ইহুদির সন্ধান পায় এবং মোসাদ বুদ্ধির বলে তাদের ইসরাইলে পাঠাতে সক্ষম হয়। আকলুস আর কোনো ইহুদিকে খুঁজে না পাওয়ায় মোসাদ গোয়েন্দা ইসরাইলে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেয়। লিমুর আকলুমকে ইসরাইলে তার মতো চলে আসতে বলে। কিন্তু আকলুম এতে কোনোমতেই রাজি নয়। সে সুদানের প্রত্যন্ত এলাকায় ইহুদিদের খুঁজে পেতে তৎপরতা চালাবে। এদিকে মোসাদের লিমুরও অ্যাডামেন্ট। লিমুর আকলুমকে এক সপ্তাহের মধ্যে সুদান ছেড়ে ইসরাইলে চলে আসার নির্দেশ দেয়। লিমুরের আদেশ প্রত্যাখ্যান করে আকলুম এক শরণার্থী শিবির থেকে আরেক শিবিরে ইহুদি খুঁজতে মগ্ন থাকে। সে কিন্তু এ পর্যায়ে একজন ইহুদিকেও খুঁজে পায়নি। তবুও সে ইসরাইল ফিরবে না। তার আশংকা সে চলে গেলে সুদান হয়ে ইথিওপিয়ার ইহুদিদের দেশে ফিরিয়ে নেয়ার প্রকল্প চিরকালের জন্য পরিত্যক্ত হবে। অতঃপর সে মোসাদ সদর দফতরে একটা মিথ্যা রিপোর্ট পাঠায়। ঐ রিপোর্টে সে এমনসব ইহুদিদের নামের তালিকা নথিভুক্ত করে যারা সুদানে নয়, ইথিওপিয়ায় থাকে।

সে আরও ঘোষণা করে যে, সুদানের কথিত ঐ ইহুদিদের দেখভাল করার জন্য সে সুদানেই অবস্থান করবে। এখন আকলুম তার তালিকা ধরে সুদানে নয় ইথিওপিয়ার গ্রামে গ্রামে একাকী ঘুরে ইহুদি খুঁজে বের করার কাজ নেয়। ঐ ইহুদিদের সে ইথিওপিয়া ছেড়ে ইসরাইলে যেতে ব্রেনওয়াশ করতে থাকে। এদিকে জেরুজালেমে পৌঁছতে আবিষ্কৃত নতুন রুটের বিষয়টি ইথিওপিয়ার ইহুদিদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহের সঞ্চার করে। প্রথমে কয়েকজন ব্যক্তি, পরবর্তীতে কয়েকটি পরিবার ইথিওপিয়া ত্যাগ করে। পরে দেখা গেল পুরো একটি ইহুদি গ্রাম তাদের মালামাল বাক্সবন্দী করে দেশত্যাগে প্রস্তুত। এভাবে বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, মহিলা, শিশুসহ কয়েক হাজার ইহুদি গোপনে ইথিওপিয়া ত্যাগ করে। এসব ইহুদি বাইবেলে বর্ণিত মসীহ-এর স্বপ্ন অনুযায়ী দুধ ও মধুর দেশ ইসরাইলে পৌঁছতে উদ্বুদ্ধ হয়।

ইসরাইলে পৌঁছতে বন্ধুর, কষ্টকর পথের জন্য তারা পানি ও খাদ্য তৈরি করে সঙ্গে নেয়। তারা সারা রাত ধরে হাঁটত। কিন্তু দিনের বেলায় গুহার মধ্যে লুকিয়ে থাকত। এভাবে বহু ইহুদি অসুস্থ হয়ে মারা গেল। এই দুঃসাহসিক ভ্রমণে এক বাবা তারা চার-চারটি সন্তানকে হারিয়েছে। মারা গেছে তারা। সাপ, বিছের আক্রমণ ও সংক্রামক ব্যাধিতে মৃত্যুর সংখ্যা অগণিত। সর্বোপরি তাদের খাদ্য ও পানি ছিল সীমিত। পথে বহুবার ডাকাতের কবলে পড়ে নিঃস্ব হয়েছে।

কয়েক বছর পর এই কষ্টকর সফরের বর্ণনা দিয়েছে অভিনেত্রী মেহেরেতো বারুশ। বারুশও তাদের সফরসঙ্গী ছিল। তার ভাষ্য, সফরসঙ্গীরা প্রতিদিন সকালে লাশ খুঁজত। কখনো কখনো বালিতে দশটি পর্যন্ত লাশ পাওয়া যেত। কোনোদিন পনেরটি। এমন কোনো পরিবার ছিল না যারা অন্তত একজন সন্তানকে হারায়নি।

১৯৮১ সালের গ্রীষ্মকালে ড্যানি লিমুর তার মোসাদের সহকর্মীদের নিয়ে ছদ্মবেশে সুদানে আসে। তাদের টার্গেট সুদানে ইথিওপিয়ার ইহুদিদের খুঁজে বের করা। বেঁচে গিয়ে খার্তুমসহ বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়া ইহুদিরা মোসাদের পরিচয় পাওয়া সত্ত্বেও তারা তাদের ইহুদি পরিচয় গোপন করল। শরণার্থীরা ত্রাণ কর্মকর্তাদের দেয়া 'ননকোশার' খাবার গ্রহণেও অস্বীকৃতি জানাল। এদিকে শরণার্থী শিবিরে ষণ্ডা ও পাণ্ডারা সমানে মহিলা এবং কিশোরীদের ধর্ষণ করতে লাগল। শতাধিক মেয়েদের একটি গ্রুপ অপহৃত এবং গুম হল। তাদের স্বজনরা জানতে পারল ঐ মেয়েদের সৌদি আরবে পাচার করা হয়েছে। সেখানে আরও এক লক্ষ ২০ হাজার মহিলা দাসত্ব বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। ত্রাণশিবিরে বহু ইহুদি নারীকে ধরিয়ে দিল এক সময়ের প্রতিবেশীরা। সুদানের পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে ও নির্দয়ভাবে মারধর করে।

ইথিওপীয় ইহুদিদের জেরুজালেমে যেতে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়। ইসরাইলের পথে প্রায় চার হাজার ইহুদির মৃত্যু হয়। কানাডার ইহুদি হেনরি গোল্ড সুদান ও ইথিওপিয়ার আশ্রয় শিবিরে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করত। ইসরাইল তাদের ফিরিয়ে নিতে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করছে বলে সে তীব্র সমালোচনা করে।

প্রকৃতপক্ষে মোসাদ তাদের একটি নিরাপদ রুটে ইসরাইলে নেয়ার চেষ্টা করছিল। মোসাদ সুদান থেকে ভুয়া পাসপোর্টে ইহুদিদের বিমানে ইসরাইল নেয়া শুরু করেছিল। কিন্তু এখন তারা সমুদ্রপথে তাদের নিতে ইচ্ছুক।

এ লক্ষ্যে মোসাদ ইউরোপে একটি পর্যটন কোম্পানি খোলে। কোম্পানিটি সুদান বন্দরের কাছের একটি পরিত্যক্ত বীচ রিসোর্ট ভাড়া করে। লোহিত সাগরের ঐ বিচে উপকূল-উপযোগী খেলাধুলার উন্নয়নে সুদান সরকারের সঙ্গে একটা চুক্তি করে। রিসোর্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয় ইয়োনাতান সেফা নামের এক মোসাদ গোয়েন্দা। এই বীচ ও রিসোর্টে কয়েকটি একক বাংলো এবং কয়েকটি বেসরকারি ভবন ছিল। জাল পাসপোর্ট নিয়ে মোসাদ এজেন্টরা এই রিসোর্ট পল্লিতে এসে নানা পদে চাকরি নিতে শুরু করল। রিসোর্টের গুদাম গোয়েন্দারা সাঁতারের বিভিন্ন পোশাক, মুখোশ, ডুবসাঁতারুর নল, ডুবুরির জুতা দিয়ে ভরে ফেলল। মোসাদ সদর দফতরের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য একটি গোপন রেডিও স্থাপিত হল। মোসাদের এক শীর্ষ কর্মকর্তা রিসোর্টের গোয়েন্দাদের বলল, এই অভিযানে যেন হত্যাকাণ্ড সংঘটিত না হয়। এটি হতে হবে মানবিক। এই অভিযানটি তাদের জন্য অনেক বেশি আবেগপূর্ণ বলেও উল্লেখ করা হয়। রিসোর্টের লোকদের জানানো হয় যে, তাদের রিসোর্টের সুখ্যাতির কথা জানিয়ে সারা ইউরোপ জুড়ে পোস্টার ছাড়া হবে।

আরআউস নামের এই রিসোর্টে একে একে বহু পর্যটক আসতে শুরু করল। দিনের বেলা পর্যটকরা সাঁতার কাটত, ডুবসাঁতার ইত্যাদি দিত। কিন্তু এই পর্যটকদের কেউই জানত না, প্রতি রাতে মোসাদ গোয়েন্দারা শরণার্থী ক্যাম্প ও গ্রাম থেকে ইহুদিদের এখানে এনে জড়ো করত। ঐ ভিলেজে বহু সুদানি কাজ করত। সাঁতার প্রশিক্ষক তাদের জন্য একটা গল্প সাজাল। গল্পটি হল, সন্নিহিত শহরের রেডক্রস হাসপাতালে যোগদানের জন্য এরা এখানে রাতটা কাটাবে। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই সুদানিরা সন্দেহজনক কিছু কর্মকাণ্ডের আভাস পায়। কিন্তু রিসোর্টের পক্ষ থেকে ভালো বেতন ভাতা পাওয়ার কারণে তারা এ বিষয়ে বেশি মনোযোগী হয় না।

মোসাদ রাতের অভিযান চালাত চারটি পুরনো ট্রাকের সাহায্যে। সেই ট্রাকে ইহুদিদের তোলা হত। কিন্তু বিষয়টি অত সহজ ছিল না। ইসরাইলিদের বহু ঝুঁকির মধ্যে কাজ করতে হবে। প্রতি মুহূর্তে ছিল ধরা পড়ার আশংকা।

এদিকে গ্রাম থেকে সংগ্রহীত ইহুদিদের অনেকেই সাদা চামড়ার মানুষ কখনো দেখেনি। সাদা চামড়ার মানুষ যে ইহুদি হতে পারে এ ছিল তাদের ধারণারও বাইরে। ফলে সাদাদের কথা তারা বিশ্বাস করতে চাইত না। এক সাদা গোয়েন্দা কর্মকর্তা যখন তাদের সঙ্গে প্রার্থনায় যোগ দিল তখনই তাদের মনে প্রত্যয় জন্মাল যে তারাও ইহুদি।

এখন চার ট্রাক ভর্তি ইহুদিকে লোহিত সাগরের উপকূল ধরে কয়েকশত মাইল পাড়ি দিতে হবে। পথে সুদানী সামরিক বাহিনী এবং পুলিশকে মোসাদের এক কর্মকর্তা সমানে ঘুষ দিয়ে চলতে লাগল। এভাবে ইসরাইলি নৌবাহিনীর জাহাজ যেখানে অপেক্ষা করছে সেখানে ট্রাকগুলো নেয়া হল। সেখানে কিছুটা দূরে একটি নেভি বোট নোঙ্গর করা ছিল। নৌবাহিনীর কমান্ডোরা রাবারের ডিঙ্গি নিয়ে এসে ইহুদিদের মাদার শিপে নিয়ে যেতে লাগল। এভাবে ইহুদিদের ইসরাইলে নিয়ে যাওয়া হতে লাগল।

কানাডার হেনরি গোল্ড একজন স্বেচ্ছাসেবী ও ইহুদি। ক্লান্ত-শ্রান্ত গোল্ড রিসোর্ট ভিলেজে থাকার সময়ই সন্দেহজনক কিছু একটা আঁচ করল। গ্রাম ঘুরতে গিয়ে তার মনে হল মোসাদ গুপ্তচরদের দ্বারা সে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। যেমন এক মহিলা নিজেকে সুইস বলে পরিচয় দিল কিন্তু তার অ্যাকসেপ্ট ভিন্নতর। এক ইরানির এ্যাকসেপ্টও ইরানিদের মতো নয়। গোল্ড পৃথিবীর বহু দেশ ঘুরেছে বিধায় সে অভিজ্ঞ। একদিন ডিনারে সে এমন এক পদের সালাদ দেখল তা শুধুমাত্র ইসরাইলেই বানানো হয়।

পরদিন সকালে গোল্ড সাঁতার-প্রশিক্ষককে গিয়ে ধরল এবং হিব্রু ভাষায় তাকে প্রশ্ন করল, এখানে হচ্ছেটা কী। যাহোক, গোল্ডকে কোনো রকম বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করা হল।

১৯৮২ সালের মার্চে ইথিওপিয়ার ইহুদিদের বেশ কয়েকটি বোটে করে পাচারের সময় একটা ডিঙ্গিতে বসা চার মোসাদ গোয়েন্দা সুদানী সামরিক বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে গেল। সেই দলে লিমুরও ছিল। লিমুর ইংরেজিতে সুদানি সৈন্যদের বলল, তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? পর্যটকদের রাইফেল দিয়ে গুলি করতে উদ্যত হয়েছ! লিমুর আরও বলল, সুদানের পর্যটন শিল্পকে চাঙ্গা করতে পর্যটকরা এই রিসোর্টে আসে।

পরদিন লিমুর সুদানি সেনাবাহিনীর এক কমান্ডারকে বিষয়টি জানালে সে ক্ষমা চাইতে চাইতে ঘর্মাক্ত হয়ে উঠে। সে অবশ্য বলে যে, তার সৈন্যরা চোরাচালানি মনে করেছিল। সে তার সৈন্যদের ঐ স্থান অবিলম্বে ত্যাগের নির্দেশ দেয়। ফলে মোসাদ গোয়েন্দারা নিরাপদ এখন।

অবশ্য এখান থেকে সমুদ্রপথে ইহুদিদের চালান আপাতত বন্ধ। নতুন একটি যাত্রাপথ আবিষ্কৃত হয়েছে। একদিন সকালে এখানকার পর্যটকরা দেখে যে, সব বিদেশি স্টাফ লাপাত্তা। স্থানীয় কয়েকজন স্টাফ অবশ্য সকালের নাস্তা তৈরি করছিল। আসলে আগের রাতেই মোসাদ গোয়েন্দারা ঐ টুরিস্টপল্লী ছেড়ে

গেছে। গোয়েন্দারা এক নোটিশ টানিয়ে লিখে গেছে, বাজেট সংকটের কারণে তারা টুরিস্টপল্লীটি বন্ধ করে দিয়েছে। যেসব পর্যটক টাকা জমা রেখেছিল তা পরে দেয়া হবে বলে জানিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা হল।

মোসাদ সদর দফতরে দীর্ঘ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হল, নৌপথে আর নয়, এবার বিমানযোগে ইহুদিদের ইসরাইলে নিয়ে আশা হবে। ইসরাইলি বিমান বাহিনীর হারকিউলিস সি-১৩০ বিমানযোগে ইহুদিদের শত্রু দেশ সুদানে থেকে আনা হবে। মোসাদ বুঝল, সুদানে এই কর্ম করা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হবে এবং বারে বারে শত্রু দেশের ভূখণ্ডে বিমান ওঠা-নামা করা সহজ কাজ নয়।

১৯৮২ সালের মে মাসে মোসাদ গোয়েন্দাদের একটি অগ্রবর্তী দল সুদানে আসে। উদ্দেশ্য, সুদান বন্দরের দক্ষিণে একটি নিরাপদ বিমান ওঠা-নামার স্থান চিহ্নিত করা। দলটি ব্রিটিশ নির্মিত একটি পরিত্যক্ত এয়ারফিল্ড সংস্কার করে। ওখানে যখন ইসরাইলি বিমান বাহিনীর রিনো বিমানটি নামল অপেক্ষমাণ ইথিওপিয়া ইহুদিরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। এতো বড় স্টিলের বডি একটি পাখি যার গর্জন ভয়ংকর– এ তারা জীবনে প্রথম দেখল। অনেক ইহুদি ভয়ে পালিয়ে গেল। মোসাদ গোয়েন্দারা অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসে। অনেকে এই দৈত্যাকার স্টিল বডি দেখে ঢুকতে অস্বীকৃতি জানায়। এভাবে প্লেনটির উড়াল দিতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে ঘণ্টাখানেক বেশি সময় লেগে যায় এবং অবেশেষে ২১৩ জন ইথিওপিয়ার ইহুদিকে নিয়ে সেটি উড্ডয়ন করে। মোসাদ সদর দফতর থেকে এই অভিযানের প্রশংসা করে টেলিগ্রাম পাঠানো হয়।

ইসরাইলিদের এই অভিযান বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। সুদানি কর্তৃপক্ষের কাছে তা জানাজানি হলে মোসাদ আরেকটি এলাকা নির্বাচনে নামে। নতুন স্পটটি পোর্ট সুদান থেকে ৬৪ কিলোমিটার দূরে।

মোসাদ-প্রধান হাকার তত্ত্বাবধানে ১৯৮২-১৯৮৪ এর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই অভিযান পরিচালিত হয়। ইসরাইলি ছত্রীসেনা বাহিনীর প্রধান জেনারেল অ্যামোল ইয়ারোন হাকাকে সহযোগিতা করেন। উল্লেখিত সময়ে এক হাজার পাঁচশত ইথিওপিয়ার ইহুদিকে ইসরাইলে স্থানান্তর সম্ভব হয়।

এই সকল অভিযান এক পর্যায়ে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সুদানি এক নিরাপত্তা কর্মকর্তা মোসাদের সঙ্গে শরণার্থী ক্যাম্পের লোকদের সংযোগ ঘটিয়ে দেয়া আব্দিস সলোমানকে আটক করে। সলোমান ইথিওপিয়ার ইহুদি। তাকে সুদানে বিয়াল্লিশ দিন ধরে নির্যাতন করা হয়। তার নেপথ্যের লোকদের নামধাম

এতেঠ নিগ্রহ সত্ত্বেও সে স্বীকার করেনি।

১৯৮৪ সালে সুদানে দুর্ভিক্ষ দেখা গিলে শরণার্থী ক্যাম্পগুলোর দুরবস্থা ও সংক্রামক রোগ চরম আকার ধারণ করে। সুদানের গৃহযুদ্ধ বাধার উপক্রম হলে দেশের স্বৈরশাসক জাফর নিমেরির সিংহাসন টলমল করে উঠে। এখন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সাহায্য ছাড়া আর তার গত্যন্তর নেই।

ইসরাইল আমেরিকাকে বলে, যদি সুদান তাদের বিমান অভিযান চালাতে দেয়, তাহলে যেন সাহায্য করে। মার্কিন প্রশাসন সম্মত হলে খার্তুমে নিযুক্ত আমেরিকার রাষ্ট্রদূত সেই আলোকে আলোচনা করে। সমঝোতা হয় ইহুদিদের সুদান থেকে সরাসরি ইসরাইলে নেয়া যাবে না। তবে একটি তৃতীয় দেশের মাধ্যমে সম্ভব। বিনিময়ে সুদানকে খাদ্য ও তেল সরবরাহের সুযোগ দিতে হবে। সুদানের আমেরিকার দূতাবাস ওয়াশিংটনকে জানায়, পাঁচ থেকে ছয় সপ্তাহের জন্য সুদান থেকে ইসরাইল ইহুদিদের নিতে পারবে। এভাবেই অভিযানের শুরু হয়।

এদিক মোসাদ-প্রধান হাকার স্থলাভিষিক্ত হন তার ডেপুটি নাহুম আদমোনি। আদমোনি বেলজিয়াম হয়ে ইথিওপিয়ার ইহুদিদের ইসরাইলে আনতে শুরু করেন।

সুদানে বেলজিয়ামের বিমানচালক হুড়মুড় করে বিমানে ঢোকা আড়াইশত যাত্রীকে নিয়ে প্লেন চালাতে অস্বীকৃতি জানায়। তার ভাষ্য, উড়োজাহাজে অক্সিজেন মাসক রয়েছে দুশটি। কিন্তু যাত্রী পঞ্চাশজন বেশি।

মোসাদের এক গোয়েন্দা বিমানের পাইলটকে একান্তে ডেকে বলে, কে বাঁচবে আর কে মরবে এখন সেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তুমি যদি এখন ককপিটে না ওঠ আমি তোমাকে প্লেন থেকে ছুঁড়ে ফেলে সেখানে অন্য পাইলট বসাব। ঐ পাইলটই তাড়াতাড়ি বিমানে উঠে বসে। পরবর্তী সাতচল্লিশ দিনে ঐ বিমানটি গোপন অভিযান চালিয়ে সাত হাজার আটশত ইথিওপিয়া ইহুদিকে ইসরাইলে ব্রাসেলস হয়ে পৌছে দেয়।

ইসরাইল এই অভিযান গোপন রাখতে দেশের গণমাধ্যমের ওপর কড়াকড়ি করলেও ইহুদি এজেন্সি চেয়ারম্যান এরিয়ে ডুজলিন এক বিবৃতির মাধ্যমে তা ফাঁস করে দেন। ঐ বিবৃতিতে তিনি বলেন, ইহুদিদের একটা উপজাতি আমাদের পবিত্র ভূমিতে ফিরে এসেছে। নিউইয়র্ক জিউস প্রেস এই অভিযানের বিস্তারিত ছাপে। লস এঞ্জেলস টাইমসও তা প্রকাশ করে।

তিনদিন পর ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী সিমন পেরেজ সংসদে বলেন, তার সরকার যা করছে তা অব্যাহত থাকবে। সর্বশেষ ইথিওপিয়ার ইহুদিকে দেশে না নিয়ে আসা পর্যন্ত অভিযান চলবে। এদিকে সেদিনই সুদান বিমান চলাচল বন্ধ করে দিলে ইহুদিদের ফিরে আসার কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। সুদানীদের কাছে অভিযানের চেয়ে বড় হয়ে দেখা দেয় ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য। যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, ইসরাইল যদি একটা মাস চুপচাপ থাকত তাহলে ইথিওপিয়ার সর্বশেষ ইহুদিকেও দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হতো।

যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশ অবশ্য ইসরাইলিদের অভিযানে চমৎকৃত হন। তার মতে, অভিযানটি ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। বুশ অতঃপর ভূমিকা রাখতে চাইলেন। ইসরাইলিদের অভিযান বন্ধের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমেরিকার বিমান বাহিনীর সাতটি হারকিউলিস বিমান সুদানের বিমানবন্দর আল কাদারিকে পাঠালেন। সেই উড়োজাহাজে ছিল সিআইএ'র বেশ কিছু গোয়েন্দা। মার্কিন টাস্ক ফোর্স রানি শেবা দেশে অভিযান চালিয়ে পাঁচশত ইথিওপিয়ার ইহুদিকে সুদান থেকে উড়িয়ে এনে সরাসরি ইসরাইলের বিমানবন্দরে নামাল।

দু'মাস পরে সামরিক বাহিনী জাফর নিমেরিকে ক্ষমতাচ্যুত করে। লিবিয়ার গোয়েন্দারা সুদানে গিয়েই খার্তুমে মোসাদ গোয়েন্দাদের উপস্থিতি লক্ষ করেন। তখনো মোসাদের তিনজন গোয়েন্দা সুদানে ছিল। তারা অবশ্য সিআইএ'র গোয়েন্দাদের বাসায় লুকিয়ে থাকতে সমর্থ হয়। সেই লুকানো অবস্থা থেকেই মার্কিনিরা মোসাদ গোয়েন্দাদের স্বদেশে যেতে সাহায্য করে।

যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাইলের কুইন অব 'শিবা'র শীর্ষক অভিযানটি খুবই নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয়। একই সাথে তা ছিল সরল, শান্ত ও মনোরম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ইসরাইলি গোয়েন্দা পোলার্ডের একটি ঘটনায় আমেরিকা ও ইসরাইলের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত ঘটে।

পোলার্ড যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থায় কাজ করলেও ইসরাইলের পক্ষে গোয়েন্দাগিরির অভিযোগে সে গ্রেফতার হয়। এই ঘটনায় আমেরিকা স্তম্ভিত। যে আমেরিকা ইসরাইলের জন্য এতেঠ কিছু করল তদের এই আচরণে– সিআইএ'র শীর্ষ কর্মকর্তারা খুবই ক্ষুব্ধ হন।

ইসরাইল এ ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করে এবং পোলার্ডের চুরি করে নেয়া কাগজপত্র আমেরিকাকে ফিরিয়ে দেয়। তবে দুই দেশের মধ্যকার গোয়েন্দা তৎপরতায় দীর্ঘদিন অস্বাভাবিকতা লক্ষ করা যায়। পোলার্ডের উর্ধ্বতন

কর্মকর্তা হলেন রাফি এইতান। তিনি গোয়েন্দাদের যে ইউনিটটি চালাতেন সেটি তখনি বন্ধ করে দেয়া হয়। এইতানের বিরুদ্ধে আমেরিকায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়ে যায়। বহুদিন গ্রেফতারের ভয়ে আমেরিকায় যাননি মোসাদ গোয়েন্দা এইতান।
ইথিওপিয়া থেকে আগত ইহুদিদের অনেকেই কুইন অব শেবা অভিযানের বিপক্ষে ছিলেন। কেননা এই অভিযানে চার হাজার ইহুদি মারা গেছে। মোসাদের আরেকটি প্রতিষ্ঠান কায়েসারেয়ার শীর্ষ গোয়েন্দাদের অভিমত, বিতজার বিভাগের লোকদের দ্বারা এতবড় একটা অভিযান পরিচালনা উচিত হয়নি। তাছাড়া বিতজার গোয়েন্দা বিভাগের মধ্যে খুবই ছোট্ট একটা ইউনিট। তারা তেমন সুসংগঠিতও নয়।

বিতজারের লোকজন তাদের সফল অভিযানের জন্য খুবই খুশি ছিল। তারা অবশ্য বলে যে, মোসাদের বেশ কয়েকজন দক্ষ কর্মকর্তাকে তারা সঙ্গে নিয়েছিল।

দুই গোয়েন্দা সংস্থার মধ্যে বিরোধ সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য ইথিওপিয়ার অসংখ্য ইহুদি আজ ইসরাইলে আসতে পেরেছে। কিন্তু এ-ও সত্য যে, এখনো কয়েক হাজার ইহুদি ইথিওপিয়ায় রয়ে গেছে। তারা ইসরাইলে আসতে খুবই আগ্রহী কিন্তু দরজা তো বন্ধ। ইসরাইল মনে করে আদর্শগত ও ইহুদি হওয়ার কারণে তাদের দেশে ফিরিয়ে আনা অবশ্য কর্তব্য। মানবিক কারণেও এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কেননা আগত ও আটকে পড়া পরিবারগুলো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। অনেক শিশুরা চলে এসেছে অথচ তাদের বাবা-মা আসতে পারেনি। স্বামী এসেছে, স্ত্রী আসতে পারেনি। নতুন পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে তাল মেলাতে না পারা এবং স্বজনদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে অনেকে আত্মহত্যাও করেছে।

এদিকে ইহুদি এজেন্সির প্রতিনিধিরা কয়েক হাজার ইহুদিকে ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবার কাছে জড়ো করতে সমর্থ হয়। ১৯৯১ সালের অপারেশন শেবা শেষ হওয়ার ছয় বছরের মাথায় ইথিওপিয়ার ইহুদিদের জন্য অলৌকিক ঘটনা ঘটে। শুরু হয় অপারেশন সলোমোন।

ইথিওপিয়ার গৃহযুদ্ধকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহীরা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আদ্দিস আবাবার দিকে আসতে শুরু করে। এ সময় যুক্তরাষ্ট্রের সমঝোতায় ইসরাইল ও শাসক মারিয়ামের মধ্যে একটা চুক্তি স্বাক্ষর হয়। এর কিছু পরেই মারিয়াম ক্ষমতাচ্যুত হন।

এই চুক্তির পেছনে এক রহস্যমানবের ভূমিকা ছিল মুখ্য। তার নাম ইউরি লুবরানি। ইরান ও লেবাননের বিশেষ দূত ছিলেন তিনি। চুক্তি হয় ইহুদিদের স্বদেশে ফিরিয়ে নিতে ইসরাইল ইথিওপিয়াকে ৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেবে। যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতি দেয় মারিয়াম সরকারের কয়েকজন শীর্ষ নেতাকে তারা আমরিকার রাজনৈতিক আশ্রয় দেবে। এদিকে ইসরাইলের সঙ্গে বিদ্রোহীদেরও একটা চুক্তি হয়। এ চুক্তি মোতাবেক বিদ্রোহীরা ৩৬ ঘণ্টা যুদ্ধবিরতি করবে এবং এই সময়ের মধ্যে ইহুদিদের ইসরাইলে ফেরত নিয়ে যাওয়া হবে। ইসরাইল ঐ সময়ের মধ্যেই তাদের লোকদের স্বদেশে ফিরিয়ে নিতে সক্ষম হয়।

সলোমোন অভিযান পরিচালনার মূল দায়িত্ব পায় ইসরাইলি সেনাবাহিনী। ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ জেনারেল আমনন লিপকিন ছিলেন কমান্ডার। ইসরাইলের এয়ারলাইন ইথিওপিয়ায় ৩০টি বিমান পাঠায়। বিমান বাহিনী পাঠায় বেশ কয়েকটি বিমান। গোয়েন্দা ইউনিট কিং ফিশারের একটি কমান্ডো বাহিনীকে ইথিওপিয়ায় পাঠানো হয়। এভাবে মাত্র ৩৪ ঘণ্টায় ১৪ হাজার চারশত ইহুদিকে ইসরাইলে আনা হয়। এই অভিযানের মাধ্যমে একটি নতুন বিশ্বরেকর্ডের সৃষ্টি হয়। বোয়িং ৭৪৭ এক হাজার ৮৭জন ইহুদিকে নিয়ে ইসরাইলের অভিমুখে রওয়ানা দিলেও বিমানবন্দরে একজন বেশি লোক পাওয়া যায়। সে একটি নবজাতক। বিমানেই তার জন্ম।

সলোমোন অভিযানের ২০ বছর পরেও ইথিওপিয়ায় বহু ইহুদি এখনো রয়ে গেছে। তাদের ফিরিয়ে আনতেও উদ্যোগ অব্যাহত। তবে নবাগত ইহুদিদের ইসরাইলের মাটিতে বসবাসে সমস্যা হচ্ছে। আগতরা অধিকাংশই আফ্রিকার গ্রাম থেকে উঠে আসা। অথচ ইসরাইল একটা আধুনিক রাষ্ট্র। ওদিকে কতিপয় ধর্মীয় নেতা এখনো দাবি করে চলেছেন, ইথিওপিয়ার ইহুদিরা প্রকৃত নয়।

শুরুতে যে জার্নি সংটি গীত হচ্ছিল তার শেষাংশ ছিল এরকম: চাঁদের মধ্যে আমার মায়ের মুখটি আমার দিকে তাকিয়ে। মা, হারিয়ে যেও না। মা যদি আমার পাশে থাকে, তাহলে সেই আমাকে ভাবতে বাধ্য করবে যে, আমি একজন ইহুদি।

কোথায় ইয়েসেলি?

১৯৬২ সালের মার্চের প্রথমার্ধে ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ-প্রধান আইসার হারেলকে ডেকে পাঠান ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেন গুরিয়েন। বৃদ্ধ গুরিয়েন আইসারকে তার অফিসে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান এবং বেশ কিছুক্ষণ খোশগল্পে মেতে উঠেন। মোসাদ-প্রধান ভাবতে থাকেন, এই বুড়ো প্রধানমন্ত্রী তার কাছে কী চান। আইসার তাকে খুব ভালোভাবেই জানতেন। এই খোশগল্প করতে তাকে যে ডাকা হয়নি আইসার তা ভালোভাবেই জানতেন। এরা দু'জনই দু'জনকে খুব ভালোবাসেন, পছন্দ করেন। তাদের মন-মানসিকতাও একই ধরনের। এরা দু'জনই আকৃতিতে ছোট-খাট কিন্তু ভীষণ একগুঁয়ে এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে দক্ষ ও বলিষ্ঠ। নেতৃত্বদানের ক্ষমতাও এদের সহজাত। আর ইসরাইলের নিরাপত্তার প্রশ্নে এরা আপোষহীন। আজে-বাজে কাজে সময়ক্ষেপণও এদের অপছন্দ। সম্প্রতি আইচম্যানকে আটকের পর এদের সম্পর্ক আরও প্রগাঢ়।

আলোচনায় মাঝপথে ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী গুরিয়েন আইসারের দিকে ঘুরে প্রশ্ন করেন, আপনি কি শিশুটিকে উদ্ধার করতে পারবেন?

প্রধানমন্ত্রী কোন শিশুর উদ্ধারের কথা বলছেন তা আইসারের কাছে উল্লেখ না করলেও আইসারের বুঝতে বাকি থাকল না। কেননা দু'বছর ধরে একটি শিশুর অন্তর্ধান বা নিখোঁজ হওয়া নিয়ে ইসরাইলে প্রচণ্ড আলোড়ন চলছিল। ইসরাইলের পত্রিকাগুলো এই শিশুকে নিয়ে যেমন নিয়মিত শিরোনাম করে চলেছে, তেমনি সে দেশের আইনসভা নেসেটেও এনিয়ে প্রবল অসন্তোষ বিরাজ করছিল। সেক্যুলার তরুণরা ইয়েসেলির প্রসঙ্গ উঠলেই আল্ট্রা অর্থোডক্স ইহুদিদের প্রতি ইংগিত করে ক্রোধ ও উদ্বেগ প্রকাশ করত। কোথায় ইয়েসেলি এই শ্লোগান ঐ অর্থোডক্স ইহুদিদের প্রতি লক্ষ্য করে তরুণরা প্রতিনিয়তই শ্লোগান দিত।

ইয়োসেলির বয়স ৮ বছর। হোলেনি শহরে ছিল তার বাস। তাকে অতি আধ্যাত্মিক ঘরানার ইহুদি অর্থাৎ আল্ট্রা অর্থোডক্স ইহুদিরা অপহরণ করেছে। আর এই অপহরণের নেতৃত্ব দিয়েছেন ইয়েসেলির পিতামহ। ইয়েসেলির বৃদ্ধ নানার ইচ্ছা, আল্ট্রা অর্থোডক্স ঐতিহ্যে তার নাতিকে বড় করে তোলার। সেই মানসিকতায় তিনি ইয়েসেলিকে তার বাবা-মায়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন। এরপর থেকেই ইয়েসেলি লাপাত্তা, কোনো খোঁজ মিলছে না তার। এক পর্যায়ে ইয়েসেলির নিখোঁজ হওয়াকে কেন্দ্র করে সারা ইসরাইল জুড়ে নানা

জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে যায়। পারিবারিক এই বিষয়টি ইসরাইলের জাতীয় ইস্যু ও স্ক্যান্ডালে পরিণত হয়। পক্ষ-বিপক্ষের লোকেরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে থাকে। সেক্যুলার ইহুদি ও আল্ট্রা অর্থোডক্স ইহুদিদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা বেশি বেশি করে ঘটতে থাকে। অনেকে ইয়েসেলিকে কেন্দ্র করে ইসরাইলে গৃহযুদ্ধ বেঁধে যাওয়ারও আশংকা করেন। ঠিক এমনিতরো অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী বেন গুরিয়েন মোসাদ-প্রধান আইসার হারেলকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

আইসার প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, আপনি এ কাজে আমাকে চাইলে আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি। আইসার অতঃপর নিজের অফিসে আসেন এবং নিখোঁজ ইয়েসেলির নামে একটা ফাইল খোলেন। তিনি এই ফাইলের নাম দেন অপারেশন টাইগার কাব।

ইয়েসেলি এককথায় সুদর্শন প্রাণবন্ত এক শিশু। কিন্তু তার নানা নাহমান সাতারকেসের বিশ্বাস শিশুটি ভুল বাবা-মায়ের কাছে মানুষ হচ্ছে। কৃশকায় শ্মশ্রুমন্ডিত চশমা পরিহিত বৃদ্ধ নানা নাহমান হাসিদ সম্প্রদায়ের এক ধর্মান্ধ অনুরাগী। হাসিদ মতবাদের তিনি যেমন ঘোর সমর্থক তেমনি মতবাদের ব্যাপারে তিনি আপোষহীন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নানা নাহমান বরফে ঢাকা সাইবেরিয়ায় বেশ কিছু সময় কাটিয়েছেন। সেখানে তিনি সোভিয়েত শ্রম শিবিরে ছিলেন। কেজিবি'র সহযোগী গুণ্ডাদের তিনি পাত্তা দেননি। ফলে এই লোককে দমানো খুব কঠিন। সাইবেরিয়া বসবাসকালে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় তার পায়ের তিনটি আঙ্গুল খসে পড়লেও তার মানসিক শক্তি বরাবরই অবিচল ছিল। সাইবেরিয়ায় তিনি একটি চোখও হারান। সোভিয়েত ইউনিয়নকে তিনি মনে-প্রাণে প্রচণ্ড ঘৃণা করেন। সোভিয়েতদের প্রতি তার ঘৃণা চরম আকার ধারণ করে ১৯৫১ সালে। তার এক ছেলেকে গুণ্ডারা ছুরিকাহত করে মেরে ফেললে তার ঘৃণা চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। বাকি দুই ছেলে শালোম ও ওভাদিয়া এবং মেয়ে আইডা তার বেঁচে থাকার অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। আইডা এক দর্জিকে বিয়ে করে।

আইডা দম্পতি তার বাবার পুরনো বাড়ি লভোভে বেশ কিছুদিন বসবাস করে। রাশিয়া এবং পোল্যান্ডে কাটিয়ে তারা লভোভে বসবাস শুরু করে। ১৯৫৩ সালে এই দম্পতির দ্বিতীয় সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এই শিশুটিই ইয়োসেলি।

ইয়োসেলির বয়স যখন চার বছর তখন বাবা মা'র সঙ্গে সে ইসরাইলে চলে আসে। আইডা'র বাবা-মা অর্থাৎ নাহমান সাতরাকেস তার পত্নী এবং তাদের এক ছেলে শালোম আইডাদের নিয়ে কিছুদিন আগে ইসরাইলে চলে আসে।

নাহমান ব্রেসলাড হাসিদিম গোত্রভুক্ত। তারা মিয়া শেয়ারিম এলাকায় সেটল করে। এই এলাকাটি জেরুজালেমের আলট্রা অর্থোডক্স এলাকা হিসেবে ব্যাপক পরিচিত। এই এলাকাটি অন্য অঞ্চল থেকে ভিন্নতর। এখানকার পুরুষরা লম্বা কালো কোট অথবা সিল্কের কাফতান বা ঢোলা জামা পরিধান করে। কালো অথবা পশমি টুপি তাদের থাকবেই। দাড়ি রাখে ঝোপঝাড়ের মতো। মেয়েদের পোশাক হয় পরিপাটি। তবে তাদের চুল হয় পরচুলা অথবা স্কার্ফ দিয়ে ঢাকা থাকে। ইয়েসিভালদের জগৎ এটি। প্রতিবেশীদের অধিকাংশই ইহুদি আইনজ্ঞ কিম্বা দরবেশ মানসিকতার। এদিকে শালোম একটা ইয়েসিভায় যোগদান করে এবং তার সহোদর ওভাদিয়া ইংল্যান্ডে চলে যায়।

আইডা এবং তার স্বামী অল্টার হোলোনোয় সেটেল করে। তেলআবিব এলাকায় একটা টেক্সটাইল কারখানায় অল্টারের চাকরি হয়। এক ফটোগ্রাফার আইডাকে কাজ দেয়। এক পর্যায়ে আইডা দম্পতি একটা ছোট ফ্ল্যাট কিনে জীবনযুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। ইতিমধ্যে এই দম্পতি ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়লে তারা তাদের প্রথম মেয়েসন্তান জিনাকে একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দেয়। আর ইয়েসেলি তার নানা-নানীর কাছে থাকতে শুরু করে।

জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত আইডা এবং তার স্বামী কাশিয়ার তার বন্ধুদের কাছে একের পর এক চিঠি লিখতে থাকে। এসব চিঠিতে তাদের ইসরাইলে চলে আসা সমীচীন হয়নি বলে উল্লেখ করা হতে থাকে। আইডা ও স্বামীর কাছে প্রেরিত রাশিয়ার বন্ধুদের চিঠিগুলো তার বাবা নাহমানের হস্তগত হতে থাকে। নাহমান উপলব্ধি করেন যে, তার মেয়ে আইডা ও জামাতা অল্টার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে অবশ্যই রাশিয়ায় পাড়ি দেবে। ক্রোধান্বিত ও উদ্বেগাকুল নাহমান অতঃপর সিদ্ধান্ত নেন ইয়েসেলিকে কোনোমতেই তিনি তার বাবা-মার কাছে ফেরত দেবেন না।

১৯৫৯ সালের শেষার্ধে আইডা দম্পতির আর্থিক অবস্থা ভালো হয়। অতএব পুরো পরিবার আবার একত্রিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তারা। আইডা জেরুজালেমে তার বাবার বাড়িতে আসে ইয়েসেলিকে নিয়ে যেতে। কিন্তু ইয়েসেলি এবং তার বাবা কাউকেই সে বাসায় পায় না। আইডা'র মা তাকে জানায় তার ভাই শালোম ছেলে ইয়েসেলিকে তার কাছে পৌছে দেবে। আইডা'র মা তাকে জানায় যে, ইয়েসেলি তার নানার সঙ্গে একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে গেছে এবং তাদের এখন বিরক্ত করা ঠিক হবে না।

পরের দিন শালোম তার বোন আইভার বাসায় গিয়ে জানায় যে, তার বাবা

নাহমান কিছুতেই ইয়েসেলিকে তাদের কাছে ফেরত দেবে না। বিপর্যস্ত আইডা তার স্বামীকে নিয়ে জেরুজালেমে এসে কয়েকদিন বাবার বাড়িতে কাটায়। সে সময় ইয়েসেলি সেই বাসাতেই ছিল। শনিবার বিকেলে যখন তার সন্তানকে নিয়ে নিজেদের বাসায় চলে যাবে তখন আইডা'র মা বলে, বাইরে খুব ঠাণ্ডা। ইয়েসেলি রাতটা এখানেই কাটাক। সকালে আমি ওকে দিয়ে আসব। আইডারা এতে রাজি হয় এবং ছেলেকে কম্বল দিয়ে চলে যায়। আইডা দম্পতি কি জানত, এই ছেলেকে আবার ফিরে পেতে তাদের কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হবে?

পরের দিন ইয়েসেলি এবং তার নানী আইডাদের বাড়িতে আর যায়নি। আইডা এবং তার স্বামী জেরুজালেমে ছুটে এসেও তাদের খুঁজে পায়নি। ছেলেটি তাহলে ভ্যানিশ হয়ে গেছে! এদিকে ইয়েসেলির নানা-নানী কোনোমতেই নাতিকে দেবে না বলে জানিয়ে দেয়। কাঁদতে থাকে আইডা। কিন্তু তাতেও কোনো ফল হয় না। ছেলেকে হারিয়ে ফেলল আইডা। আইডা এবং তার স্বামী ছেলেকে নিতে এরপর বহুবার তার বাবার বাড়িতে গেছে। কিন্তু কোনো লাভ না হওয়ায় ১৯৬০ সালে তারা আদালতে যায়। আইডা তার বাবা নাহমানের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করে। তেল-আবিবের আদালতে আইডা মামলা করে। নাহমানরা এই মামলার কোনো জবাব দেয় না। শুরু হয় ইয়েসেলিকে নিয়ে বাবা-মেয়ের যুদ্ধ।

জানুয়ারির ১৫ তারিখে সুপ্রিম কোর্ট ত্রিশ দিনের মধ্যে নাহমানকে নির্দেশ দেয় ইয়েসেলিকে ফেরত দিতে। তাকে আদালতে হাজির হওয়ারও নির্দেশ দেয়। দুদিন পরে নাহমান আদালতকে জানায় যে, ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য তার পক্ষে আদালতে হাজির হওয়া সম্ভব নয়।

১৭ ফেব্রুয়ারি আইডা তার বাবার বিরুদ্ধে পুলিশে মামলা করে গ্রেফতারের দাবি করে। ছেলেকে কাছে না পাওয়া পর্যন্ত তাকে বন্দি করে রাখারও আর্জি করা হয়। এদিকে সুপ্রিম কোর্ট ইয়েসেলিকে খুঁজে বের করতে পুলিশকে নির্দেশ দেয়। দশ দিন পর পুলিশ ইয়েসেলিকে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। ৭ এপ্রিল পর্যন্ত পুলিশ ইয়েসেলিকে খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয় এবং এই অনুসন্ধান থেকে তাদের অব্যাহতি দেয়ার জন্য সুপ্রিম কোর্টকে অনুরোধ করে।

১২ মে সুপ্রিম কোর্ট এক আদেশে ইয়েসেলির নানাকে গ্রেফতার ও অনুসন্ধান অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেয়। পরদিন নাহমান গ্রেফতার হয়। নাহমানকে গ্রেফতার করেও কোনো লাভ হয় না। সে একটি কথাও স্বীকার করেনি।

এতে অবশ্য একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, নাহমান পরিবার নিজেদের থেকে নাতি

ইয়েসেলিকে লুকিয়ে রাখেনি। আল্ট্রা অর্থোডক্স ইহুদিদের একটা নেটওয়ার্ক ইয়েসেলিকে লুকিয়ে ফেলেছে এবং তারা পুলিশকে প্রতারিত করছে। তারা যে অলঙ্ঘনীয় নীতি গ্রহণ করেছে তা হল, কোনোমতেই যেন ইয়েসেলিকে তার বাবা মা রাশিয়ায় নিয়ে গিয়ে তাকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করতে না পারে তা ব্যর্থ করে দেয়া। অবশ্য ইয়েসেলির নানা নাহমানই হয়তো এ রকম ধারণা দিয়েছে ইহুদিদের ঐ গোত্রগত নেটওয়ার্ককে। মজার ব্যাপার হল, জেরুজালেমের রাব্বি সম্প্রদায়ের প্রধান রাব্বি ফ্রাঙ্ক ইয়েসেলির নানার পক্ষে একটি বিবৃতি দেন। ঐ বিবৃতিতে তিনি অর্থোডক্স কমিউনিটিকে নাহমানকে সর্বতোভাবে সহযোগিতারও আহ্বান জানান।

১৯৬০ সালের মে মাসে ইসরাইলের সংসদ নেসেটে এই বাচ্চা হারানোর বিষয়টি এজেন্ডাভুক্ত করে তুমুল আলোচনা হয় এবং সাংবাদিকদের জন্য এ দিনটি ব্যস্ততম দিন হিসেবে পরিগণিত হয়। সংসদে ধর্মীয় দলগুলোর প্রতিনিধিরা এ নিয়ে ব্যাপক গোলযোগও করেন। সংসদ সদস্য লরেঞ্জ বলেন, বাচ্চা হারানোর বিষয়টি ঘিরে ইসরাইলে যুদ্ধ লাগার উপক্রম হয়েছে। তিনি নানা নাহমান ও তার মেয়ে আইডা'র মধ্যস্থতাকারী হওয়ারও প্রস্তাব করেন। সংসদ সদস্য লরেঞ্জ জেলখানায় নাহমানের কাছে একটা চুক্তিনামা পাঠান। সেখানে লেখা ছিল শিশুটিকে ফেরত দেয়া হলে তাকে অর্থোডক্স অনুগামী নাহমান অতঃপর এই বলে সম্মতি দেন, যদি এ কাজে তাদের অন্যতম প্রধান ধর্মগুরু অর্থাৎ রাব্বি মেইজিম যদি তাকে আদেশ দেন তাহলে চুক্তিতে তিনি রাজি আছেন।

লরেঞ্জ দ্রুততার সঙ্গে জেরুজালেমে পৌঁছে ঐ রাব্বির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রাব্বি মেইজিম ধারণা দেন যে, যদি অপহরণকারীর বিরুদ্ধে কোনো মামলা না হয় তাহলে তিনি এই চুক্তিতে সম্মতি দিতে রাজি আছেন।

সংসদ সদস্য লরেঞ্জ পুলিশ প্রধান জোসেকের কাছে ছুটে যান। পুলিশ প্রধান সম্মতি দেন যে, মামলা হবে না। গ্যারান্টেড। তিনি তার গাড়ি সাংসদ লরেঞ্জকে এগিয়ে দেন। এ-ও বলেন, সংসদ সদস্য হিসেবে আপনার অনেক অগ্রাধিকার রয়েছে। আপনি এই গাড়ি নিয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো সন্দেহও করবে না। আপনি শিশুটিকে নিয়ে আসুন।

খুশিমনে লরেঞ্জ ফিরে আসেন রাব্বি মেইজিসের কাছে। কিন্তু রাব্বি ইতিমধ্যে তার মন পরিবর্তন করেছেন। লরেঞ্জ ফিরে আসেন ভগ্ন হৃদয়ে। তিনি ধারণা করেন শিশুটিকে সম্ভবত কোনো ধর্মীয় কমিউনিটিতে কিম্বা কোনো অর্থোডক্স

গ্রামে লুকিয়ে রাখা হয়েছে কিম্বা কোনো স্কুলে। কিন্তু রাব্বিদের নীরবতার দেয়াল ভাঙা কঠিন এবং মিশনটি হয়ে উঠল ইমপসিবল।

১৯৬১ সালের ১২ এপ্রিল অপহৃত শিশুর নানা নাহমান ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে জেল থেকে ছাড়া পান। তবে তিনি তার নাতিকে খুঁজে পেতে সাহায্য করবেন বলেও প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু তিনি তার কথা না রাখলে সুপ্রিম কোর্ট আবার তাকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেয়। সুপ্রিম কোর্ট শিশুর অপহরণকে দঃখজনক ও জঘন্য কাজ বলে উল্লেখ করে। ১৯৬১ সালের আগস্টে ইয়েসেলির উদ্ধারে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হলে তারা সর্বত্র লিফলেট বিতরণ ও জনসভা করে। কয়েক হাজার মানুষ ইয়েসেলিকে উদ্ধারের পক্ষে দরখাস্ত করে। দুই সংস্কৃতির যুদ্ধ ও বিরোধের ছায়া ইসরাইলিদের আকাশকে মেঘাচ্ছন্ন করে ফেলে।

১৯৬১ সালের আগস্টে পুলিশ হাসিদিকদের গ্রাম কোমেমিউটে অভিযান চালায়। ইয়েসেলিকে অবশ্য এই গ্রামে দেড় বছর আটকে রাখা হয়েছিল। ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরে ইয়েসেলির মামা শালোম তাকে এখানে নিয়ে এসে জালমান কট নামের এক লোকের বাড়িতে রাখে। তখন ইয়েসেলির নাম দেয়া হয়েছিল ইসরায়েল হাজাক।

ইতিমধ্যে শিশুটির মামা শালোম দেশ ছেড়ে লন্ডনে স্থায়ীভাবে চলে যায়। লন্ডনে হাদিসিক সম্প্রদায়ের লন্ডনের গোল্ডরাস গ্রিনে যে এলাকা রয়েছে সেখানে সে বসতি গাড়ে। ইসরাইলি পুলিশের নির্দেশে ব্রিটিশ পুলিশ লন্ডনে শালোমকে গ্রেফতার করে। ঐ সময়ই তার প্রথম সন্তান কালমানের জন্ম হয়। শিশু কালমানের খতনা সম্পন্ন করার জন্য তাকে তার বাবা শালোমের জেল খানায় নেয়া হয়।

কিন্তু ইয়েসেলির কোনো সন্ধান নেই। কারো কারো ধারণা তাকে বিদেশে পাচার করা হয়েছে অথবা অসুস্থতায় সে মারা গেছে। এদিকে সারা দেশে পুলিশ হাসির পাত্রে পরিণত হয়। পুরো ইসরাইল জুড়ে সেক্যুলার ও অর্থোডক্স ইহুদিদের মধ্যে লাগাতার সংঘর্ষ বেধে যায়।

ইয়েশিভার ছাত্রদের পথচারীরা রাস্তায় ধরে পেটাতে শুরু করে। সেক্যুলার তরুণরা অর্থোডক্স তরুণদের দেখলেই চিৎকার করে বলে উঠে, কোথায় ইয়েসেলি? পুরো ইসরাইল জুড়ে এই তাণ্ডব। ওদিকে ইসরাইলের সংসদে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় চলছেই।

মোসাদ-প্রধান আইসার যখন প্রধানমন্ত্রীর কাছে ইয়েসেলিকে খুঁজে বের করে

দেয়ার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন তখন তিনি কল্পনাও করতে পারেননি; তার ক্যারিয়ারের একটা জটিলতম অধ্যায় হয়ে উঠবে এটি। আইসার হারেল অভিযানের কোনো ব্যাপারে তার স্ত্রীর সঙ্গে কখনো আলোচনা করেননি। কিন্তু শিশু অপহরণের ব্যাপারটি আলাপ না করে পারলেন না। স্ত্রীকে বললেন, সরকার এবার খুব বেকায়দায় পড়েছে।

এদিকে আইসারের অন্যতম সেরা গোয়েন্দা অব্রাহাম সালোম বললেন অন্যকথা। তার ভাষায় আইসার প্রমাণ করতে চান, পুলিশ যেখানে ব্যর্থ সেখানে তিনি সফল হবেনই।

পুলিশ প্রধান আইসারকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কী মনে করেন শিশুটিকে খুঁজে বের করা আদৌ সম্ভব হবে? সাবাক পুলিশ প্রধান এবং আইসারের ঘনিষ্ঠ সহযোগী আমোক ম্যানোর এই অভিযানের বিরোধী ছিলেন বরাবরই। মোসাদ ও সাবাকের সিনিয়র কর্মকর্তারাও অনুরূপ ধারণা পোষণ করতেন। তাদের ভাষ্য, শিশু খুঁজে বের করার দায়িত্ব মোসাদের মতো মর্যাদাবান সংগঠনের হতে পারে না। ইসরাইলের নিরাপত্তা দেখাই মোসাদের কাজ। প্রকৃতপক্ষে আইসার ছাড়া কোনো পর্যায়ের গোয়েন্দারাই মনে করেন না যে, ইহুদি রাষ্ট্রের সুনাম সংরক্ষণও তাদের দায়িত্বেরও অংশ। তবে সমস্যা হল, আইসার যখন মন স্থির করে ফেলেছেন, তদন্তটি তিনি চালাবেন তখন তাকে বাধা কে দেবেন? কেননা তার কর্তৃত্বই চূড়ান্ত।

আইসার ও তার সহযোগীরা সাবাকের সেরা গোয়েন্দাদের নিয়ে ৪০ সদস্যের একটি টাস্কফোর্স গঠন করলেন। তথাকথিত ধর্মীয় নেতারা এমনকি সুশীল সমাজের কেউ কেউ স্বেচ্ছায় এই অভিযানে শরিক হতে আগ্রহী হলেন। অর্থোডক্স সমাজের স্বেচ্ছাসেবীরা অনুধাবন করলেন যে, ইয়েসেলির অপহরণ জাতিকে একটা বিপজ্জনক পর্যায়ে ফেলে দিয়েছে। যাহোক, তাদের প্রথম অভিযান নিদারুণভাবে ব্যর্থ হল। প্রথম অভিযানটি করা হয়েছিল অর্থোডক্সদের একটি দুর্গে। কিন্তু অভিযানের পর তারা উপহাসের পাত্রে পরিণত হলেন। আইসারের গোয়েন্দাদের ভাষ্য ছিল, আমরা যেন মঙ্গলগ্রহে অবতরণ করেছি।

আইসার খুবই সতর্কতার সঙ্গে ইয়েসেলির ফাইলটা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। প্রত্যেকটি তথ্য একাধিকবার পড়তে লাগলেন। কিন্তু ইসরাইল জুড়ে শিশুটির অস্তিত্বের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। মোসাদ-প্রধান আইসার-ভাবনার পরিণতি টানলেন এভাবে যে, শিশুটিকে দেশের বাইরে পাচার করা হয়েছে। বিদেশে নিয়ে যাওয়া হলে সেটা কোনো দেশ?

একটা ছোট্ট নিউজে চোখ আটকে গেল আইসারের। ১৯৬২ সালের মধ্য মার্চে হাসিদিক ইহুদিদের বিরাট একটি দল সুইজারল্যান্ড থেকে ইসরাইলে এসেছিলো। রাব্বিদের এক শ্রদ্ধাভাজন গুরুর অন্তোষ্টিক্রিয়ায় এসকর্ট হিসেবে যারা এসেছিল তাদের মধ্যে নারী-পুরুষ ছাড়া শিশুরাও ছিল। ঐ রাব্বি গুরুকে হলি ল্যান্ডে সৎকার করা হয়। আইসারের কেন জানি মনে হল মরদেহ সৎকারের ব্যাপারটি ছিল আইওয়াশ। দলটি কয়েক সপ্তাহ পরে সুইজারল্যান্ডে ফিরে যাওয়ার সময় ইয়েসেলিকে নিয়ে গেছে। নিয়ে যাওয়ার জন্যই এই বাহানা। আইসার বিমানবন্দরে তার লোক নিয়োগ করলেন এবং জুরিখে তার একটি টিম পাঠালেন আব্রাহাম শালোমের নেতৃত্বে। হাসিদিকরা সেখানে ফিরে গিয়ে কী করছে তা দেখার জন্য। মোসাদ গোয়েন্দারা শিশুদের বোর্ডিং স্কুলে পর্যন্ত গোপন তল্লাশি চালায়। রাতের বেলা লুকিয়ে বোর্ডিংয়ের বারান্দা প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করে। বলতে গেলে প্রতিটি শিশুকে তারা অবলোকন করে। একটা জঙ্গলের মাঝখানে ছিল ইয়েসিভাদের স্কুল। আব্রাহাম শালোমের ভাষায়, ইয়েসেলির বয়সী সব ছেলেকে লুকিয়ে জানালা দিয়ে পরীক্ষা করেছি। কেননা, আমাদের ধারণা ছিল হয়তো তাকে ছদ্মবেশ ধারণা করে রাখা হয়েছে। এক সপ্তাহ রাতের অভিযান চালিয়ে আব্রাহাম আইসারকে জানান যে, সুইস শিশুদের মধ্যে নিশ্চিতভাবেই ওখানে ইয়েসেলি নেই।

আইসার নিজেই অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন। তিনি তার হাতের কাজ অন্যদের ওপর ন্যস্ত করলেন। প্যারিসে তিনি সাময়িকভাবে প্রধান কার্যালয় স্থানান্তরিত করলেন এবং বিশ্বব্যাপী গোয়েন্দাদের ছড়িয়ে দিলেন। তার গোয়েন্দারা ফ্রান্স, ইটালি, সুইজারল্যান্ড, বেলজিয়াম, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকায় গোয়েন্দাগিরি শুরু করল। অর্থোডক্সদের সমাজ ও ইয়েসিভাগুলো বিশ্বব্যাপী যেখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে সর্বত্রই লোক লাগানো হল। জেরুজালেম থেকে এক তরুণ অর্থোডক্স ইহুদি সুইজারল্যান্ডের একটা বিখ্যাত ইয়েসিভায় আসল। সে একজন পণ্ডিত সাজল এবং একজন নামি শিক্ষকের অধীনে অধ্যয়ন করবে বলে ওদেরকে জানাল। লন্ডনে গিয়ে উপস্থিত হল ইয়েডিথ নিশিইয়াহু নামের এক মহিলা গোয়েন্দা। এই ভদ্রমহিলা আইসারের অন্যতম সেরা গোয়েন্দা। আইচম্যানকে ধরে আনার ক্ষেত্রে সে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ইয়েডিথ একজন ধর্মপ্রাণ মহিলা। সে লন্ডনে এসেছে অপহৃত শিশুটির মামা শ্যালোমের শাশুড়ির চিঠি নিয়ে। এই চিঠি নিতে বা আস্থা অর্জনে তাকে কম কাঠখড় পোহাতে হয়নি। শ্যালোমের পরিবার

লন্ডনে তাকে তাদের বাসায় হাউজগেস্ট হিসেবে থাকার আমন্ত্রণ জানায়। তারা অবশ্য এই ভালো মহিলা যে গোয়েন্দা তা জানতে পারেনি।

লন্ডনে ইয়েডিথই একমাত্র গোয়েন্দা ছিল না। সাতমার গোত্রের আল্ট্রা অর্থোডক্স হাসিদিকদের একটা গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হল লন্ডন। রোমানিয়ার সাতুমারে গ্রামের নামানুসারে এই গোত্রের নামকরণ করা হয়। কেননা ঐ গ্রাম থেকেই এই গোত্রের উৎপত্তি।

মোসাদ-প্রধান আইসার লন্ডনে হাসিদিকদের আবাসিক এলাকায়ও তার গোয়েন্দা নিয়োগ করেন। আরেকটি টিমকে পাঠানো হয় আয়ারল্যান্ডে। এক গোয়েন্দা অবহিত হল যে, ধর্মপ্রাণ এক দম্পতি সম্প্রতি আয়ারল্যান্ডে একটা বিচ্ছিন্ন বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। মোসাদ গোয়েন্দারা ভাবল, এই বাড়ি হয়তো ইয়েসেলির নতুন ঠিকানা হয়েছে। তারা ঐ বাড়িতে অভিযান চালানোর জন্য পাশেই বাড়ি ভাড়া করল, জাল কাগজপত্র তৈরি করল। কিন্তু এখানেও তাদের অভিযান ব্যর্থ হল। তাদের ভাষআয়াল্যান্ডের ধর্মপ্রাণ দম্পতি প্রকৃত অর্থেই ধার্মিক। তারা আয়ারল্যান্ডে ছুটি কাটাতে এসেছে। জাঁদরেল মহিলা গোয়েন্দাও অপহৃত শিশুর মামার বাড়ি থেকে কোনো তথ্যসূত্র উদ্ধার করতে পারল না। সুইজারল্যান্ডে নিয়োগকৃত গোয়েন্দাও খালি হাতে ফিরল। সারা বিশ্ব থেকেই অপহৃত শিশুর ব্যাপারে নেতিবাচক খবর আসতে থাকল। কোথাও নেই সে।

আইসারের গোয়েন্দা বাহিনীর সঙ্গে ভয়াবহ একটা ঘটনা ঘটে গেল লন্ডনের সাতমার হাসিদিকে। ইয়েশিভার স্মার্ট বেশ কয়েকজন তরুণ স্টামফোর্ড হিল এলাকায় আইসারের গোয়েন্দাদের প্রায় ঘিরে ফেলল। তারা চিৎকার করে বলতে লাগল, ইহুদিবাদীরা এখানে ঢুকে গেছে। আস তোমরা। ইয়েসিলে এখানেই আছে। তরুণরা লন্ডন পুলিশকেও খবর দিল। আইসারের কয়েকজন কর্মকর্তা অবশ্য গোয়েন্দাদের ব্রিটিশ রাণির জেলখানা ঢোকা থেকে মুক্ত করতে সমর্থ হল।

আইসারের সব মিশনই ব্যর্থ। ব্যর্থ গোয়েন্দারা আইসারকে অভিযান বন্ধ করে দিতে বলল। আরও বলল, আপনি খড়ের গাদায় সুচ খুঁজছেন। ঐ বাচ্চাকে পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু মোসাদ-প্রধান আইসার নাছোড়বান্দা। তিনি আশাবাদী। অবশ্যই নিখোঁজ শিশুটিকে তিনি উদ্ধার করে ছাড়বেন।

আইসার প্যারিসের মোসাদ-প্রধান ইয়াকোভ কারুণকে ডেকে পাঠালেন। তার জন্ম রোমানিয়ায়। গণহত্যা কালে কারুজ তার বাবা-মাকে হারিয়েছেন। জেরুজালেমে হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকেই তিনি গোয়েন্দাগিরি ও

ইসরাইলের নিরাপত্তা বিষয়গুলো দেখভালের সঙ্গে যুক্ত। কারুজকে দেখলে একজন বুদ্ধিজীবীর মতো মনে হয়। তিনি মোসাদের বৈদেশিক সম্পর্ক বিভাগের সাবেক প্রধান। বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হত তাকে। ইসরাইলের সঙ্গে ইরান, ইথিওপিয়া, তুরস্ক এমনকি সুদানের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপনে তার অবদান রয়েছে। ফ্রান্স, ব্রিটিশ ও জার্মান সিক্রেট সার্ভিসের সঙ্গে তার বিশেষ দহরম-মহরম বিদ্যমান। মরক্কোর ভয়ংকর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেনারেল কুফকিরের সঙ্গে তার দুর্দান্ত সম্পর্ক। বাদশা কিং হাসানের সঙ্গে তিনি একবার মরক্কোতে গোপনে গিয়ে সাক্ষাৎও করে এসেছেন। ইথিয়পিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসিকেও তিনি সম্ভাব্য এক অভ্যুত্থান থেকে রক্ষা করেছেন। আলজেরিয়ায় অভিযানকালে জুলিয়েট্টে নামের এক মহিলার প্রেমে পড়ে তাকেই বিয়ে করেন। স্বল্পভাষী কারুজ নিপাট ভদ্রলোকও। স্যুট-টাই পরিহিত এই কারুজ একজন মাস্টার স্পাই। তাকে অবশ্য কখনো মাঠে কাজ করতে হয়নি। আইসারের কাছে তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা। ফ্রেঞ্চ ও ইংরেজি ভাষায় অনর্গল কথাও বলতে সিদ্ধহস্ত কারুজ।

আইসার সারাদিনই কাজে মগ্ন থাকেন। তিনি একটা হোটেল রুম ভাড়া নিয়েছেন সত্য কিন্তু দিন-রাত সর্বক্ষণই কাটান একটি এপার্টমেন্টে। এটিকেই তিনি অপারেশনাল সদর দফতর বানিয়েছেন। ঐ এ্যাপার্টমেন্টে তার জন্য একটা ফোল্ডিং খাটিয়া কেনা হয়েছে। জুনিয়াররা যার নাম দিয়েছে ইয়েসেলি বেড। মাঝে মাঝে কখনো তিনি কয়েক মিনিটের একটা দিবানিদ্রা ঐ খাটিয়ায় শুয়ে সারেন। গত কয়েক মাস ধরে যা ঘটেছে আইসার সারা ইউরোপ জুড়ে থাকা তার গোয়েন্দাদের চিঠি বা টেলিগ্রাম লিখছেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রাপ্ত রিপোর্ট দেখছেন, গোয়েন্দাদের সঙ্গে কথা বলছেন, নির্দেশনা দিচ্ছেন। হয়তো ভোররাতে অফিস ছেড়ে তিনি হোটেলে যান, গোসল করেন। আবার কিছুক্ষণের মধ্যে অফিসে চলে আসেন। এভাবে দিনের পর দিন চলতে থাকলে হোটেলের দ্বাররক্ষী অবাক বনে যায়। কাজের প্রতি নিষ্ঠা দেখে হোটেলের দ্বাররক্ষী শেষ দিকে হ্যাট নামিয়ে তার প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম জানাত।

এপ্রিলের এক সকালে মোসাদের কাছে একটা কৌতূহলোদ্দীপক রিপোর্ট এল। মেইর নামে এক অর্থোডক্স ইহুদি রিপোর্টের প্রেরক। মেইরকে পাঠানো হয়েছিল অ্যান্টওয়ার্প। এটি বেলজিয়ামে অবস্থিত। সেখানে সে এক গ্রুপ ধর্মীয় ডায়মন্ড ব্যবসায়ীর সন্ধান পেয়েছে। এই ব্যবসায়ীরা বৃদ্ধ রাব্বি ইটজিকেলের কথাকে যেমন আইন হিসেবে গণ্য করে তেমনি তাকে হলিম্যান

মনে করে। এই ডায়মন্ড ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিরোধ বাধলে তারা কোনো আদালতের শরণাপন্ন হয় না। তারা ঐ রাব্বির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে মনে করে এবং তার যে কোনো রায় মেনে নেয়। হাজার কোটি টাকার বিরোধ হলেও। এই রাব্বির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। ইউরোপের আধুনিক জীবনেও তারা এই বিশেষ গ্রুপটি প্রাচীন আমলের রীতি-নীতি মেনে চলে।

মেইর আরো জানতে পারে যে, রাব্বির ঐ অনুসারীরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাজিবিরোধী আন্ডারগ্রাউন্ড গ্রুপ হিসেবে কাজ করত। একই সঙ্গে গেস্টাপো বাহিনীর হাত থেকে বহু ইহুদিকে রক্ষা করেছে। যুদ্ধশেষেও তারা আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বিশ্বজুড়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে থাকে। ডায়মন্ড ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মেইর ক্যাথোলিক, স্মার্ট, স্বর্ণকেশী, নীলনয়না এক ফরাসি মহিলার কথা জানতে পেরেছে। যুদ্ধের সময় ঐ মহিলাও এদের সঙ্গে জড়িত ছিল এবং হিটলারের কবল থেকে বহু ইহুদিকে রক্ষা করেছে। মহিলা ব্যাপকভাবে রাব্বিদের মতবাদের অনুরক্ত হয়ে পড়ে এবং ইহুদিধর্মে নিজেকে দীক্ষিত করে। পরবর্তীতে ধর্মপ্রাণ অর্থোডক্সে নিজেকে উন্নীত করে। আন্ডারগ্রাউন্ডের জীবন মহিলাকে অনেক কিছু শিক্ষা দিয়েছে। সুন্দরী, দুঃসাহসী হিসেবে সে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। তার ব্যবসায়িক বুদ্ধিরও তুলনা হয় না। ফ্রান্সের পাসপোর্ট ব্যবহার করে অ্যান্টওয়ার্প গ্রুপের কাজে সে সারা বিশ্ব চষে বেড়িয়েছে। মেইয়ের ভাষায়, মহিলাটি এক কথায় হলি ওম্যান। মেইর জানিয়েছে, এই হলি ওম্যান ইসরাইলও সফর করেছে। প্রথম বিয়ের মাধ্যমে জন্ম দেওয়া পুত্র ক্লাউডেও ধর্মান্তরিত হয়েছে। সুইজারল্যান্ডের ইয়েশিভাসের প্রাক্তন ছাত্র ক্লাউডেও বর্তমানে জেরুজালেমের তালমুডিক স্কুলে পড়েছে। কিন্তু অ্যান্টগ্রুপের লোকজন এখন জানে না যে, এই দুর্দান্ত হলি ওম্যান এখন কোথায়।

মেইর প্রেরিত এই তথ্যাদি আইসারের মনের দিগন্ত যেন খুলে দিল। মেইরের রিপোর্টটি সাদামাটা বটে। কিন্তু আইসার এর মধ্যে কী যেন একটা পেলেন। এক মহিলার হাজারো চেহারা। নিশ্চয়ই এর সঙ্গে ইয়েসেলির ঘটনার কোনো যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। যদিও মেইরের রিপোর্টের মাধ্যমে মহিলার সঙ্গে ইয়েসেলির ঘটনার কোনো যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া বিরল। তবে আইসার নিশ্চিত অর্থোডক্স নেতাদের কাছে এরকম মহিলার গুরুত্ব থাকবেই। অর্থোডক্স নেতারা ইয়েসেলিকে পাচার করে থাকলে তার সঙ্গে এই মহিলার যোগসাজশ না থেকে পারে না।

আইসারের মনে এখন এই মহিলার কর্মকাণ্ড বড় করে দেখা দিল। তিনি অন্য

সব চিন্তা বাদ দিয়ে এই মহিলাকে নিয়ে নানা আঙ্গিকে ভাবতে লাগলেন। আইসার ইসরাইলে বিস্তারিত জানালেন এবং ঐ মহিলা ও তার ছেলে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিতে বললেন।

কয়েকদিনের মাথায় সেই টেলিগ্রামের উত্তর এল। ছেলের বর্তমান নাম এরিয়েল এবং সে ইসরাইলেই রয়েছে। এরিয়েলের মা কোথায় আছে কেউ তা জানে না। তার প্রকৃত নাম মেডেলিন ফেরাল্লিয়ে। কিন্তু ইসরাইলে তার নাম রুথ বেনডেভিড।

এসব তথ্যাদিতে আইসারের সদর দফতর ম্যাডেলিন সম্পর্কে অনেকখানি প্রকৃত তথ্য জানতে সমর্থ হল। মেডেলিন প্যারিসের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস ও ভূগোল নিয়ে পড়াশোনা করেছে। সহকর্মী সুদর্শন হেন্রীকে সে বিয়ে করে এবং বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পর পরই তাদের সন্তানের জন্ম হয়। যুদ্ধের সময় ম্যাডেলিন ম্যাকুইস রেসিসট্যান্ট গ্রুপে যোগদান করে। আন্ডারগাউন্ড কার্যক্রমে যুক্ত থাকার কারণে ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের ইহুদি গ্রুপ বিশেষ করে অ্যান্টওয়ার্প গ্রুপের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়। যুদ্ধ শেষে এদের কিছু লোকের সঙ্গে সে আমদানি-রফতানি ব্যবসাও শুরু করে।

১৯৫১ সালে সে স্বামী হেনরিকে তালাক দেয়। ক্ষুদ্র আলতাসান শহরের এক তরুণ রাব্বির সঙ্গে প্রেমলীলায় সে জড়িয়ে পড়ে। এই নিষ্ঠাবান রাব্বি ইসরাইলে স্থায়ীভাবে চলে আসতে আগ্রহী এবং সেখানেই তারা বিয়ে করবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। ইহুদি ধর্মে মহিলার দীক্ষা বা ঠিক ধর্মকে ভালোবেসে হয়নি। তার অনুগামীর প্রতি ভালোবাসা থেকেই এই ধর্মান্তর। ধর্মান্তরিত হয়েই ম্যাডেলিন অথবা রুথ বেন হেজাবি বনে যায়। তার স্বর্ণকেশ এ সময় ওড়না দিয়ে ঢাকা থাকত। সাজপোশাকে ব্যাপকভাবে আগ্রহী এই মহিলা অর্থোডক্স ইহুদিদের মতো সাদাসিধে পোশাক পরতে শুরু করে। কিন্তু ইসরাইলে এই প্রেমিকযুগলের সম্পর্কে ভাটা পড়ে। ঐ রাব্বি তাকে ছেড়ে চলে গেলে সে একাকী হয়ে যায়। হতাশ ও অবসাদগ্রস্ত এই মহিলা জেরুজালেমের সবচে বড় সন্ত্রাসী গ্রুপের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। রাব্বি নেতা মেইজিশের সঙ্গে তার বিশেষ সখ্যতা গড়ে উঠে। এই ধর্মীয় পরিমণ্ডলে এই মহিলা বেশ শ্রদ্ধা অর্জনে সক্ষম হয় এবং ফরাসি পাসপোর্টের কারণে জেরুজালেমের জর্ডান অংশে তার অবাধ যাতায়াতেও কোনো সমস্যা হয় না।

পঞ্চাশ দশকের শুরুতে মেডেলিন অথবা রুথ ফ্রান্সে ফিরে এসে ব্যাপকভাবে দেশ-বিদেশ সফর শুরু করে। মোসাদ এজেন্টরা জানতে পারে মেডেলিন

প্রায়ই প্যারিস সন্নিহিত মহিলাদের একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করত। কিন্তু তার কোনো স্থায়ী ঠিকানা ছিল না।

ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ আইসারকে মেডেলিন অথবা রুথের দু'বার ইসরাইল সফরের কথা জানায়। এ অবশ্য গত কয়েক বছরের মধ্যে। তার দ্বিতীয়বার সফর ঘটে ১৯৬০ সালের ২১ জুন। এই সময় ইসরাইলে তার ছোট্ট একটি মেয়েকে রেখে যায়। পাসপোর্টে এটি তার মেয়ে বলে সে উল্লেখ করে। কিন্তু কে এই মেয়েটি? মেডেলিন অথবা রুয়ের তো কোনো মেয়ে ছিল না। মোসাদ-প্রধান আইসার স্থির সিদ্ধান্তে এলেন এই বলে যে, মহিলাকে খুঁজে বের করাই তার প্রধান কাজ। তিনি সঠিক পথেই আছেন। ইয়াকোভ কারুজকে তিনি ঐ মহিলাকে ধরার নির্দেশ দিলেন।

প্যারিস সন্নিহিত এইক্সলেজ বেইনসে গিয়ে কারুজ মেডেলীন কিম্বা রুথকে জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক ও চেহারায় দেখতে পেলেন। গোয়েন্দাদের আরেকটি সূত্র লন্ডনের ধনী মণিমুক্তা ব্যবসায়ী জোসেফ ডোম্বের সঙ্গে ম্যাডেলিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা জানতে পারল। ডোম্বের সঙ্গে যে ধরনের গাড়িতে মেডেলীন বসা ছিল তা হাসিদিক গোত্রের কোনো মানুষের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ছিল না। আইসার ভালো করেই জানতেন, ডোম্ব হল ইসরাইল রাষ্ট্রের একজন শত্রু। ডোম্ব সাতমার হাসিদিক গোত্রের লোক এবং নিউইয়র্কের সাতমার রাব্বির বিশেষ আস্থাভাজন। নিউইয়র্কের সাতমার রাব্বিকে যদি পোপ বলা হয় সেক্ষেত্রে ডোম্ব হল আর্চ বিশপ। আইসারকে একজন বিশেষজ্ঞ এভাবেই বর্ণনা দিয়েছিলেন।

মোসাদ-প্রধান আইসার উপলব্ধি করলেন, তাকে এখন লন্ডনের দিকে নজর দিতে হবে। প্রথমত অপহৃত শিশুটির দুই চাচার বাস এখন লন্ডনে। ডোম্বের নেতৃত্বাধীন সাতমার সম্প্রদয় লন্ডনে খুব তৎপর। ফলে মেডোলন ইয়েসেলিকে ইসরাইল থেকে পাচার করে লন্ডনে নিয়ে এসেছে বলে আইসার স্থিরনিশ্চিত হলেন। ইউরোপ ও ইসরাইলের সাতমার হাসিদিকরা যৌথভাবে ইয়েসেলিকে অপহরণ করেছে। ডোম্ব এই অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছে। মেডেলিনের ফ্রান্সের পাসপোর্ট বিদ্যমান। সে সুন্দরী। প্রতিভাময়ী ও অভিজ্ঞ। মেডেলিন এই অপহরণে অবশ্যই সহযোগী ছিল এবং সে জানে ইয়েসেলি কোথায় আছে।

আইসারের এই সন্দেহ তাদের সহযোগী গোয়েন্দা সংস্থা সাবাকের এক গোয়েন্দা কনফার্ম করে। মেডেলিন তার ছেলেকে যেসব চিঠি লিখেছে তার মধ্যে ইয়েসেলিকে অপহরণের বিষয়ে কিছু আভাস-ইংগিতও ছিল।

আইসারের প্রয়োজন আরও খবর, আরও তথ্য। সাতমার হাসিডিমে তিনি আরও লোক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। এক মোসাদ গোয়েন্দা ফ্রেয়ার নামের এক খৎনাকারীকে খুঁজে পায়। ইহুদিদের নবজাতকদের ফ্রেয়ার খৎনা করে থাকে। বাচাল প্রকৃতির এই লোকটির আরাধ্য হল খাও দাও ফূর্তি কর জাতীয়। সে ডোম্বের খুব ঘনিষ্ঠ এবং ইয়েসেলি কোথায় আছে তা জানে বলে দাবি করে।

আইসার ফ্রায়েরকে প্যারিসে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেয়। মরক্কোর প্রিন্স সাজিয়ে তার কাছে লোক পাঠানো হয়। মরক্কোর কথিত প্রিন্স তাকে বলে যে, এক ইহুদি মেয়ের প্রেম পড়ে তাকে সে বিয়ে করেছে। বাড়িতে তারা ইহুদি মতে জীবন-যাপন করে বটে কিন্তু মরক্কোতে তা জানাজানি হলে তার পরিবার তাকে হত্যা করবে। এখন তাদের দম্পতির যে সন্তান হয়েছে তার খৎনা করতে তাকে প্যারিসে আসতে হবে। নবজাতক বাবা-মা'র সঙ্গে এখন প্যারিসে রয়েছে। রাব্বি ফ্রেয়ার যদি খৎনাটা করে দেয় বিরাট এমাউন্টের টাকা-পয়সাও কোনো সমস্যা হবে না।

ফ্রেয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয় এবং কয়েকদিনের মাথায় প্যারিসে আসে। মরক্কোর কথিত প্রিন্সের ফ্ল্যাটে আসার সঙ্গে সঙ্গে মোসাদ গোয়েন্দারা তাকে আটকে ফেলে। মৃত্যুভয়ে ভীত ফ্রেয়ার সব তথ্য দিতে সম্মত হয় কিন্তু যখন ইয়েসিলের প্রসঙ্গ উঠে সে তারস্বরে কোনো তথ্য দিতে পারবে না বলে জানায়।

প্রকৃতপক্ষে অবশেষে জানা যায় অপহৃত ইয়েসেলির ব্যাপারে সে কিছুই জানে না। হামবড়া ভাবের জন্যই সে ধরা পড়েছে। অতএব আইসারের অভিযান তৎপরতা আরেকবার দেয়ালের সঙ্গে বাড়ি খেল।

পক্ষান্তরে মোসাদ-প্রধান আইসারের আরেকটি গোয়েন্দা দল যেন স্বর্ণের খনি আবিষ্কার করে বসল। ফ্রান্সের সিক্রেট সার্ভিসের মাধ্যমে মোসাদ গোয়েন্দারা মেডেলিনকে লেখা বেশ কিছু চিঠি উদ্ধার করল। মেডেলিন একটা বাড়ি বিক্রির বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। প্যারিসের লয়রে ভেলির এই বাড়িটি মেডেলিনেরই। খুবই সুন্দর এলাকা। মোসাদ গোয়েন্দারা মেডেলিনকে পরিচয় গোপন করে লিখল যে, তার প্রত্যাশার চেয়েও বেশি দাম দিতে তারা তারা কিনতে আগ্রহী। তারা নিজেদের অস্ট্রিয়ার ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দিল। মেডেলিন এবার তাদের এপয়েনমেন্ট দিল প্যারিসের একটা বিশাল হোটেলে। তারিখটা ১৯৬২ সালের ২১ জুন।

ঐ তারিখের আগে আইসারের গোয়েন্দারা একের পর এক প্যারিসে আসতে শুরু করেন। গোয়েন্দারা জাল কাগজপত্র, ভাড়া গাড়ি, সেফ হাউস সহ প্রয়োজনীয় সবকিছুর বন্দোবস্ত রাখল। পালিয়ে যাওয়ার রাস্তায়ও ঠিক করে রাখল।

আইসার এ-ও ধারণা করেছিলেন, মেডেলিনের ছেলে তার মা সম্পর্কে অনেক বেশি জানবে। সে পড়ত ইসরাইলে। আইসার তার মায়ের গ্রেফতারলগ্নে ইসরাইলে তার ছেলেকেও গ্রেফতারের সিদ্ধান্ত নিলেন। এরিয়েলও অর্থোডক্স কিন্তু মায়ের মতো সে গোঁড়া নয়। দু'জনকে একই সময়ে গ্রেফতারের কারণ হল, মাকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় প্রয়োজনে যেন ছেলের কাছ থেকে তার সত্যতা যাচাই করা যায়। এমনই সিস্টেম করে ফেললেন আইসার।

২১ জুন বেশ লম্বা, চোখে লাগার মতো এক সুন্দর রমনী হোটেলের লবীতে ঢুকলো। এই-ই হল গোয়েন্দাদের কাছে প্রত্যাশিত মেডেলিন।

কথিত দুই অস্ট্রীয় ব্যবসায়ীর সঙ্গে নিজে থেকে পরিচয় পর্ব সারল মেডেলিন। মেডেলিন চমৎকার ইংরেজি বলে। দুই ব্যবসায়ী বাড়ি বিক্রির আলোচনা দ্রুত শেষ করল। কিন্তু উকিল আসতে দেরি করছিল। উকিলকে ফোন করা হলে সে ব্যস্ততার জন্য ক্ষমা চাইল। তবে উকিল বলল, শহরের কাছেই তার বাসা। তিন মক্কেল যদি তার বাসায় আসে তাহলে সেখানে সব কাগজপত্র দেখে সই করে দেবে। মেডেলিন উকিলের বাড়ি যেতে রাজি হল। ভাড়া গাড়িতে তিনজনই উঠল। এদের মধ্যে দু'জন যে মোসাদ গোয়েন্দা তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

সুন্দরী মেডেলিনকে দেখে গাড়ির চালক গোয়েন্দার মাথা খারাপ হওয়ার যোগাড়। সে ট্রাফিক সিগনাল অমান্য করে বসল। মেডেলিন মিষ্টি কথায় ট্রাফিক সার্জেন্টকে জানাল যে, এরা বিদেশি-ট্রাফিক আইন ভালো করে জানে না। ট্রাফিক যদি বিদেশিদের টিকেট ধরিয়ে দিত তাহলে গোয়েন্দাদের অনেক জারিজুড়ি ফাঁস হয়ে যেত।

কথিত উকিলের বাড়িতে অবশেষে গাড়িটি ঢুকল। কথিত অস্ট্রীয় দুই ব্যবসায়ী মেডেলিনকে অভ্যর্থনা জানিয়ে সুন্দর একটা ফ্ল্যাটে নিয়ে গেল। সেখানে বসা ছিলেন মোসাদের আরেক ডাকসাইটে গোয়েন্দা কারুজ। কারুজ মেডেলিনকে ফরাসি ভাষায় বললেন, ম্যাডাম আপনার বাড়ি নিয়ে আলোচনার জন্য এখানে আনিনি। ম্যাডোলীন অবাক হয়ে চিৎকার করলেন। কারুজ বললেন, অপহৃত শিশু ইয়েসেলির ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। এই সময়

কথিত দুই অস্ট্রীয় ব্যবসায়ী তথা মোসাদ এজেন্ট গায়েব হয়ে গেল। মেডেলিন ভয় পেয়ে গেল।

কারুজের সঙ্গের এক গোয়েন্দা মেডেলিনের সঙ্গে বেশ রূঢ় ভাষায় কথা বলল। তার ধারণা ছিল মেডেলিনও কড়া ভাষায় কথা বলবে। ওদিকে মেডেলিনের ছেলেকেও ইসরাইলে গোয়েন্দাদের প্রশ্নবানে ফল ফলতে শুরু করল। মেডেলিন বুঝল মোসাদ গোয়েন্দাদের হাতে সে আটক হয়েছে।

কারুজ মেডেলিনকে বললেন, ইয়াসেলির অপহরণে আপনি জড়িত। আমরা শিশু ইয়েসেলিকে চাই। মেডেলিন বলল, আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না এবং আমি এ ব্যাপারে কিছুই বলব না। মেডেলিনকে বিদ্যুতের শক দেয়া হল। কিছুক্ষণের মধ্যে মেডেলিন সুস্থ হয়ে উঠল। জরুরি প্রয়োজনে কারুজ একজন প্রশিক্ষিত নার্স এনে রেখেছিলেন।

ইসরাইলিরা বুঝেছিলেন লৌহমানবী মেডেলিন সহজে মুখ খুলবে না। কিন্তু তাদের শেষ আশা এই মহিলা। মেডেলিনকে ইয়েহুডিথ নিশিয়াহু'র কাছে হস্তান্তর করা হল। সে এসেছে লন্ডন থেকে। ইয়েহুডিথ মেডেলিনকে সুন্দর ভাবে পরিচর্যা করল। একজন ধর্মপ্রাণ মহিলার জন্য যা যা প্রয়োজন তাই করল সে। ধর্মমতানুযায়ী তার জন্য বিশেষ খাবার রান্না করা হল। প্রার্থনা বই দেয়া হল। দেয়া হল মোমবাতি। মেডেলিনকে যেখানে রাখা হল সেখানে পুরুষদের যাতায়াত নিষিদ্ধ করা হল। মেডেলিনের পাশের রুমে নার্সকে রাখা হল।

আবার শুরু হল মেডেলিনকে জিজ্ঞাসাবাদ। কারুজ এবং ভিক্টর কোহেন ফরাসি ভাষায় মেডেলিনকে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন। মেডেলিন ইসরাইলি গোয়েন্দাদের তার সম্পর্কে জানার বহর দেখে স্তম্ভিত। এতদসত্ত্বেও মেডেলিন ইয়েসেলি সম্পর্কে একটি শব্দও বলতে রাজি নয়। বরং অপহরণের বিষয়টি সে পুরোপুরি অস্বীকার করল। মেডেলিন গোয়েন্দাদের ফরাসি ভাষায় কিছু গালিও দিল। গোয়েন্দা ভিক্টর কোহেন পরে বলেছেন, প্রথমে তিনি মেডেলিনকে শান্ত করার চেষ্টা চালান। তবে তার অন্তর্গত মনে যে প্রশ্নটা ছিল তা হল, একটি খ্রিস্টান মেয়ে কী করে ধর্মান্ধ অর্থোডক্সে পরিণত হল তা জানা। কেননা দুটি হল বিপরীতমুখী জগৎ। প্রথমদিকে মেডেলিনকে প্রশ্নোত্তরকালে এক মহিলা উপস্থিত ছিল। পরে মেডেলিন একাই গোয়েন্দা কোহেনের সঙে বসে কথা বলে। অবশ্য দরজা খোলাই ছিল।

জিজ্ঞাসাবাদকালে এই গোয়েন্দা মেডেলিনের সঙ্গে বেশ খানিকটা দুর্ব্যবহার করে। কৌশল হিসেবেই গোয়েন্দা এটি করেছিল যাতে মেডেলিনের ধৈর্যের

বাঁধ ভেঙে যায় এবং এর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখায়।

এদিকে মেডেলিনের ছেলে এরিয়েলকে জিজ্ঞাসাবাদে কিছু ফল বেরুতে থাকে। এরিয়েলকে ইসরাইলে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন মোসাদের এক দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা। এই দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা নাকি বাঘ-মহিষকে এক খাটে জল খাওয়াতে পারঙ্গম। এ কারণে তার একটি কোড নামও বিদ্যমান। নাম আব্রাহাম হাডার। তিনি মেডেলিনের ছেলেকে বলেন, তোমার মা স্বীকারোক্তি দিয়েছে। এখন তুমি সত্যি কথাগুলো বল।

কিছুক্ষণের মধ্যে এরিয়েল কেঁদে ফেলে। শিশু ইয়েসেলিকে নিয়ে সে যা জানে বলতে রাজি আছে যদি তার মাকে ও তাকে বিচারের আওতায় আনা না হয়।

আব্রাহাম বললেন, তাই হবে। একথা বলেই আব্রাহাম এরিয়েলকে সাবাক প্রধান এমোস মানোরের কাছে নিয়ে গেলেন। মানোর বললেন, আব্রাহাম তোমাকে যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা পালন করা হবে। এখন বল, ইয়েসিলি কোথায়?

এরিয়েল কেঁপে উঠল। কিন্তু অবশেষে স্বীকার করল, তার মা ইয়েসেলিকে ইসরাইলের বাইরে পাচার করেছে। একটি মেয়েশিশুর ছদ্মবেশে এই পাচার সংঘটিত হয়। ইয়েসেলির পাসপোর্ট জাল করা হয়। তার নাম ও বয়সও পরিবর্তন করা হয়। সে যা জানে তা হল ইয়েসেলিকে সুইজারল্যান্ডে পাচার করা হয়েছে।

এরিয়েলের স্বীকারোক্তি তার মা মেডেলিনকে সঙ্গে সঙ্গে জানানো হল। কোহেন তাকে বললেন, এরিয়েল এখন আমাদের হাতে। তার কঠিন সাজা হবে। সে সব কিছু স্বীকার করেছে। এখন আপনার ছেলে যে কঠিন বিচারের সম্মুখীন হবে এতে কি আপনি উদ্বিগ্ন নন?

মেডেলিন বললেন, এরিয়েল এখন আর আমার ছেলে নয়। ব্যাপক চাপ সত্ত্বেও মেডেলিন ভেঙে পড়ল না।

জিজ্ঞাসাবাদের সঙ্গে যুক্ত গোয়েন্দারা উপলব্ধি করল যে, তাদের অভিযান মোটেই সফল হচ্ছে না। অবশেষে মোসাদ-প্রধান হারেল আইসার নিজেই মেডেলিনকে জিজ্ঞাসাবাদের সিদ্ধান্ত নিলেন।

একটা অন্ধকার কক্ষে হারেল আইসার এবং মেডেলিন মুখোমুখি বসলেন। কয়েকজন মোসাদ গোয়েন্দা পেছনে দাঁড়িয়ে। কোহেন এবং কারুজ দোভাষীর ভূমিকা নিলেন।

আইসার বুঝেছিলেন যে, এই দৃঢ়চেতা মহিলাকে ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ হবে না। একমাত্র উপায় হচ্ছে যৌক্তিক আর্গুমেন্ট করা। আইসার বুঝেছিলেন, মেডেলিন ধর্মপরায়ণা কিন্তু নিশ্চয়ই যুক্তির কথা শুনবে। সর্বোপরি মেডেলিন সারাজীবন ধরে ধর্মান্ধ অর্থোডক্স ইহুদি নয়। তাছাড়া আগের জেনারেশনের মতো ধর্ম নিয়ে উন্মাদনা তার রক্তে প্রবাহিত হওয়ার কথা নয়। সর্বোপরি সে বুদ্ধিমতী ও চতুর। ফলে সেভাবেই সে ঘটনার প্রতিক্রিয়া দেখাবে।

আইসার মেডেলিনকে বললেন, আমি ইসরাইল সরকারের প্রতিনিধিত্ব করি। আমার কথার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আপনার ছেলে সবকিছু স্বীকার করেছে। আপনার সম্পর্কে আমাদের কাছে বহু তথ্যাদি রয়েছে। আপনার সব গোপনীয় তথ্যাদি আমাদের হাতের মুঠোয়। আমরা দুঃখিত যে, আপনাকে জেল থেকে এখানে আনা হয়েছে। আপনি ইহুদি হিসেবে ধর্মান্তরিত হয়েছেন। আর ইহুদিবাদ মানেই ইসরাইল। আবার ইসরাইল ছাড়া ইহুদিবাদের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। ইয়েসেলির অপহরণে ইসরাইলের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক হানাহানি ও অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে। ইসরাইলের মানুষ অর্থোডক্সদের বিরুদ্ধে ফুঁসছে। আপনার কারণেই ইসরাইলে গৃহযুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে। যদি আপনি অপহৃত ইয়েসেলিকে ফেরত না দেন রক্তপাত সেক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী। আবার ভাবুন, অপহৃত শিশুটির ক্ষেত্রে কি ঘটতে পারে। শিশুটি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, মারাও যেতে পারে। আপনি এবং আপনার সহযোগীরা শিশুটির বাবা-মাকে কী উত্তর দেবেন? এই ঘটনা সারাজীবন আপনাকে তাড়িয়ে বেড়াবে। আপনি একাধারে একজন মহিলা এবং মা। যে সন্তানকে আপনি লালন-পালন করছেন তাকে যদি কেউ তুলে নিয়ে যায় আপনার মনের অবস্থা তখন কী হবে। রাত্রে কী আপনার ঠিকমতো ঘুম হবে?

আইসার বলেন, কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে আমরা লড়ছি না। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য অপহৃত শিশুটি উদ্ধার। যত তাড়াতাড়ি শিশুটি আমাদের হাতে আসবে আপনার মুক্তি তত আসন্ন। আপনার ছেলেও মুক্তি পাবে। সর্বোপরি ইসরাইল আবার ঐক্যবদ্ধ হবে।

আইসার মেডেলিনের মনটাও কথা বলতে বলতে অনুধাবনের চেষ্টা করছিলেন। মেডেলিনকে এই সময় চূড়ান্ত অস্থির দেখা যায়। তার ভেতরে যে নানা তোলপাড় দ্বিধাদ্বন্দ্ব চলছিল তা-ও বোঝা যাচ্ছিল। সর্বোপরি তেজস্বী একজন মহিলার দৃষ্টিভঙ্গি বিপরীত দিকে ঠেলে দেয়া এক কঠিন কাজ। মোসাদ গোয়েন্দারা ছিলেন নির্বিকার। তবে তারা বুঝতে পারছিলেন, সত্য প্রকাশের পথে।

মেডেলিন তার মুখ তুলে বলল, আপনারা যে ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রকৃত প্রতিনিধি তা আমি জানব কী করে? আপনাদের ওপর আস্থা রাখব কী ভাবে?

মুহূর্তের মধ্যে আইসার তার কূটনৈতিক পাসপোর্ট মেডেলিনের হাতে দিলেন। আইসারের লোক এসব দেখে স্তম্ভিত। বস এসব কী করছেন। তিনি কী পাগল হয়ে গেছেন? বিবাদিকে প্রকৃত নাম বলা, পাসপোর্ট দেখানোর মতো ঝুঁকির কাজ আর হতে পারে না। কিন্তু আইসারের ভাবনাটা বিপরীত। তার মতে, তিনি যে আন্তরিক এবং মেডেলিনের প্রতি আস্থাশীল এটা বোঝানো জরুরি। হয়তো এভাবেই সাফল্যের পথ সুগম হবে।

মেডেলিন ইসরাইলের এমব্রোস করা পাসপোর্টের সিলমোহরটি বেশ সময় নিয়ে দেখল। এতক্ষণ সে দাঁত দিয়ে ঠোঁটে কামড় দিয়ে রেখেছিল। এক সময় তার ঠোঁট বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ল। অস্থির গলায় সে বলল, আমি আর পারছি না। আমি আর পারছি না...।

হঠাৎ করেই মেডেলিন তার মাথা তুলল। বলল, শিশুটি এখন আছে গারটনার পরিবারের সঙ্গে। ঠিকানা হল, ১২৬ পেন স্ট্রিট, ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক। ঐ পরিবারে শিশুটির নাম ইয়ানকেলে।

আইসার চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, যত তাড়াতাড়ি শিশুটিকে আমরা পাব তত তাড়াতাড়ি আপনার মুক্তি। তিনি কক্ষ ত্যাগ করলেন।

জেরুজালেম, নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনে টেলিগ্রামের বন্যা বইল। উত্তর আমেরিকার ইসরাইলি দূতাবাসসমূহের নিরাপত্তা কর্মকর্তা গুর অরিয়ের সঙ্গে কথা বললেন আইসার। নিউইয়র্কভিত্তিক গুর অরিয়ে ব্রুকলিনের ঠিকানা চেক করে আইসারকে জানালেন, ঠিকানা নির্ভুল এবং গারটনার পরিবারের বাস সেখানেই। ঐ জেলায় ব্যাপকভাবে সাতমার হাসিদিকদের বসবাস। ওয়াশিংটনে নিযুক্ত ইসরাইলের রাষ্ট্রদূতকে এফবিআই'র সঙ্গে যোগাযোগ করে শিশুটিকে উদ্ধার করে ইসরাইলে পাঠাতে বলা হল।

গুর অরিয়ে এফবিআই'র সঙ্গে কথা বললেন এবং তাদেরকে সব তথ্য দিলেন। এফবিআই বলল, তোমরা যেহেতু সবই জান, তোমরা নিজেরা গিয়ে শিশুটিকে উদ্ধার করে আনছ না কেন? গুর অরিয়ে অনুমতিপত্র চাইলে এফবিআই তা দিতে আপত্তি করল।

প্রকৃতপক্ষে আমেরিকা অভিযান চালাতে ইতস্তত করছিল। তাদের প্রশ্ন,

তোমরা কি নিশ্চিত অপহৃত শিশুটি ঐ ঠিকানায় রয়েছে? আমরা যদি অভিযান চালিয়ে শিশুটিকে সেখানে না পাই তাহলে তার ভয়াবহ পরিণতির কথা কি তোমরা অনুমান করতে পারছ? এফবিআই আভাস দেয় কংগ্রেশনাল নির্বাচন সেখানে আসন্ন। সাতমার সম্প্রদায় হাজার হাজার ভোট সেখানে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রশাসন তাদের সঙ্গে কোনো বিরোধে জড়াতে চায় না।

এদিকে প্যারিসে আইসারের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙার উপক্রম। মধ্যরাতে তিনি আমেরিকায় ইসরাইলের রাষ্ট্রদূত হারমানকে ফোন করলেন। তিনি হারমানকে মার্কিন এটর্নি জেনারেল রবার্ট কেনেডীর সঙ্গে অবিলম্বে যোগাযোগ করতে ফোনে নির্দেশ দিলেন। এ-ও বললেন, কেনেডিকে আমার নাম বলবেন এবং এফবিআই যেন এই মুহূর্তে শিশুটিকে ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা করে।

রাষ্ট্রদূত হারমান বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন, আইসার, আপনি এভাবে কী কথা বলছেন। রাষ্ট্রদূত আইসারকে আভাস দেন, তাদের এহেন আলোচনা মার্কিন গোয়েন্দারা আড়ি পেতে যদি শুনে ফেলে তাহলে কূটনৈতিক সম্পর্ক যে সংকটে পড়বে? আইসার বললেন, আমি তো আপনাকেই এভাবেই একথা বলছি না। আমি অনেককেই একই কথা বলেছি।

আইসারের ধারণা ছিল, আমেরিকান প্রশাসন তার উত্তেজক কথাবার্তা শুনুক এবং পদক্ষেপ নিক। ওদিকে রাষ্ট্রদূত হারমান ভয় পাচ্ছেন দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক নষ্টের। হারমানের উপদেশ শুনে আইসার বললেন, আমি আপনার মতামত শুনতে চাই না। একথা বলেই তিনি টেলিফোন কেটে দিলেন। এ-ও বলে ছাড়লেন, যদি তারা অবিলম্বে ব্যবস্থা না নেয়, তাহলে পরিণতির জন্য তারাই দায়ী থাকবে।

এর কয়েক ঘন্টা পরেই আমেরিকায় তাদের কনস্যুলেট থেকে ফোন পেলেন আইসার। তাকে জানানো হল, রবার্ট কেনেডি অবিলম্বে অ্যাকশনে যেতে এফবি আইএ এজেন্টের একটি টিমকে অনুমতি দিয়েছেন। ইসরাইলি নিরাপত্তা বাহিনীর লোকদের নিয়ে তারা ব্রুকলিনে অভিযান চালায়। শিশুটিকে উদ্ধার করে একটি নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসা হয়।
এই শিশুটিই ইয়েসেলি।

এলিয়ে ওয়াইসেল তখন একজন তরুণ রিপোর্টার। তিনি ফোন করলেন গুর অরিয়েকে। জিজ্ঞেস করলেন, শিশুটিকে নাকি উদ্ধার করা হয়েছে? গুর অরিয়ে শপথ নিয়েছিলেন, গোপনীয়তা রক্ষায়। তিনি এলিয়েকে শিশু উদ্ধারের কথা অস্বীকার করলেন। এলিয়ে ওয়াইসেল এই মিথ্যাচারের জন্য গুর অরিয়েকে

কয়েক বছর ক্ষমা করতে পারেননি। এলিয়ে পরবর্তীতে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন।

১৯৬২ সালের ৪ জুলাই ইসরাইলে জাতীয় দিবস পালিত হয়। কেননা এদিন ইয়েসেলিকে প্লেনে করে ইসরাইলে ফিরিয়ে আনা হয়। ইসরাইলের গণমাধ্যম তাদের সিক্রেট সার্ভিসকে বাহ্বা দিয়ে নানা প্রতিবেদন তৈরি করতে থাকে। এতে আরও বলা হয়, বিশ্বে ইসরাইল প্রথম দেশ যেখানকার সব মানুষের কাছে গোয়েন্দারা শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন। ইসরাইলের এক সুপরিচিত আইনজীবী কোহেন জিদন শিশুটি উদ্ধারের প্রশংসা করে বেন গুরিয়েনকে চিঠি দেন। বেন গুরিয়েন চিঠির উত্তরে লেখেন, আমাদের সিক্রেট সার্ভিসকে আপনার প্রশংসা করা উচিত। বিশেষ করে গোয়েন্দা বিভাগের মাথায় যারা বসে আছে। তারা দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা কোনো বিশ্রাম ছাড়াই কাজ করেছে। বিশেষ করে জুনিয়ররা যখন এই মামলাটি ছেড়ে দেয়ার জন্য চাপ দিয়েছে। পাচারকৃত এই ছেলেটিকে উদ্ধার ছিল সত্যিই এক কঠিন কাজ।

ইয়েসেলির উদ্ধারে সারা ইসরাইল যখন উৎসবমুখর আইসার তখনো প্যারিসে। সেখানকার গোয়েন্দারা আইসারের সম্মানে একটা পার্টি দেয়। সেখানে মোসাদ-প্রধান হারেল আইসারের দক্ষতার প্রভূত প্রশংসা করা হয়। ইসরাইল জানে তার দেশের জনগণকে কী ভাবে রক্ষা করতে হয়। আইসারকে কিছু উপহারও দেয়া হয়। ইয়েসেলির বিছানা নামের যে খাটিয়ায় আইসার বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছেন সেটি তার সহকারীরা ইসরাইলের উদ্দেশ্যে জাহাজে উঠিয়ে দেয়।

অবশেষে শিশু ইয়েসেলিকে উদ্ধারের মাধ্যমে সব সত্য কাহিনী প্রকাশিত হতে শুরু করে। একটি টেলিগ্রামের মাধ্যমে শুরু হয় পাচারপর্ব।

১৯৬০ সালের বসন্তকালে ইয়েসেলিকে যখন ইসরাইলের এক ইয়েশিভা থেকে আরেকটিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন মেডেলিন তার বন্ধু রাব্বি মেইজিশের কাছ থেকে একটি টেলিগ্রাম পায়। টেলিগ্রামে তাকে অবিলম্বে জেরুজালেমে আসতে বলা হয়। মেডেলিন জেরুজালেমে এসে জানতে পারে তাকে একটি সিক্রেট মিশন চালাতে হবে। আর সেটি হল ইয়েসেলিকে ইসরাইলের বাইরে বের করে নিয়ে যেতে হবে।

মেডেলিন ফ্রান্সে ফিরে এসে তার পাসপোর্টে ঘষামাজা করে। তার ছেলের নাম ক্লাউডিয়ে থেকে ক্লাওডাইন করে। জন্মতারিখ ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল করে। সে তার নিজের নামও পরিবর্তন করে। সে গিয়োনা থেকে ইসরাইলি

ক্লাওডিয়ে থেকে ক্লাওডাইন করে। জন্মতারিখ ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল করে। সে তার নিজের নামও পরিবর্তন করে। সে গিয়োনা থেকে ইসরাইল অভিমুখী জাহাজে চড়ে।

গিয়োনা বসেই সে খেলা শুরু করে। এক ইমিগ্রান্ট পরিবারের আট বছরের একটি মেয়েকে সে নিজের মেয়ে হিসেবে দেখায়। ইটালির ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ তার পাসপোর্ট চেক করে তার সঙ্গে আট বছরের একটি মেয়ে রয়েছে বলে ছাড়পত্র দেয়। ইসরাইলেও সে একই প্রক্রিয়ার অবতারণা করে।

এর কিছুদিন পর মেডেলিন ইসরাইলের লড এয়ারপোর্ট থেকে আট বছরের একটি মেয়েকে নিয়ে বিমানে উঠে। পরিচয় দেয় নিজের মেয়ে। যে মেয়েকে নিয়ে সে ইসরাইলে ঢুকেছিল। প্রকৃতপক্ষে মেয়ের পোশাকের এই ছেলেটিই ইয়েসেলি।

ইয়েসেলি সুইজারল্যান্ড ও ফ্রান্সের আল্ট্রা অর্থোডক্স বোর্ডিং স্কুলে দু'বছর কাটায়। কিন্তু ইয়েসেলিকে নিয়ে যখন সারা ইসরাইলে তোলপাড় শুরু হয়ে যয় তখন তাকে মেআউক্সে নিয়ে যাওয়া যায়। সেখানে ইয়েসেলিকে সুইস বাবা-মা'র এতিম বলে ভর্তি করা হয়।

ইয়েসেলিকে আরেকবার মেয়ের সাজে সাজিয়ে আমেরিকা নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে তাকে সাতমার সম্প্রদায়ের প্রধান রাব্বি জোয়েল তাকে সাহায্য করেন। রাব্বি জোয়েল গারটনারকে ইয়েসেলিকে তাদের বাড়িতে আত্মীয় হিসেবে দীর্ঘদিন রাখতে নির্দেশ দেন। এ বাড়িতে তার নাম হয় ইয়ানকেলে। বলা হয় আর্জেন্টিনা থেকে এসেছে এবং গারটনারের কাজিন হয়।

মোসাদের শীর্ষ নেতারা উপসংহারে আসেন যে, আল্ট্রা অর্থোডক্স সম্প্রদায়ের নেটওয়ার্ক আমেরিকা ইউরোপ জুড়ে বিস্তৃত এবং তাদের কর্মকাণ্ড বিশ্বের সেরা গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে পর্যন্ত হার মানতে বাধ্য। এবং মেডেলিনকে নিয়ে সম্প্রদায়ের লোকজন গর্বিত। অর্থাৎ এই সম্প্রদায়ের যে কোনো ষড়যন্ত্রে মেডেলিন অপরিহার্য। তার কোনো স্থায়ী ঠিকানা নেই। গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র সে সব সময় তার হাত ব্যাগেই রাখে। মানুষ যেভাবে কাপড় বদলায় মেডেলিন সেভাবে পরিচয় বদলাতে পারঙ্গম। অর্থাৎ অর্থোডক্সদের বিশ্বে ফরাসি মেডেলিন মাতা হারি হিসেবে বিবেচিত হয়।

ইয়েসেলির উদ্ধারে সারা ইসরাইল জুড়ে যখন উৎসব তখন মেডেলিন তার দোষ স্বীকার করে। তার এক বন্ধুকে একথা সে বলে। সে আরও বলে,

আমাদের যে লক্ষ্য ছিল তা থেকে আমি বিচ্যুত হয়েছি। আমি নিজেকে কখনো ক্ষমা করতে পারব না।

মেডেলিন তার বুদ্ধিমত্তার কারণে মোসাদের শীর্ষ নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়। একজন চৌকস গোয়েন্দার সকল গুণই তার মধ্যে বিদ্যমান। আইসার তাকে মোসাদে চাকরি দেয়ার কথা ভাবেন। কিন্তু সে প্রস্তাব দিতে দেরি করে ফেলেন আইসার। মেডেলিন জেরুজালেমে ফিরে আল্ট্রা অর্থোডক্স সমাজে মিশে যান। তিন বছর পর সে রাব্বি আমরাম ব্লাউকে বিয়ে করে। ৭২ বছর বয়স্ক আমবরাম সব গোত্রের সর্বাধিক ফ্যানাটিকাল গ্রুপের প্রধান।

মোসাদ-প্রধান আইসার হারেল ও ইয়েসেলির মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছিল নয় বছর পর। আইসারের ওপর লেখা একটি বইয়ের প্রকাশনা উৎসবে তাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল। সে অনুষ্ঠানে ইয়েসেলিকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

ইয়েসেলি ইসরাইলের ট্যাঙ্ক ডিভিশনে এখন কাজ করে। খুব ভালো চাকরি। ঐ অনুষ্ঠানে আইসারের সঙ্গে করমর্দনকালে সে ঘোষণা দেয় আইসার হারেল আমার জীবনের সবচে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। আইসার ব্যতিরেকে আমি আপনাদের মাঝে কখনোই ফিরে আসতে পারতাম না।

বিশ্বযুদ্ধ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই বেন গুরিয়ন হাগানাকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে শুরু করে। কোনো কারন ছাড়াই ইহুদিরা জেরুজালেমে দাঙ্গা বাধায়। ২ জুন জেরুজালেমের জাফা গেইটের বাইরে বাজারে ইরগুন বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। বোমা হামলায় ৯জন আরব নিহত এবং বহু অহত হয়। ৮ জুন রাতে জেরুজালেমের উপর্যুপরি বোমা হামলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বিপর্যস্ত হয়। ইউরোপে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে বেন গুরিয়ন প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ-বিরোধী সব তৎপরতা বন্ধ করে। এমনকি ইরগুনও তাদের ব্রিটিশবিরোধী অভিযান বন্ধ রাখে। জুইশ এজেন্সির তৎকালীন সভাপতি বেন গুরিয়ন সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ এ ঘোষণা করে, 'আমরা হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব এমনভাবে যেন শ্বেতপত্র (১৯৩৯ এর) নেই আর শ্বেতপত্রের এমনিভাবে বিরোধিতা করব যেন (হিটলারের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ নেই।' এজেন্সিটি সকল ইহুদিকে যুদ্ধ পরিচালনায় ব্রিটিশদের সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের আহ্বান জানায়। যদিও ১৯৩৯ এর শ্বেতপত্র সরাসরি ইহুদিদের স্বার্থবিরোধী ছিল এবং ব্রিটিশদের দীর্ঘদিনের ইহুদি আশা আকাঙ্ক্ষার লালন ও পৃষ্ঠপোষকতার অবসান সূচনা করেছিল। ইহুদিরা সঠিকভাবে অনুধাবন করেছিল যে জার্মানির বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষের বিজয় ব্যতীত বিশ্বে ইহুদি অস্তিত্ব বজায় রাখা অসম্ভব না হলেও অত্যন্ত কঠিন হবে।

ব্রিটিশদের যুদ্ধ প্রয়াসে সমর্থন ও সহযোগিতা করা ইহুদিদের অস্তিত্ব রক্ষার বিষয়ে পরিণত হয়। ফলে প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ সহায়ক বাহিনীতে ২৭,০০০ ইহুদি যোগ দেয় অথচ আরবদের মধ্যথেকে মাত্র ১২০০০ এইবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। ব্রিটিশ বাহিনীতে একটি ইহুদি ডিভিশন গঠন করার প্রশ্ন বেশ কিছুকাল বিবেচনাধীন ছিল। ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ একটি ইহুদি ব্রিগেড গঠন করা হয়েছিল। ব্রিটিশরা ইহুদি কমান্ডো ইউনিটকে প্রশিক্ষণ দেয় যা পরে বিখ্যাত ইহুদি অভিঘাত বাহিনী (Shock troops) Palmach এর মূল্যধারের ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও ইহুদি স্বেচ্ছাসেবকদের নাশকতা, বিধ্বংসী কৌশল ও শত্রুর দখলকৃত এলাকায় সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধের ওপর নিবিড় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ভাগ্যের পরিহাস এই যে, এই প্রশিক্ষণ পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শক্তিকে প্যালেস্টাইন থেকে উৎখাত করতে ইহুদিরা অত্যন্ত কার্যকরভাবে প্রয়োগ করে।

১৯৪০ সালের মে মাসে উইনস্টন চার্চিল ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

ইহুদিদের প্রতি চার্চিলের সহানভূতি ও সমর্থন ছিল সর্বজনবিদিত তাই তাদের মধ্যে আশার সঞ্চার হয় যে অচিরেই হয়তো ১৯৩৯ এর শ্বেতপত্র বাতিল করা হবে। কিন্তু একই মাসে ইটালি জার্মানির পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিলে যুদ্ধক্ষেত্র মধ্যপ্রাচ্যের কাছাকাছি চলে আসে। চার্চিল বুঝতে পারেন যে, শেশ্বপত্রের অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা জরুরি হয়ে পড়েছে। অন্যথায়, আরব সহযোগিতা পাওয়া দুষ্কর হবে। তাই ব্রিটিশরা এমন এক সময় প্যালেস্টাইনে অভিবাসন কোটা বলবৎ করে যখন ইউরোপীয় ইহুদিরা জার্মান নির্যাতন থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য প্যালেস্টাইনে পা রাখতে মরিয়া হয়ে উঠে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এবং ইহুদিদের মধ্যে উত্তেজনা ক্রমান্বয়ে তীব্র আকার ধারণ সত্ত্বেও হাজার হাজার ইহুদি স্বেচ্ছাসেবক ব্রিটিশ বাহিনীতে যোগ দেয়।

তারা অনুধাবন করে যে, চার্চিল ক্ষমতায় আসা সত্ত্বেও তারা প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ব্রিটিশদের সহায়তার ওপর আর নির্ভর করতে পারবে না। তারা আরো বুঝতে পারে যে, তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে যুক্তরাষ্ট্রেই ইহুদি রাজনৈতিক প্রভাব প্রয়োগ করার সময় এসেছে। আমেরিকান ইহুদি অর্গানাইজেশন নিউইয়র্ক সিটির বিল্টমোর হোটেলে ইহুদিদের এক সম্মেলন আয়োজন করে। সম্মেলন ১৯৪২ সালের মে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন ওয়ার্লড ইহুদি অর্গানাইজেশনের সভাপতি খাইম ওয়াইজম্যান, জুইশ এজেন্সির কার্যনির্বাহী সভাপতি বেন গুরিয়ন এবং নির্বাহী সদস্য নাহাম গোল্ডম্যান।

সম্মেলনে ৮টি প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। ঐ প্রস্তাবগুলি ইতিহাসে 'বিল্টমোর প্রোগ্রাম' নামে পরিচিত। প্রস্তাবে ১৯৩৯ সালের শ্বেতপত্র সমূলে প্রত্যাখ্যান করে। বালফোর ঘোষণার মূল উদ্দেশ্য ও ম্যান্ডেট বাস্তবায়নের আহ্বান জানানো হয়। এই প্রথমবার প্যালেস্টাইনে ইহুদি কমনওয়েলথ' প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। বালফোর ঘোষণার প্যালেস্টাইনে 'ইহুদি কমনওয়েলথ' বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কোনো উল্লেখ ছিল না। ছিল না ইহুদিদের আবাসভূমি স্থাপনও কথা। ১৯২২ সালের শ্বেতপত্রে প্যালেস্টাইন নয় বরং প্যালেস্টাইনের একটি অংশে ইহুদি জাতির আবাসভূমি স্থাপনের কথা বলা হয়েছিল।

বিল্টমোর প্রোগ্রামের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকটি রাজ্যের আইনসভায় প্রস্তাব পাশ করা হয়। এমনকি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে দিয়ে এই প্রোগ্রামের সমর্থনে একটি বিবৃতিও প্রকাশ করা হয়। তখন থেকে যুক্তরাষ্ট্রকেই জাইঅনবাদী কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রধান সহায়ক বহিঃশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার তৎপরতা শুরু হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদিদের কবজায় থাকা বিপুল

অর্থনৈতিক শক্তি ও প্রচার মাধ্যমের নিয়ন্ত্রণকে কাজে লাগিয়ে রাজনীতিতে দ্রুত তাদের প্রভাব বলয় সৃস্টি করতে সক্ষম হয়। এই প্রভাব বলয়কে ক্রমাগতভাবে বিস্তৃত করে ইহুদিদের লক্ষ্যকে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতির মূলধারায় নিয়ে আসা শুরু হয়।

প্যালেস্টাইনে ইহুদি পাচার তৎপরতায় আরো অনেক ইহুদির সলিল সমাধি হয়েছিল। এর মধ্যে ১৯৪০ এর ২৫ নভেম্বরের Patria বিপর্যয় উল্লেখযোগ্য। অবৈধভাবে প্যালেস্টাইনে অভিবাসনের উদ্দেশ্যে আগত ১৮০০ ইহুদি হাইফা বন্দরে পৌঁছলে তাদেরকে মরিসাসের ডিটেনশন কেন্দ্রে পাঠানোর জন্য Patria নামের একটি জাহাজে উঠানো হয়। জাহাজটি যখন মরিশাস যাওয়ার অপেক্ষা করছিল তখন তাদেরকে প্যালেস্টাইনে থাকার অনুমতি দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করছিল। সাধারণ ধর্মঘট করে হাইফা বন্দর অচল করেও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত বদলাতে না পেরে জাহাজটি যাতে বন্দর ত্যাগ না করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে হাগনার এজেন্টরা জাহাজটিকে অকেজো করার জন্য বোমা পেতে রাখে। হাগানার পোঁতা বোমার বিস্ফোরণ ক্ষমতার হিসাব ভুল করায় বোমাটি বিস্ফোরণের পরে মাত্র ১৬ মিনিটের মধ্যে জাহাজটি সম্পূর্ণরূপেড নিমজ্জিত হয়ে যায়। জাহাজের খোলে আটকে পড়া যাত্রীদের সকলকে এতেঠ অল্প সময়ে উদ্ধার করা যায়নি। এই ঘটনায় ২৬০জন ইহুদির মুত্যু ঘটে।

১৯৪২ এর অক্টোবরে জেনারেল মন্টগোমারী আল-আলামিনে জার্মানদের পরাজিত করে। এর মাধ্যমে জার্মানদের মিশর দখল অভিযান ব্যর্থ হয়। এরপর জার্মান ও ইটালিয়ানদের উভয় আফ্রিকা অভিযানও সমাপ্তি ঘটে যখন ১৯৪৩ সালে ১৩ জার্মান আফ্রিকার মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। প্যালেস্টাইন হিটলার বাহিনীর হুমকিমুক্ত হয়। ইতিমধ্যে হিটলারের ইহুদি নিধন কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ হতে থাকে। হিটলারের ইহুদি নিধন কেন্দ্রসমূহের বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতার মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করে যে প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে ইহুদিদের নিজ বাহু বলের ওপরই নির্ভর করতে হবে। কোনো বৃহৎ শক্তি ইহুদি রাষ্ট্র সাজিয়ে ইহুদিদের উপহার দেবে না।

জুইশ এজেন্সির নিয়ন্ত্রণে প্যালস্টাইনে ছিল সবচেয়ে বড় ইহুদি বেসামরিক বাহিনী হাগানা। সেখানে ছিল ২০০০০০ সৈন্যসহ বিশেষ বাহিনী পালমাখ এবং ব্রিটিশদের দ্বারা প্রশিক্ষিত প্রায় ২৫,০০০ আধা সামরিক বাহিনী। জুইশ এজেন্সির নেতা বেন গুরিয়ন ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত তার বাহিনীকে ব্রিটিশদের

সহায়তায় নিয়োজিত রেখেছিল। কিন্তু সন্ত্রাসী দল ইরগুন এবং এই দল থেকে বেরিয়ে আসা স্টার্ন গ্যাং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কিছুটা নিম্ন মাত্রার যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। ইরগুন কমান্ডার জাবতনিস্কি ১৯৪০ সালে হৃদরোগে মৃত্যুবরণ করেন এবং স্ট্যার্ন গ্যাং নেতা আব্রাহামকে ব্রিটিশ বাহিনী হত্যা করে ১৯৪২ সালে ।

বেগিনের জন্মগ্রহণ পোল্যান্ডের ব্রেস্ট লিটভস্কে এবং প্রথম জীবনে জাবতনিস্কির সংশোনবাদীতে দীক্ষা নেয়। সোভিয়েত বাহিনী পোল্যান্ড দখল করার পর বেগিনকে ব্রিটিশ গুপ্তচর সন্দেহে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪১ সালে স্ট্যালিনের সাথে পোলিশ জেনারেল সিকরস্কির সমঝোতা হবার পর বেগিন কারামুক্ত হয়ে পোলিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। পরবর্তীকালে জাবতনিস্কির ব্রিটিশ-ঘেষা নীতিকে যথেষ্ট আক্রমণাত্মক নয় বিবেচনা করে নিজস্ব মুক্তিযুদ্ধের ধারণা নিয়ে ১৯৪২ সালে পারস্য হয়ে প্যালেস্টাইনে আসে। তার মতে আরবরা প্যালেস্টাইনে জবরদখলকারী এবং ব্রিটিশরা তাদের সহযোগী। প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই দুই পক্ষের বিরুদ্ধে যুগপৎ যুদ্ধ করতে হবে। আরব এবং ব্রিটিশ উভয়কেই প্যালেস্টাইন থেকে বিতাড়িত করতে হবে। ইসরায়েলের একজন ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী (১৯৭৮-১৯৮৩) মেনাখেম বেগিন ইরুগুন বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হয় ১৯৪৪ সালে ।

মেনাখেম বেগিন প্যালেস্টাইনে পৌছেই ইরগুন বাহিনীকে সক্রিয় করতে শুরু করে। ইরগুন থেকে বেরিয়ে গিয়ে আব্রাহাম স্টার্ন এর নেতৃত্বে লেহী (ইসরায়েলের স্বাধীনতার পক্ষে যুদ্ধ) গঠিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ইরগুন ব্রিটিশদের সাথে যোগ দিলেও লেহী বা স্টার্ন গ্যাং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তাদের নিজস্ব বিদ্রোহ চালিয়ে যাচ্ছিল। বেগিন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের প্রথম চ্যালেঞ্জ করে অক্টোবর ১৯৪৩ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে আল-আকসার পশ্চিম দেয়ালের সামনে সোফার ফুঁকিয়ে। ব্রিটিশ পুলিশ আক্রমণ করে তাদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করে। পরের বছর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মনোভাব পরীক্ষা করার জন্য বেগিন আবার 'সোফার' ফুৎকারের আদেশ দেয়। এবার ব্রিটিশ পুলিশ সংযত থাকে। বেগিন এটাকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের দুর্বলতা ভেবে তার বাহিনীকে ব্রিটিশদের ওপর আক্রমণনির্দেশ দেয়। ব্রিটিশ সরকারের ট্যাক্স অফিস, ইমিগ্রেশন অফিস ও পুলিশ স্টেশনের ওপর আক্রমণ শুরু হয়। সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪ এ ইরগুন জেরুজামেলের পুলিশ স্টেশনগুলিতে হামলা চালিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। একজন সিআইডি কর্মকর্তা যখন শহরের রাস্তায় হাঁটছিলেন তখন তাকে হত্যা করে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বেগিনকে জীবিত বা মৃত ধরিয়ে দেওয়ার জন্য ১০,০০০ পাউন্ড পুরস্কার ঘোষণা করে।

বেগিন লম্বা দাড়িওয়ালা তালমুদ পণ্ডিতের ছদ্মবেশ ধারণ করে আত্মগোপনে থেকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা শুরু করে। ১৯৪৪ সালের শেষের দিকে ইরগুন প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ হাইকমিশনার হ্যারল্ড ম্যাকমাইকেলকে জেরুজালেমের রাস্তায় দুইবার হত্যা প্রচেষ্টা চালায়। ঐ বছরই ইরগুন নভেম্বর কায়রোতে ব্রিটিশ স্টেটমন্ত্রী ও চার্চিলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু লর্ড ময়নীকে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডে জুইশ এজেন্সি নিন্দা জানিয়েছিল। কিন্তুএর ফলে উইনস্টন চার্চিল যিনি ইহুদিদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন তিনিও তীব্র সমালোচনা করে।

সন্ত্রাস

সন্ত্রাসের দিক থেকেও ইহুদিরা শ্রেষ্ঠ ১ নভেম্বর ১৯৪৫ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে হাগানা, ইরগুন ও লেহী তাদের প্রথম সম্মিলিত সন্ত্রাসী আক্রমণ পরিচালনা করে। ঐ রাতে হাগানা ইউনিটসমূহ একই সময়ে সারা দেশের রেল সিস্টেমের ১৫৩টি স্থানে নাশকতা করে এবং হাইফা ও জাফা বন্দরের দুটি টহল লঞ্চ ডুবিয়ে দেয়।, ইরগুন ও লেহীর একটি যৌথ ইউনিট লিড্ডায় প্রধান রেলস্টেশনে হামলা চালায়। এই অভিযানকে আখ্যায়িত করা হয় 'Night of The Trains নামে ।জবাবে ব্রিটিশ সরকার হাগানা দমনের নির্দেশ দেয়। বহু ইহুদি নেতাকে আটক করা হয়। বেন গুরিয়ন তখন বিদেশে থাকায় তাকে আটক করা সম্ভব হয়নি। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যখন হাগানা দমনে ব্যস্ত তখন ইরগুন ও লেহী মেনাখেম বেগিনের নেতৃত্বে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সন্ত্রাসী আক্রমণ চালায়। জেরুজালেমের রুশ প্রাঙ্গণের জার আমলে নির্মিত বিশাল হোস্টেলগুলিতে প্যালেস্টাইনের পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স স্থাপন করা হয়েছিল। দুর্গসম এই রুশ প্রাঙ্গণ ইরগুন আক্রমণের প্রিয় লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। ২৭ ডিসেম্বর ১৯৪৫ তারা রুশ প্রাঙ্গণে অবস্থিত সিআইডি সদরদপ্তর উড়িয়ে দেয়। ১৯৪৬ সালের জানুয়ারিতে ধ্বংস করে একই প্রাঙ্গণে অবস্থিত জেলখানা।

২৭ জুন ১৯৪৬ সালের হাগানা প্যালেস্টাইন ও প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে যোগযোগের ১১টি সেতুর মধ্যে ১০টি সেতু ধ্বংস করে। ব্রিটিশরা দুই সপ্তাহব্যাপী এক অভিযান শুরু করে । সারা দেশব্যাপী কারফিউ জারি করে ১৭,০০০ সৈন্য নামিয়ে সারাদেশের ইহুদি বসতি, যৌথ খামার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অস্ত্র ও দলিলাদি উদ্ধার ও নেতাদের গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনা করে। এই অভিযান সন্ত্রাসী দলের কোনো বড় অধিনায়ক গ্রেফতার বা অস্ত্রভাণ্ডার উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়। ব্রিটিশ প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে ইহুদিদের বেতনভুক্ত গুপ্তচরদের তৎপরতায় হাগানা এই অভিযানের খবর পূর্বাহ্নেই পেয়ে যায়। এর ফলে ব্রিটিশদের এই বিশাল অভিযান ফল লাভে ব্যর্থ হয়। ইহুদিদের সাবাৎ-এর দিন অর্থাৎ শনিবারে শুরু হওয়া ব্রিটিস কর্তৃপক্ষের এই অভিযানকে ইহুদিরা 'ব্ল্যাক সাবাৎ' নামে অভিহিত করে থাকে।

ইরগুনের সবচেয়ে চমকপ্রদ আক্রমণছিল জেরুজালেমের কিং ডেভিড হোটেলের ওপর। কিং ডেভিড হোটেল ছিল জেরুজালেমের প্রথম ও সর্ববৃহৎ বিলাসবহুল হোটেল। ১৯৩৮ সাল থেকে এই হোটেলের দক্ষিণ উইংয়ে প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ বাহিনীর সদরদপ্তরের একটি অংশ ও ম্যান্ডেট সরকারের

সচিবালয় অবস্থিত ছিল। মেনাকেম বেগিনের নেতৃত্বাধীন ইরগুন ২২ জুলাই ১৯৪৬ হোটেলে বোম হামলা চালায়। ঐ দিন ভোরে ২০ জন ইহুদিসন্ত্রাসী আরব পোষাক পড়ে একটি লরি থেকে কয়েকটি দুধের বড় ভাণ্ড নামিয়ে হোটেলের বেইজমেন্টে রাখে। প্রকৃতপক্ষে এই দুধের ভাণ্ডগুলিতে ৩৫০ কেজি বিস্ফোরক ভর্তি ছিল। কাছে দাঁড়ানো একজন ব্রিটিশ অফিসার মেজর ম্যাকিন্টশ আগন্তুকদের সন্দেহজনক দেখে তাদের পরিচয় জানতে চাইলে আগন্তুকদের একজন তাকে গুলি করে হত্যা করে। বেইজমেন্ট থেকে বের হওয়ার গেটে আরেক পুলিশ গার্ডও একই ভাগ্য বরণ করে। তখন গার্ড এবং সন্ত্রাসীদের মধ্যে গুলি বিনিময় শুরু হলে কয়েকজন সন্ত্রাসী গুলিবিদ্ধ হয়, কিন্তু সকলেই পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এরই মধ্যে হোটেলের বেইজমেন্টে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে হোটেলের দক্ষিণ উইং এর পশ্চিমের অংশ সম্পূর্ণভাবে ধ্বসে পড়ে। আক্রমণে ৯১ জন মৃত্যুবরণ করে এবং ৬০ জন আহত হয়। মৃতদের মধ্যে ২৮ জন ব্রিটিশ, ৪১, জন আরব, ১৭ জন ইহুদি ও অন্যান্য জাতিসত্তার ৫জন ।

হোটেলে বোমা হামলা ছিল ব্রিটিশ ম্যান্ডেট সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত সবচেয়ে মারাত্মক ও প্রাণহানিকর হামলা। ব্রিটিশ ম্যান্ডেট সরকার সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্যালেস্টাইনে যে অভিযান চালিয়েছিল এই হামলা তারই চরম ব্যর্থতার সাক্ষ্য বহন করে। অপরদিকে, কিং ডেভিড হোটেলের মতো একটা নিরাপত্তা বেষ্টনি এলাকার অভ্যন্তরে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক জড়ো করে তা সাফল্যের সাথে বিস্ফোরণ ঘটানোর মধ্যে ইহুদি সন্ত্রাসী গ্রুপের সাংগঠনিক শক্তি ওসন্ত্রাসী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ক্ষমতার প্রমান ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনার পর দায়ী ব্যক্তিদের ধরার জন্য তেলআবিব শহরে ব্যাপক তল্লাশি চালানো হয়। সামরিক কারফিউ, যখন তখন ইহুদিদের দেহ ও বাসস্থান তল্লাশি, রাস্তায় পড্রপ্রতিবন্ধক স্থাপন এবং গণগ্রেপ্তারের পরও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ প্রকৃত দোষীদের সনাক্ত করতে পারেনি। অন্যদিকে, ব্রিটিশ নিরাপত্তা বাহিনীর এসকল কার্যক্রমের কারণে সাধারণ ইহুদি সমাজে ম্যান্ডেট সরকারের গ্রহণযোগ্যতা শূন্যের পর্যায়ে চলে যায়, যা ছিল ইরগুণের অন্যতম লক্ষ্য ।

সারা বিশ্বে এই ঘটনার প্রতিবাদের ঝড় উঠে। পশ্চিমা জগতে ইহুদিদের বিরুদ্ধে নাৎসি বীভৎসতার কারণে যে সহানুভূতির আবহ সৃস্টি হয়েছিল এই হামলায় নির্দোষ সাধারণ মানুষের হত্যাযজ্ঞের কারণে সেই সহানুভূতিতে ভাটা দেখা দেয়। অবস্থা বেগতিক দেখে ইহুদি রাজনৈতিক নেতৃত্ব তীব্র ভাষায় এই আক্রমণের নিন্দা জানায় হাগানা, ইরগুন, ও লেহী গঠিত ০০০ অকার্যকর করে দেওয়া হয় এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব ইরগুন ও লেহীর সাথে তাদের দূরত্ব সৃষ্টির

দৃশ্যমান কিছু পদক্ষেপ নেয়। যদিও পরবর্তীকালে এটা প্রমাণিত হয় যে হাগানা সদর থেকে লিখিত নির্দেশ পেয়েই ইরগুন কিং ডেভিড হোটেলে আক্রমণ চালিয়েছিল। অ্যাংলো আমেরিকান কমিটির অন্যতম সদস্য ব্রিটিশ লেবার পার্টির এম. পি. রিচার্ড ক্রসম্যানকে এই ঘটনার কিছুদিন পরে ইহুদি নেতা ও পরবর্তীতে ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট ড. খাইম ওয়াইজম্যান বলেছিলেন, 'আমি আমার এই ছেলেদের (ইরগুন) নিয়ে গর্বিত না হয়ে পারি না। এটা (কিং ডেভিড হোটেল) যদি একটা জার্মান সদর হত তাহলে তারা ভিকটোরিয়া ক্রস (যুদ্ধে বীরত্বের জন্য সর্বোচ্চ ব্রিটিশ সামরিক মেডেল)।

এই হামলা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ও ইহুদিদের মধ্যে সংগাত চরম পর্যায়ে পৌছে দেয়। ব্রিটিশ সেনা ও ইহুদি বেসামরিক ব্যক্তিদের সামাজিক মেলামেশা সীমিত হয়ে যায়। ব্রিটিশদের প্যালস্টাইন ম্যান্ডেট চালিয়ে যাওয়ার স্পৃহা কমিয়ে দেয় এবং তাদের প্যালেস্টাইন ত্যাগ ত্বরান্বিত করে। প্যালেস্টাইনে আসন্ন যুদ্ধের কথা সকলের মুখে মুখে আলোচিত হতে থাকে। জেরুজালেমের সামাজিক জীবনে যেন একটি অদৃশ্য পর্দা নেমে আসে। ইহুদিরা আসন্ন নির্বিচারে হত্যাকাণ্ডের গুজবে আতঙ্কিত দিন কাটাতে থাকে। জেরুজালেম থেকে বিট্রিশ বেসামরিক ব্যক্তিদের অপসারণ করা হয় নিরাপত্তার কারণে। ঘটনার দুই মাসের মধ্যে প্যালেস্টাইন ম্যান্ডেট সরকারের চিফ সেক্রেটারি স্যার জন শ'কে ত্রিনিদাদ ও টোব্যাগোর হাই কমিশনার পদে বদলি করা হয়। জনকে ত্রিনিদাদে পৌছা মাত্রই ইরগুন তাকে পত্র বোমা দিয়ে হত্যার চেষ্টা করে। তারা অক্টোবরে রোমে ব্রিটিশ দূতাবাসে আক্রমণ চালায়। একজন ইরগুন সন্ত্রাসীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার প্রতিশোধ হিসেবে ইরগুন ১ মার্চ ১৯৪৭ সালে জেরুজালেম গোল্ডস্মিথ অফিসার্স ক্লাব উড়িয়ে দেয়। এতে ১৩ জন নিহত এবং আহত হয় ১৮জন।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইরগুনের একটি প্রিয় কৌশল ছিল ব্রিটিশ অফিসারদের অপহরণ করে জিম্মি হিসেবে বন্দি রেখে বিভিন্ন দাবি আদায় করা। এই ধরনের প্রথম অপহরণের ঘটনা ঘটে ২৭ জানুয়ারি ১৯৪৫। তেলআবিব আদালত কক্ষ থেকে বিচারক উইন্ডহ্যামনকে অপহরণ করা হয়। ইহুদি বন্দিদের মুক্তির বিনিময়ে তাকে ফেরত দেওয়া হয়। একই বছর ১৮ জুন তেলআবিব অফিসার্স ক্লাব থেকে ৫জন ব্রিটিশ কর্মকর্তা ও রয়েল এয়ার ফোর্সের একজন এয়ারম্যাসকে অপহরণ করা হয়। অবৈধ অস্ত্র রাখার অভিযোগে কারাগারে বন্দি দুইজন ইহুদিকে মুক্ত করার বিনিময়ে চার দিন পর দু'জন অফিসারকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকিদের ছাড়া হয় দু'জন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত

ইরগুন সন্ত্রাসীর মৃত্যুদণ্ড শাস্তি কমিয়ে কারাদণ্ড দেওয়ার পরে। ১৬ জুন ১৯৪৭ এক জেলখানা ভেঙে বন্দিদের মুক্ত করার অপরাধে দুজন ইহুদি সন্ত্রাসীকে আদালত মৃত্যুদণ্ড দেয়। ১২ জুলাই ব্রিটিশ ফিল্ড সিকিউরিটির দুজন কর্মকর্তাকে অপহরণ করা হয়। দুই সপ্তাহ অনেক খোঁজাখুঁজির পর এই ২জন কর্মকর্তার কোনো হদিস পাওয়া গেল না। ২ জুলাই দুই ইহুদি বন্দির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার দুইদিন পর ৩১ জুলাই অপহৃত দুইজন কর্মকর্তাকে ইরগুন গাছে ঝুলিয়ে হত্যা করে। অফিসার দুজনকে যেখান থেকে অপহরণ করা হয়েছিল গিয়ে দেখা গেল গাছের চারদিকে মাইন পুঁতে রাখা । মৃতদেহের মধ্যেও 'বুবি ট্র্যাপ' ছিল। একটি মৃতদেহের দড়ি কেটে নামানোর পর মৃতদেহের ভিতরে ঢুকানো 'বুবি ট্র্যাপ' বিস্ফোরণ ঘটে। মৃতদেহ উদ্ধারকারী একজন ব্রিটিশ সৈন্য মারাত্মকভাবে আহত হয়।

২৮ জুন ১৯৪৭ ইরগুন হাইফার একটি রেস্টুরেন্টে আক্রমণ চালায়। হাইফার এস্টোরিয়া রেস্টুরেন্টে কতিপয় ব্রিটিশ আর্মি অফিসার নৈশভোজরত ছিলেন। দুজন ইহুদি সন্ত্রাসী রেস্টুরেন্টের বিপরীত দিকে অবস্থান নিয়ে সাবমেশিনগান নিয়ে শুরু করে রেস্টুরেন্টের ওপর গুলিবর্ষণ। ৯ম প্যারাসুট ডিভিশন ক্যাপ্টেন কিসানে তৎক্ষণাৎ নিহত এবং অন্য দুজন অফিসার আহত হন। অন্য অফিসাররা যারা আহত হননি তারা পাল্টা গুলি শুরু করলে ইহুদি সন্ত্রাসীরা পশ্চাদপ্রসারণ করে।

১০০জন ইহুদি যে পরিমাণ সন্ত্রাস না করে ১জন ইহুদি সেই পরিমাণ সন্ত্রাস করে।

ইহুদি রাষ্ট্র

যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের মদদে প্যালেস্টাইনে ইহুদি বাসভূমির ঠিকানার ভিত তৈরি হলেও এক পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্র ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়ে হঠাৎ করেই নীতি পরির্তন করে। এতে ইহুদি কূটনীতিকে সংকটে ফেলে দেয়। জুইশ এজেন্সি ও আমেরিকার জাইঅনবাদীরা খাইম ওয়াইজম্যানকে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে এই সংকট সমাধানের জন্য জরুরি অনুরোধ জানায়। যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ জনমত পক্ষে আনার ক্ষেত্রে খাইম ওয়াইজম্যানের বিকল্প ছিল না। ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের সাথে তার ব্যক্তিগত সুসম্পর্কের কারণে ব্রিটিশদের সহায়তার প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পদক্ষেপ ব্যাপক হারে ইহুদি অভিবাসন সম্ভব হয়েছিল। ইহুদিরা সেই রাষ্ট্র স্থাপনের দ্বারপ্রান্ত এসে যায়। এখন পরিস্থিতি বদলে যাবার আগেই সর্বোচ্চ কূটনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা যতটা সম্ভব ত্বরান্বিত করে অপরিবর্তনীয় বাস্তবতা সৃষ্টি করতে হবে। জাইঅনবাদীরা ব্রিটিশ ম্যান্ডেট অবসানের বাস্তবতাকে সামনে রেখে প্যালেস্টাইনে যে নীতি অনুসরণ করছিল তা খাইম ওয়াইজম্যানের ভাষায় চমৎকার ফুটে উঠেছে। প্যালেস্টাইনের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে 'আমার কাছে এটা পরিষ্কার ছিল যে পিছু হটা হবে মারাত্মক। আগের মতোই, এখন আমাদের একমাত্র সুযোগ হচ্ছে বাস্তবতা সৃস্টি করা, তা নিয়ে পৃথিবীর মুখোমুখি হওয়া এবং তার ওপর ভিত্তি করে নির্মাণ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।'

খাইম ওয়াইজম্যান প্রথমে ব্রিটেনের এবং যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাবানদের ওপর বেশি প্রভাব খাটাতে সক্ষম হয়েছিলো। মূলত তারই প্রয়াসে ১০০ বছর আগে ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ সরকার বালফো ঘোষণা করেছিল, যা ছিল প্যালেস্টাইনে ইহুদি বাসভূমি প্রতিষ্ঠার প্রতি কোনো বিশ্বশক্তির প্রথম আনুষ্ঠানিক অঙ্গীকার। প্রথম মহাযুদ্ধের পর লীগ অব নেশনস প্যালেস্টাইনের ইহুদিদের জন্য আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার জন্য ম্যান্ডেটরি কর্তৃপক্ষের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তাও ছিল যুদ্ধ-পরবর্তী শান্তি আলোচনায় ইহুদি প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে ওয়াইজম্যানের কূটনৈতিক দক্ষতার ফসল। ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘে 'প্যালেস্টাইন পার্টিশন প্ল্যান' অনুমোদনের পেছনেও ওয়াইজম্যানের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ ।

ওয়াইজম্যান প্রথমবার ১৯২১-১৯৩১ এবং দ্বিতীয়বার ১৯৩৫-১৯৪৬ সাল পর্যন্ত ওয়ার্ল্ড জাইঅনিস্ট অর্গানাইজেশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ওয়াইজম্যানের

ব্রিটিশঘেঁষা নীতি এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী আক্রমণের বিরোধিতা কারণে তিনি ওয়ার্ল্ড জাইঅনিস্ট অর্গানাইজেশনে কোনোঠাসা হয়ে পড়েছিলেন। ১৯৪৬ এর কংগ্রেসে অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি প্রেসিডেনেটর পদ হতে বাদ পড়েন এবং বেন গুরিয়নকে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

১৯৪৭ এর ২৯ নভেম্বর জাসিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্যালেস্টাইন পার্টিশন প্ল্যান অনুমোদিত হওয়ার পর ওয়াইজম্যান ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার দায়িত্ব সমাপ্ত হয়েছে ধারণা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে লন্ডনে কিছুদিন অবস্থানের পর প্যালেস্টাইনে তার প্রতিষ্ঠিত ওয়াইজম্যান ইনস্টিটিউটে বৈজ্ঞানিক গবেষণা কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৪৮ এর জানুয়ারি মাসের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদিরা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্যালেস্টাইন নীতি তথা প্রস্তাবিত ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতি তাদের নীতি পরিবর্তনের আভাস লক্ষ্য করতে থাকে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার বিশেষকওের প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান সন্দিহান হয়ে পড়েন যে প্যালেস্টাইনের জাইঅনবাদীরা আরব রাষ্ট্রসমূহের আক্রমণেরমুখে টিকে থাকতে পারবে না। এই পরিস্থিতিতে ওয়াইজম্যান যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তন করেন। যুক্তরাষ্ট্রে ফিরেই তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদি ও সকল ধর্মের প্রতি সমহানুভূতিশীল নেতাদের সাথে শলাপরমার্শ শুরু করেন। সিকিউরিটি কাউন্সিলের সদস্য এবং জাতিসংঘের সদস্যদের প্রতিনিধিদের সাথে প্যালেস্টাইনের পার্টিশন বিষয়ে জাতিসংঘের গৃহীত প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু তখনো সিকিউরিটি কাউন্সিলের বৈঠকে পার্টিশন প্ল্যানের সমর্থনে প্রস্তাব পাশ করা সম্ভব হয়নি। ৪৭ এর ১৮ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান প্যালেস্টাইন পার্টিশনের পক্ষে তার অবস্থানের কথা ওয়াইজম্যানকে জানিয়েছিলেন। ওয়াইজম্যান আমেরিকান প্রেসিডেন্টের এই কথায় আশ্বস্ত হতে পারেননি। তিনি মন্তব্য করেনে, 'যাই হোক আমি সন্দিহান তিনি ে জানেন কিনা স্টেট ডিপার্টমেন্ট তারই অধস্তনরা কি পরিমাণে তার নীতি ও উদ্দেশ্যকে বাধ্যগ্রস্ত করছে।'

তখন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি প্রশাসন ছিল খুবই দুর্বল। ঐ বছরই নভেম্বরে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সম্ভাব্য ফল সম্ভাব্য সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে, প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান পুনঃনির্বাচিত হবেন না। তাই রাষ্ট্রপতি ও স্টেট ডিপার্টমেন্টের মধ্যে অনেক বিষয়েই সমন্বয়হীনতা দেখা যাচ্ছিল। প্যালেস্টাইন বিষয়ে রাষ্ট্রপতি ও স্টেট ডির্পাটমেন্টের মতদ্বৈততা প্রকট হয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল। ১৯ মার্চ জাসিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি সিনেটর অস্টিন প্যালেস্টাইনে বিবদমান পক্ষের মধ্যে সাময়িক যুদ্ধ-বিরতি করা এবং ট্রাস্টিশিপ প্রস্তাব

অনুমোদনের জন্য জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন ডাকার প্রস্তাব করে যাতে ১৫ মে, ১৯৪৮ ব্রিটিশ ম্যান্ডেট অবসানের পূর্বেই অসি পরিষদের অধীনে প্যালেস্টাইনের নতুন সরকার গঠন সম্ভব হয়।

ওয়াইজম্যান যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনযন্ত্রকে পক্ষে আনতে না পারলেও ইহুদি নিয়ন্ত্রিত প্রচারমাধ্যমে এবং তার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের জনমত প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী পত্র-পত্রিকায় এটা ফলাও করে প্রচারিত হয়েছিল যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার প্যালেস্টাইনে যে ট্রাস্টিশিপ সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে তা বাস্তবায়ন করতে যুক্তরাষ্ট্রকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যুক্তারাষ্ট্রকে অন্তত তিন লক্ষ সেনা প্যালেস্টাইনে মোতায়েন করতে হবে। ২য় মহাযুদ্ধ-পরবর্তীকালে আমেরিকান জনগণের নিকট এই সম্ভাবনা মোটেই আকর্ষণীয় ছিল না।

শেষ পর্যন্ত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব অনুসারে প্যালেস্টাইন বিভাগের প্রস্তাব স্থগিত রেখে অন্তর্বর্তীকালের জন্য সমগ্র ম্যান্ডেট প্যালেস্টাইন ট্রাস্টিশিপ সরকার প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনি। ১৬ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র বিস্তারিত ট্রাস্টিশিপ প্রস্তাব সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পেশ করে। সাধারণ পরিষদ প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য ১ম কমিটিতে প্রেরণ করে। ২০ এপ্রিল হতে ১ম কমিটিতে প্রস্তাবটির ওপর বিতর্ক শুরু হয়। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের বক্তব্য হতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রস্তাবটি খুব সহজে অনুমোদিত হবে না। বিশেষকরে প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের সামরিক অগ্রগতি, লক্ষ লক্ষ আরবদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে শরণার্থী হওয়া এবং প্যালেস্টাইনের সার্বিক উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে জাতিসংঘের কো সদস্য রাষ্ট্র প্যালেস্টাইনে শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণে আগ্রহ দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় ট্রাস্টিশিপ প্রস্তাবের প্রতি প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় না। যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যেই সাধারণ পরিষদকে স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছিল যে, ১৫ মে যুক্তরাষ্ট্র প্যালেস্টাইনে শান্তিরক্ষায় কোনো ভূমিকাই পালন করবে না। এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, জাতিসংঘ ১৫ মে'র আগে কোনোক্রমেই ট্রাস্টিশিপ প্রস্তাবের ওপর কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে না। সিকিউরিটি কাউন্সিল ১ এপ্রিল, ১৭ এপ্রিল ও ২৩ এপ্রিল সাময়িক যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানায়। বিবাদমান কোনো পক্ষই যুদ্ধবিরতি' পালনের কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

ওযাইজম্যান ও জাতিসংঘে তাদের প্রতিনিধিদল নিশ্চিত হয়েছিল যে, জাতিসংঘের ২ নভেম্বর, ১৯৪৭ প্যালেস্টাইন বিভাগের প্রস্তাব রহিত হওয়ার

কোনো সম্ভাবনাই নেই। তারা প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ঘোষণার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলে এবং ১৫ মে'র পূর্বেই তা বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাই ইহুদি রাষ্ট্র ঘোষণার সাথে সাথেই যাতে যুক্তরাষ্ট্রসহ একাধিক বৃহৎ শক্তি ইহুদি রাষ্ট্রের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে স্বীকৃতি দেয় ওয়াইজম্যান সে বিয়টি নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র ঘোষণার সাথে সাথেই যেন তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় সেই অনুরোধ জানিয়ে ওয়াইজম্যান ১৩ মে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির নিকট পত্র প্রেরণ করেন। পত্রে উলেস্নখ করা হয় যে, ১৫ মে মধ্যরাতে প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ ম্যান্ডেট অবসানের সাথে সাথেই ইহুদি রাষ্ট্রের সরকার সীমানায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবে, রাষ্ট্রকে বহিঃশত্রুর আক্রমণকে রক্ষা করার সকল ব্যবস্থা করবে এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে বিশ্বের সকল দেশের প্রতি তার দাায়িত্ব পালন করবে। 'আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি যে আপনার নেতৃত্বে যে যুক্তরাষ্ট্র একটি ন্যায়সঙ্গত সমাধান বের করার জন্য এতো কিছু করেছে সেই যুক্তরাষ্ট্র নতুন ইহুদি রাষ্ট্রকে অতি দ্রুত স্বীকৃতি দান করবে। আমি মনে করি পৃথিবী এটাই যথাযথ মনে করবে যে সবচেয়ে মহৎ প্রাণবন্ত গণতান্ত্রিক দেশ সবচেয়ে নতুন (গণতান্ত্রিক) দেশকে সর্বপ্রথম জাতিসমূহের পরিবারে বরণ করে নেবে।' প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ওয়াইজম্যানের অনুরোধ রেখেছিলেন। তেলআবিবে ইহুদি রাষ্ট্র ঘোষণার ১১ মিনিটের মধ্যে ইসরায়েল রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র ।

ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ঘোষণা: প্যালেস্টাইনের অধিকাংশ ইহুদির কাছে ইহুদি রাষ্ট্রের শুরু হয়েছিল ২৯ নভেম্বর ১৯৪৭ যখন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ প্যালেস্টাইন বিভাগের প্রস্তাব অনুমোদন করে। এই প্রস্তাবের মাধ্যমে ইহুদি রাস্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বিশ্বের স্বীকৃতি লাব করে। ব্রিটিশদের ম্যান্ডেট অবসানের তারখি ঘোষণার ফলে ইহুদিদের নিকট এটা ছিল সময়ের ব্যাপার যে সাড়ে পাঁচ মাসের মধ্যে আইনগতভাবে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ব্রিটিশ ম্যান্ডেট কর্তৃপক্ষে ম্যান্ডেট অবসানের তারিখ ঘোষণার পর থেকে তাদের ১ লক্ষ সেনাকে নিরাপদে প্যালেস্টাইন থেকে প্রত্যাহারের জন্য যতটুকু রাস্ট্রীয় কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা প্রয়োজন শুধু তার মধ্যে সরকারের কার্যক্রম সীমিত রেখেছিল। ইহুদি রাষ্ট্রের জন্য নির্ধারিত এলাকায় রাষ্ট্রের সকল দায়িত্ব শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ সকল রাষ্ট্রীয় পরিষেবা জুইশ এজেন্সি দিয়ে আসছিল।

প্রস্তাবিত ইহুদ রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে ইহুদিদের ক্ষমতা সুসংহত করার উদ্দেশ্যে যা যা করণীয় তা সবই তারা করেছিলেন। কিন্তু প্যালেস্টাইন বিভাগের প্রশ্নে

যুক্তরাষ্ট্রের নীতির হঠাৎ করে 'উল্টো যাত্রা' তাদের নেতৃত্বকে বিচলিত করেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে পূর্ব-সিদ্ধান্ত অনুসারে যথাসময়ে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হবে কিনা সে বিষয়ে নেতৃত্বের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। প্যালেস্টাইন ম্যান্ডেটের শেষের দিকে ব্রিটিশদের ছেড়ে যাওয়া শূন্যতাকে পূরণের কাজ করার জন্য ৩৭ সদস্যের একটি গণপরিষদ গঠন করে। এই পরিষদে সকল দল ও মতের প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এটা ইহুদি রাষ্ট্রের অনানুষ্ঠানিক আইনসভার দায়িত্ব পালন করছিল। এছাড়া বেন গুরিয়নের নেতৃত্বে ১৩ সদ্যসের জাতীয় প্রশাসন গঠন করা হয়, যা কার্যত মন্ত্রিসভার দায়িত্ব পালন করেছিল। জাতীয় প্রতিরক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব এই প্রশাসনের ওপর ন্যস্ত করা হয় যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান চাপ উপেক্ষা করে জাতীয় প্রশাসন সৃষ্টি করে কার্যত ইহুদি রাষ্ট্র জন্ম লাভ করে।

১২ মে জাতীয় প্রশাসনের রাতব্যাপী সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২ দিন পর ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হবে কিনা তা নিয়ে দীর্ঘ বিতর্ক হয়। প্যালেস্টাইনের চলমান যুদ্ধের অবস্থা এবং ইহুদি রাষ্ট্র ঘোষণার পর আবর রাষ্ট্রসমূহের নিয়মিত বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করার কৌশল ও ক্ষমতা নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা উপক্ষো করে রাষ্ট্র ঘোষণা করার পরিণতি শিশু রাষ্ট্রের জন্য কী হতে পারে এটা নিয়েও বিস্তর বিতর্ক হয়। যথাসময়ে ইহুদি রাষ্ট্র ঘোষণা না করে হলে প্যালেস্টাইনে ইহুদি অধিবাসীদের ও যোদ্ধাদের মনোবলের ওপর নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হবে বলে যুক্তি তুলে ধরা হয়। এই সভা চলাকালে টেলিফোনে ওয়াইজম্যানের মতামত চাওয়া হলে ওয়াইজম্যান ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠেন, What are they waiting for. idiots? 'বোকারা কিসের জন্য অপেক্ষা করছে?' তিনি অবিলম্বে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে মতো জানান। সারা রাত আলোচনার পর জাতীয় প্রশাসন ৬ এবং ৪ ভোটে যুক্তরাষ্ট্রের সাময়িক যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

রাষ্ট্রের নাম কী হবে তা নিয়েও সর্বশেষে বিতর্ক হয়। নতুন রাষ্ট্রের নাম Eretz Israel' (ইসরায়েলের দেশ), 'জাইঅন', 'যুদা', 'জাইঅনা,' ইব্রিয়া', (ইব্রাহিমের দেশ) 'হার্জলিয়া' (হার্জেলের দেশ) নাম প্রস্তাব করা হয়। প্রথম চারটি নামের প্রস্তাব নাকচ করা হয় এই কারণে যে, এই নামগুলি ইহুদি রাষ্ট্রের বাস্তবতার সাতে সাম্যঞ্জস্যপূর্ণ নয়। Eretz Israel' এর 'ঐতিহাসিক ধারণাগত' সীমায় প্যালেস্টাইন, ট্র্যান্সজর্ডন, লেবানন, সিরিয়র অংশ অন্তর্ভুক্ত ছিল। অন্য নাম তিনটি সাধারণ জেরুজালেমের অপর নাম হিসেবে ব্যবহৃত

হয়ে থাকে। কিন্তু জেরুজালেমের ইহুদি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা নেই। সর্বশেষ, বেন গুরিয়ন রাষ্ট্রের নাম 'ইসরায়েল' প্রস্তাব করলে তা ভোটে গৃহীত হয়। ইহুদি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষণার মাত্র কয়েক মিনিট আগে রাষ্ট্রের নাম নির্ধারণ করা হয়। প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র ঘোষণার করা হবে ১৬ এই মর্মে ঘোষণা ছিল ওয়ার্ল্ড জাইঅনিস্ট অর্গনাইজেশনের। ম্যান্ডেট অবসানের পরের দিন এই ঘোষণা হওয়ার কথা ছিল। প্রকৃতপক্ষে ঘোষণা ওদয়ো হয়, ১৪ই মে বেলা ৪টার। প্যালেস্টাইনের ব্রিটিশ হাইকমিশনার ১৪ মে রাত ১২-০১ মিনিটে হাইফা বন্দর থেকে নোঙর তুলে প্যালেস্টাইন থেকে বিদায় নেন এবং এর সাথেই প্যালেস্টাইনে নব্রিটিশ ম্যান্ডেটের অবসান হয়। এর আট ঘণ্টা আগে ইসরায়েল রাষ্ট্রের ঘোষণা করা হয়। ইসরায়েল রাস্ট্র ঘোষণার তারিখ ও সময় গোপন রাখা হয়েছিল গোষণা অনুষ্ঠানের সিরাপত্তার স্বার্থে এবং শত্রুকে ধোঁকা দেয়ার জন্য। আরেকটি বড় কারণ ছিল, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের অতি উৎসাহের কারণে জাতিসংঘ প্রস্তাবিত রাস্ট্র ঘোষণা ব্যহত করার মতো কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগেই ইহুদি উঠেস্ট্রকে বাস্তব সত্য পরিণত করা।

ইহুদিধর্ম

যা ধারণ করা যায় তাহাই ধর্ম। আজ ধর্মের সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। পৃথিবীতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত বহুবিধ আচার-আচরণ, দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা, সামাজিক আচরণেরপ নীতিমালা, জীবন-বিধান, ন্যায়-অন্যায় বিধি, পবিত্রতা বিধান ইত্যাদির প্রতি আনুগত্যতাকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ধর্মতত্ত্ববিদ ও দার্শনিকগণ বিভিন্ন মাত্রা অবলম্বন করে ধর্মের সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করেছেন। তবে মানবজীবন এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আছে যা পুনঃপুন” ঘটনশীল, অটল এবং অসহনীয় যেগুলি মোকাবিলা করতে ধম, এবং বিশ্বাস আমাদের সাহায্য করে। কেন এবং কিভাবে জগতসংসার সৃষ্টি হয়েছে ধর্ম আমাদের কিছু ধারণা ও তত্ত্ব দিয়ে থাকে যা আমাদের মানসিক ধারণশক্তির সীমাবদ্ধতা উত্তরণের সহায়ক হয়। সংখ্যার দিক থেকে ইহুদি ধর্ম খুব ছোট ধর্ম।

‘আধুনিক প্রেক্ষাপটে ‘ইহুদি ধর্মকে’ একটি ধর্ম হিসেবে গণ্য করার বিষয়ে সনাতন ইহুদিগণের মধ্যে বেশ আপত্তি লক্ষণীয়। তারা মনে করেন, তাহলে ইহুদিধর্মের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। ইসলাম খ্রিস্ট অথবা বৌদ্ধধর্মের সাথে এক সারিতে একই শ্রেণীতে ইহুদিধর্মকে বিবেচনা করা তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

তৌরিদ অনুসারে, সকল ইসরায়েলিদের উপস্থিতিতে ঈশ্বর সাইনাই পর্বতে নিজের আবির্ভাব ঘটিয়ে মোশী এবং ইসরায়েলিদের সাথে ঈশ্বরের চুক্তি ঘোষণা করেছিলেন এবং এই চুক্তি নির্দিষ্টভাবে শুধু ইসরায়েলিদের ওপর প্রযোজ্য ছিল। তৌরিদ আকারে ঈশ্বর যে বিধান ঘোষহণা করেছিলেন তা পালন করা ও রক্ষা করা একমাত্র ইসরায়েলিদের দায়িত্ব। তাই এটা অনস্বীকার্য যে, ইহুদিধর্মে যে নির্দিষ্টতা রয়েছে তা এই ধর্মের অন্তস্থিত বিশ্বজনীনতাকে ঢেকে রেখেছে। ইহুদিধর্মের ইতিহাসে কোনো কোনো পর্যায়ে পুতুল-পূজারিদের মধ্য থেকে ধর্মান্তরের মাধ্যমে ইহুদি ধর্মে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত থাকলেও ইহুদিধর্ম সাধারণভাবে এর মধ্যে অনুপ্রবেশ প্রতিরোধের প্রবণতা সবসময় বজায় রেখেছে।

ইহুদি পণ্ডিতগণের মতে, কে অতীতের ঋষিগণ কখনোই একটা ধর্শ বলে মনে করতেন না। যেই অর্থে পৌত্তলিকতাকে ধর্ম হিসেবে গণ্য করা হত সেই অর্থে Judaism কে ধর্ম হিসেবে গণ্য করায় তাদের তীব্র বিরোধিতা ছিল। ইসরায়েলিদের সাথে ঈশ্বরের বিশেষ সম্পর্কের ভিত্তিতে Judaism হচ্ছে একে স্বয়ংসম্পূর্ণ জীনযাপন প্রণালী। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ইহুদি ধর্ম এবং

সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ইহজাগতিকতার মধ্যে কোনো পরস্পরবিরোধী দ্বি-বিভাজনত্ব ছিল না। ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় দুই হাজার বছর যাবৎ ইহুদিরা কোথাও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতোর অধিষ্টিত ছিল না, তাই আধুনিক প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহুদি ধর্মীয় বিধানের সাংঘর্ষিকতা পরীক্ষিত হয় নাই। আর ইহুদিরা পৃথিবীর যেখানেই বাস করুক না কেন, উনবিংশ শতাব্দীর শেভভাগ পর্যন্ত তারা তাদের পারিপার্শ্বিক সমাজ হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় স্বয়ংসম্পূর্ণ সামাজিত জীবনযাপন করত। তাই ধর্মীয় বিধান ও ইহজাগতিক বাস্তবতার সংঘর্ষ ইহুদি মননে প্রকট হয়ে ধরা পড়েনি, যা ইসরায়েল রাষ্ট্রে এখন দেখা দিয়েছে।

অনস্বীকার্য যে, বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ধর্মগুলির মধ্যে ইহুদি ধর্ম একেশ্বরবাদের প্রাচীনতম ধারক ও বাহক। অপর দুটি প্রধান একেশ্বরবাদী ধর্ম, যথা খ্রিস্টধর্ম ও ইসলাম ইহুদিধর্মের বহু ঐতিহ্যের অংশীদার। প্রকৃতপক্ষে খ্রিস্টধর্ম বিশ্বাস করে যে,ইহুদি বাইবেলের কতিপয় বিধান ঈশ্বরই বাতিল করে নব-বিধান বা New Testament বহাল করেছেন। তাসত্ত্বে ও ইহুদি বাইবেলকে খ্রিস্টানগণ এখনো ঈশ্বরপ্রদত্ত বলে বিশ্বাস করেন এবং তাদের ধর্মগ্রন্থ New Testament এর সম্পূরক বলে বিবেচনা করে। ইসলামি ঐতিহ্য অনুসারে অবশ্য বর্তমানে তৌরিদ বলে প্রচলিত গ্রন্থ ঈশ্বরপ্রদত্ত মূল তৌরিদ গ্রন্থনয়। এটা পরিবর্তন করে তৌরিদের মূল শিক্ষাকে বিকৃত করা হয়েছে। New Testament এর ক্ষেত্রেও ইসলাম অনুরূপ বিশ্বাস পোষণ করে। প্রকৃতপক্ষে ইহুদিধর্মের মূল আচার-পশু-পক্ষী বলিদান, অগ্নি-আহুতি, বিসর্জন, নৈবদ্য, ইত্যাদির প্রচলন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেছে। জেরুজালেমের মহাপবিত্র মন্দিরকেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠানের পরিবর্তে বিকেন্দ্রিত গণ-প্রার্থনা প্রবর্তিত হয়েছে। ঈশ্বরের সাথে ইসরায়েলিদের তথাকথিত চুক্তির মাধ্যমে পাওয়া বহু ধর্মীয় বিধান ইহুদিরা স্থগিত বা বাতিল করেছে।

ইহুদি ধর্মের কতকগুলি অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা হাজার বছর যাবৎ ইহুদিধর্মকে অন্যান্য ধর্ম থেকে পৃথক করে রেখেছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি ইহুদিধর্মকে শুধু নিজস্ব ভাবমূর্তি দেয়নি, হাজার বছর ধরে এর ইতিহাসের গতি নির্ধারণ করেছে, এই ধর্মের প্রতি বিভিন্ন ধর্ম, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের অধিকারী মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবিত করেছে। এই ধর্মের এমন কতকগুলি বৈশিস্ট্য আছে যা অ-ইহুদিগণকে এর থেকে দূরে রেখেছে। পশ্চিমা লেখক ও গণমাধ্যম ইহুদিধর্মকে অন্যতম মহান ধর্ম হিসেবে চিহ্নিত করে তাকে। কিন্তু এর অনুসারী সংখ্যা অথবা এর ভৌগোলিক ব্যাপ্তি কোনো বিবেচনায়ই ইহুদিধর্মকে একটি

মহান ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। সংখ্যার দিক দিয়ে এই ধর্ম বিশ্বের অন্যতম ক্ষুদ্র একটি ধর্ম। বহু উপজাতীয় প্রাচীন বিশ্বাসের অনুসারী অথবা ধর্মীয় উপগোষ্ঠীর অনুসারীরর সংখ্যা অনেক ক্ষেত্রেইএর চেয়ে বেশি।

ইহুদিরা মনে করে ইহুদিদের প্রথম পুরুষতান্ত্রিক প্রধান আব্রামকে (আব্রাহাম) ঈশ্বর প্রথম দেখা দিয়ে প্রথম নির্দেশ দিয়েছিলেন তার পিতা-পিতামহের দেশ ত্যাগ করে কানানদের দেশে (বর্তমানে ইসরায়েল রাষ্ট্র ও প্যালেস্টাইন) চলে যেতে। ঈশ্বর কানানদের বাসভূমি আব্রাহামের বংশধরগণকে চিরকালের জন্য তাদের বাসভূমি হিসেবে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ঈশ্বরের এই প্রতিশ্রুতি আংশিকভাবে বাস্তাব রূপ নিতে সময় লেগেছিল প্রায় ৬০০ বছর। এর মধ্যে আব্রাহাম ও তার অধস্তন দুই পুরুষ যাযাবর হিসেবে জীবন কাটিয়েছে। পরবর্তী ৪৩০ বছর আব্রাহামের বংশধরগণ বাস করেছে মিশরে এবং ৪০ বছর কাটিয়েছে জনহীন প্রান্তরে। আনুমানিক ৯২১ অব্দে রাজা সলোমানের মৃত্যুর পর ইসরাইলের রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে—উত্তরে ইসরায়েল রাজ্য ও দক্ষিণে জুডিয়া (যুদা) রাজ্য। এই দুই রাজ্যের মধ্যে ইসরায়েল রাজ্য আসিরিয়গণ দখল করে নেয় খ্রি. পূ. ৭৪০ অব্দে এবং জুডিয়া রাজ্যের পতন হ্য নেবুখাদনেজার বাহিনীর নিকট খ্রি. পূ. ৫৮৬ অব্দে। ঐ বছরই জেরুজালেমের প্রথম মহাপবিত্র মন্দির ধ্বংস করা হয়। ইতোমধ্যে খ্রি. পূ. ৫৯৭ অব্দে বিপুল সংখ্যক ইহুদিকে বন্দি করে বেবিলনে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ইহুদিদের বেবিলনীয় বন্দিত্ব শুরু হয়। প্যালেস্টাইনের একটি অংশে দু'টি ইহুদি রাজ্য ছিল ২৭০ বছর। খ্রি. পূ. ৫৮৬ অব্দে জুডিয়া রাজ্যের পতনের পর ৭০ খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেমের মন্দির দ্বিতীয়বার ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত কখনো জেরুজালেমকেন্দ্রিক একটি ক্ষুদ্র ইহুদি রাজ্যের উত্থান বা পতন হয়েছে কিন্তু কখনো তা কানান দেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজ্য হয়ে উঠেনি। আধুনিক ইসরালেয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় আড়াই হাজার বছর ইহুদিগণ মূলত নির্বাসন জীবন কাটিয়েছে এবং প্যালেস্টাইনের রাষ্ট্রীয় ক্ষশতা তাদের হাতে ছিল না। সমগ্র প্যালেস্টাইন অথবা বাইবেলীয় তথাকথিত ইসরায়েলের আবাসভূমি কখনো ইসরায়েলিদের অধীন ছিল না এবং এখনো নেই।

কানানীয়দের দেশে ইসরায়েলিদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে পন্থা বেছে নিয়েছিলো তা রীতিমত লোমহর্ষক। কানানীয়দের দেশের পথে জর্ডন নদীর পারে মিদিয়ান রাজাদের ইসরায়েলিরা পরাজিত করে তাদের শহরের সকল পুরুষদের হত্যা করে। তাদের শহরগুলি পুড়িয়ে দেয়, গবাদিপশু ও ধনসম্পদ লুট করে এবং মহিলা ও শিশুদের বন্দি করে ইসরায়েলিদের শিবিরে নিয়ে

আসে। কানানীয়দের দেশের যেসকল এলাকা ভবিষ্যত ইসরায়েল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সেসকল এলাকার শহরবাসীদের ভাগ্যের তুলনায় কোনোানীয় কুমারী মেয়েদের ভাগ্য অনেক ভাল ছিল। তারা অন্তত প্রাণে বেঁচে ছিল।

অন্যধর্মের প্রতি মনোভাব

অন্যধর্মের প্রতি ইহুদির মনোভাব সবসময়ই উন্নাসিকতাদুষ্ট। কখনো কখনো ধৃষ্টাতাপূর্ণ এবং অত্যন্ত নিষ্ঠুর। ঈশ্বরের সাথে তার বিশেষ সম্পর্ক, ঈশ্বরে বরপুত্র হিসেবে নিজদের তারা বিশেষ এক শ্রেণিভুক্ত গণ্য করে থাকে। একমাত্র ইহুদি মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেই সেই শ্রেণিভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব।

তারা মনে করে 'সকল বস্তুর প্রভুর আমরা প্রশংসা করি, সকল মহত্বের অধিকারী সৃষ্টিকর্তা, যিনি আমাদেরকে সকল দেশের সকল জাতি থেকে পৃথক করেছেন, পৃথিবীর অন্যসব পরিবারের মধ্যে আমাদের স্থাপিত করেননি। কারণ অন্যের ভাগ্যের সাথে আমাদের অংশীদার করেননি এবং আমাদের নিয়তি অন্য জনতার সাথে মিলিয়ে দেননি। কারণ তারা অহমিকা ও নিঃসারতার কাছে মাথা নত করে এবং যে দেবতা তাদের রক্ষা করতে পারে না তার কাছে তারা প্রার্থনা করে। অন্রদিকে, আমরা হাটু বাঁকা করি ও প্রণিপাত করি রাজা, রাজাধিরাজ পবিত্র সত্তা বরণ্যের প্রতি...শুধু মহাপ্রভু ব্যতীত অন্য কোরো প্রতি নয়। আমাদের রাজা সত্য, অন্য কেউ নয়।'

ইহুদিগণ নিজদের মধ্যে অ-ইহুদিকে নিন্দে করে যেসব সর্বনাম ব্যবহার করে তার মধ্যে 'gentile' শব্দটি সবচেয়ে ভদ্রসূচক। gentile শব্দটি Latin শব্দ মবহঃরষব থেকে উৎপত্তি হয়েছে। শব্দটির অর্থ হচ্ছে, pagan বা heathen। সহজ বাংলা কথায় পৌত্তলিক বা বিধর্মী। অ-ইহুদিগণকে gentile নামে আখ্যায়িত করা এতো প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে যে এখন সর্বনামটিকে খ্রিসটানগণ তেমন অপমানজনক মনে করেন। আরেকটি অবমাননাকর সর্বনাম যা ইহুদিগণ-অ-ইহুদি, বিশেষকরে খ্রিস্টানদের বর্ণনা করতে ব্যবহার করেন তা হচ্ছে Goi , বহু বচনে Goim । পৃথিবীতে বাস করে ইহুদি এবং Goim । সাধারণ অর্থে Goim হচ্ছে জাতি। Goi অর্থ মানুষ নয় তবে পশুও নয়। 'Ye are my flock, the flock of my pasture are men ইহুদিগণ মানুষ, অন্যরা Goim । তালমুদ অনুসারে, The seed if a Goi is worth the same of a beast' অর্থাৎ একজন Goi এর বীজ (বীর্য) একটি পশুর বীজের সমমূল্যের। 'The sexual intercourse of a Goi is like that of a beast.' 'একজন Goi এর যৌন সঙ্গম পশুর সঙ্গমের সমতুল।' অ-ইহুদি, বিশেষ করে খ্রিস্টানগণের ক্ষেত্রে আরেকটি যে সর্বনাম ব্যবহার করা হয় তা আরো মারাত্মক। সেটি হচ্ছে 'shektz' স্ত্রী লিঙ্গ shektz । এটি একটি Hebrew 00

যার অর্থ হচ্ছে 'abomination' বা নিদারুণ ঘৃণ্য বা বিভীষিকাজনক ব্যক্তি বা বস্তু। ইহুদি বাইবেলে shekt ব্যবহার করা হয়েছে kashrut অনুসারে অপরিচ্ছন্ন ও অপবিত্র পশু শুকর এর ক্ষেত্রে। অ-ইহুদিগণকে ইহুদিগণ কতটা তাচ্ছিল্য বা ঘৃনার চোখে দেখতে পারে এ থেকেই তা বুঝা যায়। 'The heathen or Goi, was not considered to be on the same moral or socip cultural level as the Jew, and he was to live an animal-like existence.' নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিধর্মী অথবা Goi -কে ইহুদিদের সমপর্যায়ের গণ্য করা হত না এবং সে পশুর পর্যায়েই জীবনযাপন করত বলে মনে করা হত।'

ইসলামধর্মের ব্যাপারে ইহুদি ধমতত্ত্ববিদদের বিরোধিতা ততটা কঠোর নয়। ইসলামের অনুসারীদের বিরুদ্ধে অন্তত পৌত্তলিকা ও বহু ঈশ্বরবাদের অভিযোগ তাদের নেই। ইসলাম পূর্ববর্তী কালে মক্কার কা'বা ঘর পৌত্তলিকতার আখড়ায় পরিণত হবার পূর্ব পর্যন্ত ইহুদিরা আব্রাহামের সম্মানে তার উত্তরাধিকার বঞ্চিত কিন্তু অশীর্বাদপুষ্ট জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাইলের জন্য প্রতিষ্ঠিত কাবাকে তাদের অন্যতম পবিত্র স্থান হিসেবেগণ্য করত।

পৌত্তলিকতা ও বহু-ঈশ্বরবাদ বর্জনের কারণে ইহুদি ধর্মতত্ত্ববিদগণ ইসলাম সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে নমনীয় মনোভাব পোষণ করে। তালমুদের বিধান অনুসারে, ইহুদিক কোনো পৌত্তলিক উপাসনালয় খ্রিস্টানদের গির্জাসহ অতিক্রমকালে মনে মনে এর আশু ধ্বংস কামনা করতে হয় এবং তার নিজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে, ঐ উপাসনালয়ের উদ্দেশ্য অন্তত তিনবার থু থু নিক্ষেপ করতে হয়। মুসলমানদের মসজিদের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য নয় বলে রাবাইগণ রায় দিয়েছে। ইহুদিদের দৈনন্দিন তিনবেলা গণ-প্রার্থনায় মূল প্রার্থনা Shemoneh Esrei এর একটি অংশ ধর্মত্যাগীগণ যারা পৌত্তলিকতা অর্থাৎ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করছে তাদের আশু ধ্বংস কামনা করে একটি প্রার্থনা খ্রি. ১ম শতাব্দী থেকে প্রচলন করা হয়। রাবাইগণ রায় দিয়েছেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী ইহুদিগণ এই অভিসম্পাতের আওতায় পড়ে না। আঙুর রসের মদের বোতলের ছিপি খোলা অবস্থায় কোনো পুতুল -পূজারির (সকল মতবাদের খ্রিস্টানসহ) হাতের ছোঁয়া লাগলে সেই মদ সম্পূর্ণটা ঢেলে ফেলে দিতে হবে, কিন্তু একজন ইসলাম অনুসারীরা ছোঁয়া লাগলে তা ইহুদি পান করতে পারবে না। তবে, তা ফেলে না দিয়ে বিক্রি করতে পারবে।

ইহুদি আইন ব্যবস্থায় (Halakhan) অ-ইহুদিকে কোনো পরিস্থিতিতেই মানুষ হিসেবে গণ্য করা হয় না। ইহুদি বিচারিক প্রক্রিয়াকোন অ-ইহুদির সাক্ষ্য

গ্রহণের সুযোগ নেই। কারণ, ধরে নেওয়া হয়েছে যে, অ-ইহুদিগণ জন্মগতভাবে মিথ্যাবাদী। সমস্যা সৃষ্টি হয় যখন কোনো ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য একমাত্র কোনো অ-ইহুদির সাক্ষ্যের ওপর রাবাই আদালতকে নির্ভর করতে হয়। ইহুদি ধর্মীয় আইন অনুসারে, একজন মহিলাকে তখনই বিধবা ঘোষণা করা যাবে এবং সে পুনরায় বিয়ে করতে পারবে, যদি একজন চাক্ষুষ সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে সে এই মহিলার স্বামীকে মারা যেতে দেখেছে অথবা মৃতদেহ সে সনাক্ত করেছে। সেই চাক্ষুষ সাক্ষী যদি অ-ইহুদি হয় তাহলে বিচারক সরাসরি তাকে জিজ্ঞাসা করে তথ্য দিতে পারবে না। কারণ ধরে নেওয়া হয় যে অ-ইহূদি মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে। অ-ইহুদিদের মধ্যে বিবাহের সম্পর্কে ইহুদি আইনে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। তাই ইহুদির সাথে অ-ইহুদির বিবাহ শুধু স্বীকৃতির অযোগ্যই নয় এটা মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ।

ইহুদি আইনে কোনো ইহুদিকে হত্যা করা মৃতুদণ্ডযোগ্য অপরাধ, কোনো ইহুদি যদি অন্য কোনো ইহুদির মৃত্যুর জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী হয় তাহলে আইন অনুসারে সে ঐশ্বরিক আইনে পাপী সাব্যস্ত হবে। এই জন্য তার শাস্তি ইশ্বর দেবেন, কোনো পার্থিব আদালতে তার শাস্তি হবে না। কোনো ইহুদি যাদি একজন অ-ইহুদিকে হত্যা করে তা হলে সে অজাগতিক আইনে পাপী সাব্যস্ত হবে এবং তার শাস্তি দিতে পারবে একমাত্র ঈশ্বর। সে যদি একজন অ-ইহুদির মৃত্যুর জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী হয় তাহলে তার কোনো পাপও হবে না।

বিবাহিত ইহুদি মহিলা তার স্বামী ব্যতীত অন্য কোনো পুরুষের সাথে যৌনসঙ্গম করলে উভয় পক্ষের জন্যই নিদিষ্ট শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু অ-ইহুদি মহিলাদের ক্ষেত্রে বিষয় অন্যরকম একজন অ-ইহুদি মহিলা বিবাহিতা কি অবিবাহিতা তা মোটেই বিবেচ্য বিষয় নয়, কারণ ইহুদিগণ বৈবাহিক সম্পর্ককে স্বীকৃতি দেয় না। তাই একজন ইহুদি পুরুষ ও অ-ইহুদি মহিলার মধ্যে ব্যভিচারের প্রশ্ন উঠে না। তারমুদ এই ধরনের যৌনসঙ্গমকে পশু গমনের পাপের সমতুল্য বলে গণ্য করে। উল্লেখ্য তৌরিদ প্রদত্ত বিধান অনুসারে, কোনো ইহুদি পুরুষ যদি পশুগমন করে তাহলে সংশ্লিষ্ট পশুটিকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে, আর ইহুদি অপরাধীকে বেত্রাঘাত করতে হবে।

তবে অবশ্য ধরে নেওয়া যাবে না যে, একজন ইহুদি পুরুষ ও একজন অ-ইহুদি মহিলার মধ্যে যৌনসম্পর্ক গ্রহণযোগ্য। তা নয়, তবে এই পরিস্থিতিতে মূল শাস্তি হবে মহিলার তাকে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। এমনকি যদি সেই মহিলা একজন ইহুদি পুরুষের ধর্ষণের শিকারও হয়। 'যদি কোনো ইহুদি অ-ইহুদি নারীর সাথে যৌনসঙ্গম করে সেই নারী তিন বছরের শিশু হোক বা

প্রাপ্তবয়স্কা হোক, বিবাহিতা হোক কি অবিবাহিতা, আর সে (ইহুদি পুরুষ) যদি নয় বছর একদিন বয়সের অপ্রাপ্তবয়স্কও হয়, সে যেহেতু ইচ্ছাকৃতভাবে তার (অ-ইহুদি নারী) সাথে সঙ্গম করেছে তাই তাকে (অ-ইহুদি নারী) অবশ্যই পশুর মতই হত্যা করতে হবে কারণ তার মাধ্যমে একজন ইহুদি ঝামেলা পড়েছে। ঐ ইহুদিকে অবশ্য বেত্রাঘাত করতেই হবে। সে যদি ইহুদি পুরোহিত সম্প্রদায়ভুক্ত হয় তাকে দ্বিগুণ বেত্রাঘাত করতে হবে। কারণ সে দ্বিগুণ অপরাধ করেছে। সকল অ-ইহুদি নারীকেই বেশ্যা হিসেবে ধরে নেওয়া হয়।' এখানে অপরাধ হলো, সে একই সাথে পশু গমন ও বেশ্যা গমনের অপরাধ করেছে। উল্লেখ্য বেশ্যাগমন সাধারণ ইহুদিদের জন্য অপরাধ নয়, কিন্তু একজন Kohen -এর জন্য শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

অ-ইহুদিগণকে উপহার দেওয়ার বিষয়ে ইহুদিদের ওপর তালমুদের নিষেধাজ্ঞা অত্যন্ত স্পষ্ট। অবশ্য মধ্যযুগীয় রাবাই কর্তৃপক্ষ এই নিষেধাজ্ঞা কিছুটা শিথিল করেছে। কারণ প্রাচীনকাল থেকে ব্যবসায়ীদের মধ্যে উপহার বিনিময় বহুল প্রচলিত প্রথায় পরিণত হয়েছে। এই ধরনের উপহার প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যতে প্রাপ্তির আশায় বিনিয়োগ বলে বিবেচিত হয় তাই ইহুদি ও অ-ইহুদিদের মধ্যে এই ধরনের উপহার বিনিময়কে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নিস্বার্থভাবে কোনো অ-ইহুদিকে উপহার দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ রয়েছে। ভিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে একই ধরনের বিধান রয়েছে। ইহুদি ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেওয়া সাধারণভাবে নিষিদ্ধ। তবে অ-ইহুদি ভিক্ষুককে ভিক্ষা না দিলে যদি ইহুদিদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে শান্তি রক্ষার খাতিরে তা দেওয়া যেতে পারে। তবে অ-ইহুদি দরিদ্রগণ যাতে ইহুদি ভিক্ষা পাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে না পরে সেদিকে সতর্ক থাকার জন্য রাবচাই কর্তৃপক্ষের বহু উপদেশ রয়েছে।

যদি কোনো ইহুদি সম্ভাব্য কোনো ইহুদির হারাসোর সম্পত্তি পায় তাহলে তার মালিক খুঁজে বের করার জন্য তাকে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ যেমন, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে মর্মে কঠিন নিদের্শ দেওয়া আছে। অপরদিকে, পাওয়া সম্পদের মালিক যদি অ-ইহুদি হয় সেই ক্ষেত্রে তালমুদ ও অন্যান্য রাবাই কর্তৃপক্ষের নির্দেশহল, পাওয়া সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে হবে এবং তা ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না। কোনো ইহুদিকে প্রতারণা করা মহাপাপ। অ-ইহুদিদের বেলায় সরাসরি প্রতারণা করা নিষেধ। যদি ইহুদির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে অ-ইহুদির সাথে পরোক্ষ প্রতারণায় অসুবিধা নেই। এই ধরনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে কেনা-বেচার হিসাব করার সময় যদি কোনো ইহুদি নিজেরপক্ষে ভুল করে তাহলে অপর পক্ষের ধর্মীয় কর্তব্য হচ্ছে সেই ভুল

ধরিয়ে দেওয়া এবং সঠিক হিসাব অনুসারে লেনদেন করা। কিন্তু অপর পক্ষ যদি অ-ইহুদি হয় তাহলে তার ভুল ধরিয়ে দেওয়া ইহুদির দায়িত্ব নয়। পাছে পরবর্তীকালে ক্ষতিগ্রস্ত অ-ইহুদি তার ভুল বুঝতে পেরে ইহুদির প্রতি মারমুখি হয় তাই এই পরিস্থিতিতে 'আপনার হিসাবের ওপরই আমি নির্ভর করছি' বলে লেনদেন সমাপ্ত করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। বেচা-কেনার ক্ষেত্রে কোনো ইহুদরি সাথে প্রবঞ্চনা করা মহাপাপ, কারণ তৌরিদে এটা কঠোরভাবে নিষেধ করা আছে। কিন্তু কোনো অ- ইহুদির ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য নয়। সহিংসতা ব্যতীত চুরি সকল ক্ষেত্রেই নিষিদ্ধ, এমনকি এর শিকার যদি অ-ইহুদিও হয়। কোনো ইহুদির ওপর ডাকাতি করা (সহিংস) সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু অ-ইহুদির ওপর সহিংস ডাকাতি করা যাবে কিনা তা নির্ভর করবে ডাকাতির শিকার অ-ইহুদি শাসনাধীন কিনা তার ওপর। তালমুদ অনুসারে, সেই অ-ইহুদি যদি ইহুদি শাসনাধীন হয় তাহলে ডাকাতি করা কোনো অপরাধ নয়। বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন রাবাই কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিতর্ক আছে। তবে বিতর্ক হচ্ছে ঠিক কি পরিস্থিতিতে অ-ইহুদিকে ডাকাতির শিকার করা যাবে তার খুটিনাটি বিষয় নিয়ে, বিশ্বজনীন বিচারের ধারণা এবং মানবিকতার বিবেচনায় এরূপ ডাকাতি কতটুকু অনুমোদনযোগ্য সেই বিষয় নিয়ে নয়।

ইহুদিদের স্বপ্ন

পৃথিবীর প্রধান প্রবীন ধর্মের অনুসারীদের ইহুদি ধর্মের এবং ইসরাইল রাষ্ট্রের কর্ণধার বিশ্ব জয়ের স্বপ্ন দেখে স্বপ্ন বাস্তবায়নে তারা সবকিছু করতে প্রস্তুত ইউএস ব্যুরো অব সেন্সাসের বিশ্ব জনসংখ্যা ঘড়ি অনুসারে, ২০১২ সালের ৯ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ সময় রাত ১১টা ৩৫ মিনিটে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল আনুমানিক ৭০৫ কোটি ৭৪ লক্ষ ৮৩ হাজার ৪৯৮ জন। এর মধ্যে ইহুদি জনসংখ্যা ১ কোটি ৪০ লক্ষ। গণনাকালে অনেকেই আবার নিজের ধর্ম পরিচয় ঘোষণা করতে চান না। ইহুদি জনসংখ্যা পৃথিবীর জনসংখ্যার. ২০ শতাংশ বা প্রতি হাজারে ২ জন। সেই তুলনায় পৃথিবীর মুসলমানের সংখ্যা ১৬০ কোটি।

সংখ্যার দিক থেকে ইহুদিরা পৃথিবীর অন্যতম ক্ষুদ্র ধর্মীয় গোষ্ঠী। কিন্তু ইতিহাস জুড়ে, বিশেষকরে মধ্যপ্রাচ্য ও পশ্চিমা বিশ্বের ইতিহাসে এই ধর্মের অনুসারীদের বিচিত্র ভূমিকায় উপস্থিতি কখনোই তাদের সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইউরোপ জুড়ে হিটলারের নেতৃত্বে ইহুদি নিধনযজ্ঞে পরিণত হয় যা ইতিহাসে 'হলোকস্ট' নামে পরিচিতি লাভ করে। হিটলারের পতনের পর ইহুদিগণ যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী ইহুদিগোষ্ঠী ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রত্যক্ষ সহায়তার অধিকাংশ আরব অধিবাসীদের বহিষ্কার করে প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাস্ট্র ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা করে। ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকালেও প্যালেস্টাইনে ইহুদি জনসংখ্যা প্যালেস্টাইনের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়ায়শ এবং এতদঞ্চলের আরব অধিবাসীদের সংখ্যার এক শতাংশেরও কম ছিল।

ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্ব রাজনৈতিক মঞ্চে ইহুদিদের উত্থান মধ্যপ্রাচ্য তথা ইসলামি জগতে এমন এক উত্তেজক উপাদান সৃষ্টি হয়েছে যা বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে অদ্যাবধি এই অঞ্চলের ভূ-রাজনীতি এবং বহু ক্ষেত্রে বহমান আধুনিক বিশ্বের প্রায় সকল ক্ষেত্র—জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্যি, দর্শন, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রশাসন, সমর-শক্তিতে ইহুদিদের অতুলনীয় অর্জনে। এই অর্জনকে দক্ষতার সাথে প্রয়োগ করে ইহুদিগণ বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে বিশ্বস্ত সহায়ক হিসেবে পাওয়া নিশ্চিত করতে পেরেছে। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে ইহুদিদের অবস্থানের জরিপ, সে যত ছোট আকারেই হোক, এবং সে অবস্থানের কার্যকরণের কিছু বিশ্লেষণ ব্যতীত বিশ্ব-মঞ্চে ইহুদিদের অতীত ও বর্তমান

অবস্থান সম্যক অনুধাবন করা কঠিন। এবং দিনকে দিন তা বেড়েই চলেছে।

১৯০১ সালে নোবেল পুরস্কার শুরু হওয়ার পর থেকে ১১২ বছরে মোট যে ৮৫০ জন এই বিরল সম্মান পেয়েছেন তার মধ্যে ১৭৭টি ইহুদি। নোবেলের ইতিহাসে মোট ৯ জন মুসলিম এই সম্মান পেয়েছেন, হিন্দু পেয়েছেন ৬ জন, খ্রিষ্টান পেয়েছেন ৬৩৭ জন এবং বৌদ্ধ অন্যান্যরা পেয়েছেন ২১ জন । জনসংখ্যা ও নোবেল প্রাপ্তির সংখ্যার তুলনা করা হলে ইহুদিরা মুসলিমদের ২২৪২ গুণ, হিন্দুদের ২০৯৪ গুণ, খ্রিস্টানদের ৫৬৫ গুণ বেশি নোবেল পুরস্কার পেয়েচেন। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে এযাবত যতজন নোবেল পুরস্কার যতজন নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তাদের ৪০ শতাংশই ইহুদি। যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদি জনসংখ্যা ইসরায়েল রাষ্ট্রের ইহুদি জনসংখ্যার চেয়ে বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যা ৩১.৫ কোটি। এর মধ্যে ইহুদির সংখ্যা আনুমানিক ৫৪ লক্ষ, যা যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার ১.৭ শতাংশ। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা ক্ষেত্রে ইহুদিদের অবস্থান ঈর্ষণীয়। 'ফোর্বষ' সাময়িকীর হিসাব অনুসারে, ২০১২ সালে আমেরিকার ৫০ জন সবচেয়ে ধনী মানুষের মধ্যে ২০ জন্য ইহুদি; । দেশের অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক বৃহত্তম আর্থিক ও ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের প্রায় একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ইহুদিদের হাতে। আরেকটি বিষয় হল ইহুদিরা সাধারণ সেসব প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হয়ে থাকেন যে প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ইহুদিদের হাতে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে ইহুদি নিয়ন্ত্রণ পরিমাপের তুলনায় গণমাধ্যমে ইহুদি নিয়ন্ত্রণ পরিমাপ করা তুলনামূলকভাবে সহজ। যুক্তরাষ্ট্রে রেডিও, টেলিভিশন সম্প্রচার, পত্র-পত্রিকা পরিচালনা ও প্রকাশনা, চলচ্চিত্র নির্মাণ, প্রযোজনা ও বিতরণ এবং প্রস্তক ও সাময়িকী প্রকাশনা সংস্থার সংখ্যা ও এসকল সংস্থার মালিকানা কাদের হাতে তা বের করা মোটেই কঠিন নয়। বলা হয়ে থাকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রচার ও গণ-বিনোদনের মাদ্যমে পাঁচটি বড় কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এই কোম্পানিগুলো হল ওয়াল্ট ডিজনি কোম্পানি, টাইম ওয়ার্নার কর্পোরেশন, (ভিডিও এন্ড অডিও কমিউনিকেশনস) কর্পোরেশন, নিউজ কর্পোরেশন, সনি কর্পোরেশন অব আমেরিকা। ওয়াল্ট ডিজনি কর্পোরশনের পরিধি সর্ববৃহৎ। এই কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হচ্ছেন রবার্ট এ, আইগার। ইনি একজন ইহুদি। এই পদে তার পূর্বসূরী ছিলেন মাইকল আইজনার। তিনিও ছিলেন ইহুদি। এই কর্পোরেশনের অধীন রয়েছে আমেরিকান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি (এবিসি)। এবিসি এর ৭টি নিজস্ব টেলিভিশন স্টেশন ও ২২৫টি এফিলিয়েট।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইহুদিরা যখন যুক্তরাষ্ট্রের বড় অর্থনৈতিক গোষ্ঠী হিসেবে আবিভূর্ত হয় তখন থেকেই প্রচারমাধ্যমের ওপর ইহুদিদের কর্তৃত্ব বাড়তে থাকে। যে সকল পত্র পত্রিকা প্রথমত-অ ইহুদিরা শুরু করেছিল সেগুলো ক্রয়ের মাধ্যমে ইহুদিরা তাদের নিয়ন্ত্রণের আওতা বাড়াতে থাকে। রেডিও-টেলিভিশনের ক্ষেত্রেও একই প্রক্রিয়া চলে। প্রচারমাধ্যমে অ-ইহুদিদের উপস্থিতি কমতে থাকে। মূলত ইহুদি নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা ও রেডিও-টেলিভিশন নেটওয়ার্ক ঠিক করে কোনোটি খবর ও কোনোটি খবর নয়। অন্যরা তা অনুসরণ করে। যারা ইহুদি লাইনের বাইরে অথবা তার বিপরীতে খবর বা মতামত প্রকাশ করতে উৎসাহ দেখায় তারা যেন বেশি দিন টিকে থাকতে না পারে সে ব্যবস্থা করে ইহুদি ব্যবসায়ীরা, যারা বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ করে। জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে দূরবর্তী ক্ষুদ্র কমিউনিটি পর্যায়ে খবর-মাধ্যমে একই নিয়ন্ত্রণ কাজ করে। রিপোর্টিং, পরিবেশনা ও মতামত প্রকাশে ইহুদি সংবেদনশীলতার দিকে খেয়াল রাখতে বাধ্য থাকে। ছোট ছোট পত্রিকাগুলোর তাদের শহর বা কমিউনিটির বাইরে খবর সংগ্রহের সংগঠন বা আর্থিক সামর্থ থাকে না। তারা বাস্তব কারণে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খবরের জন্য বৃহৎ পত্রিকা কোম্পানি ও নিউজ এজেন্সির ওপর নির্ভর করে। তাই তারা নামে 'স্বাধীন' হলেও কার্যত ইহুদি নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা কোম্পানির লাইন অনুসরণ করে।

যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদি অভিবাসন ষোড়শ শতাব্দীতে শুরু হয়েছিল। নকিন্তু এই দেশটির রাজনীতিতে ইহুদিদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে যখন ব্রিটিশ সরকার প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয় তখনই ইহুদিরা সিদ্ধান্ত নেয় যে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও সেটাকে টিকিয়ে রাখতে হলে যে কোনো উপায়েই হোক তাদের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের জোরালো সমর্থন আদায় করতে হবে এবং সেই সমর্থন অব্যাহত রাখা নিশ্চিত করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের দুটি ক্ষেত্রে ইহুদিদের প্রাধান্য খুবই দৃশ্যমান। প্রথমটি হচ্ছে গণমাধ্যম ও দ্বিতীয়টি রাজনীতি। এই দুটি ক্ষেত্রে ইহুদিদের প্রাধান্য আপাতদৃষ্টিতে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য নাগরিকদের যতটা উৎকণ্ঠার কারণ তার চেয়ে বেশি উৎকণ্ঠার কারণ পৃথিবীর অন্যান্য দেশ বিশেষকরে মুসলিম দেশগুলোর জন্য। মধ্যপ্রাচ্যের তথা মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েলের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক সবসময় একটি অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। ইসরায়েলের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ সম্পর্ক ইসরায়েলকে তার প্রতিবেশী আরব দেশগুলোর

সাথে দুঃসাহসী আচরণে প্ররোচিত করে। বিশ্ব জনতম উপেক্ষা করে প্যালেস্টাইনিদের মৌলিক অধিকার যথেচ্ছ লঙ্ঘন করতে সামান্যতম দ্বিধা অনুভব করে না। আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘের প্রস্তাব লঙ্ঘন করে অধিকৃত প্যালেস্টাইনে যেখানে সেখানে ইহুদি বসতি স্থাপন করে যাচ্ছে এবং তা থামানের কার্যকর কোনো আন্তর্জাতিক উদ্যোগ নেই। যখন তখন যে কোনো মুসলিম দেশের ওপর আগ্রাসন চালাতে ইসরায়েলকে অগ্র-পশ্চাত ভাবতে হয় না। ১৯৮১ সালে বাগদাদের কাছে ইরাকের ওসিরাক পারমাণবিক চুল্লি চালু করার পূর্বেই ইসরায়েল তা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছিল এক রাতে বিমান হামলা চালিয়ে। এই হামলা চালাতে আরো দুটি আরব রাষ্ট্র—জর্ডান ও সৌদি আরবের আকাশসীমা লঙ্ঘন করা হয়েছিল। একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের ওপর এমন হামলা ও অপর দুটি রাষ্ট্রের আকাশসীমা লঙ্ঘন করার অপরাধে জাতিসংঘ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নিতে পারেনি যুক্তরাষ্ট্রের ভেটোর কারণে। এই কিছুদিন আগে ইসরায়েল সুদানের একটি গোলা-বারুদ কারখানায় বিমান হামলা চালিয়ে ধ্বংস করেছে। সুদানের সাথে ইসরায়েলের যুদ্ধাবস্থা নেই। ইহুদি নিয়ন্ত্রিত তথা আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যম এটা নিয়ে কোনো হৈ-হুল্লোড় করেনি। আন্তর্জাতিক সমাজ এটা ধরে নিয়েছে আরব দেশগুলোর সাথে ইসরায়েল এ আচরণই করবে। ইরানের পারমাণবিক স্থাপনা ইসরায়েল ধ্বংস করে দেবে এটাই স্বাভাবিক। আন্তর্জাতিক আইনে এর বৈধতা কতটুকু আছে তা দেখার কোনো প্রয়োজন নেই। ইসরায়েল পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভার গড়ে তুলেছে এটা নিয়ে বিশ্ব প্রচারমাধ্যমে কোনো হৈ চৈ নেই। রাশিয়া, চীন, উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক অস্ত্র ও আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের মুখে আমেরিকানরা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারলেও ইরানের কাল্পনিক পারমাণবিক অস্ত্র যুক্তরাষ্ট্রের জীবন-মরণ হুমকি সৃষ্টি করবে এমন অদ্ভুত ধারণা ইহুদি নিয়ন্ত্রিত প্রচারমাধ্যম অধিকাংশ আমেরিকানদের মনে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে।

অনেকেই মনে করেন, বিশ্বে ইহুদিদের উত্থান স্বাভাবিক সামাজিক বিবর্তনের ফল নয়। বিশ্ব নিয়ন্ত্রণে ইহুদিদের গভীর ষড়যন্ত্রের ফসল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দশকে একটা রহস্যময় পরিবেশে নামে একটি দলিল প্রথমে সীমিত আকারে ও পরে প্রকাশ্যে বই আকারে প্রচারিত হয়। বইটিতে সমগ্র পৃথিবীতে ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কথিত নীলনক্সা প্রণয়নের জন্য জাইঅনবাদী (বিশ্ব ইহুদিবাদী) নেতাদের গোপন বৈঠকগুলোর কার্যবিবরণী হিসেবে প্রকাশ করা হয়। বইটিতে বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বিশ্ব সরকার প্রতিষ্ঠার যে কৌশল

অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে অ-ইহুদি সমাজে ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটানো, অর্থনীতি ও গণমাধ্যমে ইহুদি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা, বিশ্ব অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করা, সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মাধ্যমে সামাজিক যোগসূত্রকে ছিন্ন-ভিন্ন করে ইহুদি মসীহ্ এর নেতৃত্বে বিশ্বা সরকার গঠনের পথ সুগম করা ইত্যাদি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইউরোপ ও আমেরিকার ইহুদিবিরোধী মনোভাব সৃষ্টিতে বইটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। হিটলার এই বইটিকে ইহুদি ষড়যন্ত্রের প্রধান হিসেবে তুলে ধরে জার্মানদের মধ্যে ইহুদিবিরোধী মনোভাব সৃস্টি করতে সফল হয়েছিলেন। অবশ্য বইটি যে সম্পূর্ণ ভুয়া, জালিয়াতি ও ইহুদিবিরোধীদের ষড়যন্ত্রের ফলস এটা প্রমাণিত হয়েছে।

বিশ্ব নিয়ন্ত্রণে ইহুদি মহা পরিকল্পনা থাকুক কি না থাকুক বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের গতিধারা-প্রথমে মহাযুদ্ধের আগে বিশ্ব-বাণিজ্য ব্যবস্থার অরাজকতা, প্রথম মহাযুদ্ধ, প্রথম মহাযুদ্ধের পর লীগ অব ন্যাশনস প্রতিষ্ঠা, বিশ্ব, মহামন্দা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফর প্রতিষ্ঠা, ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েলের প্রতিষ্ঠা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, নাফটা ওয়ার্লড ট্রেড অর্গানাইজেনশনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন— সচেতন বা অবচেতন 'প্রটোকল-এর মহা পরিকল্পনার' পথে পৃথিবীতে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ও বিশ্ব অর্থ ব্যবস্থার ওপর ইহুদি প্রভাব, ,যুক্তরাষ্ট্রের তথা বিশ্ব গণমাধ্যমে ইহুদি আধিপত্য এবং বিশ্ব জনতম সৃষ্টিতে তার অভিঘাত এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করে যে বিশ্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ইহুদি মাত্রা কোনো পরিমাপেই অবহেলার বিষয় নয়। তারা যে কোনো উপায়ে শ্রেষ্ঠত্বে পরিণত হতে চায়।

জেরুজালেম

আধুনিক জেরুজালেম শহরের অভ্যন্তরে অবস্থিত ০.৯ বর্গ কিমি. (০.৩৫ বর্গ মাইল) আয়তন বিশিষ্ট দেয়ালঘেরা অঞ্চল। ১৮৬০ সালে মিশকেনট শানানিম নামক ইহুদি বসতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এই অঞ্চলটি নিয়েই জেরুজালেম শহর গঠিত ছিল। পুরনো শহরটি ধর্মীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু স্থানের অবস্থানস্থল, যেমন মুসলিমদের কাছে ডোম অব দ্য রক ও আল-আকসা মসজিদ, ইহুদিদের কাছে টেম্পল মাউন্ট ও পশ্চিম দেয়াল এবং খ্রিষ্টানদের কাছে চার্চ অব দ্য হলি সেপালচার গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে পরিগণিত হয়। ১৯৮১ সালে এই অঞ্চলটি ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়।

প্রথাগতভাবে পুরনো শহরটি চারটি অসমান অংশে বিভক্ত। তবে বর্তমান অবস্থাটি ১৯ শতক থেকে চালু হয়েছে। বর্তমানে শহরটি মোটামোটিভাবে মুসলিম মহল্লা, খ্রিষ্টান মহল্লা, ইহুদি মহল্লা ও আর্মেনীয় মহল্লা নামক ভাগে বিভক্ত। ১৯৪৮ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর পুরনো শহরটি জর্ডান কর্তৃক অধিকৃত হয় এবং এর ইহুদি বাসিন্দাদের উচ্ছেদ করা হয়। ১৯৬৭ সালে ছয়দিনের যুদ্ধে টেম্পল মাউন্টের উপর দুপক্ষের মধ্যে হাতাহাতি লড়াই হয়। এসময় ইসরায়েল পূর্ব জেরুজালেমের বাকি অংশসহ পুরনো শহর দখল করে নেয় এবং পশ্চিম অংশের সাথে একীভূত করে পুরো এলাকাকে ইসরায়েলের অন্তর্গত করে নেয়া হয়। এখনো এ এলাকাটি ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে এবং তারা একে ইসরায়েলের জাতীয় রাজধানী হিসেবে বিবেচনা করে। ২০১০ সালে জেরুজালেমের সর্ব প্রাচীন লেখার নমুনা পুরনো শহরের দেয়ালের বাইরে পাওয়া যায়। ১৯৮০ সালের জেরুজালেম আইন নামক আইন যেটিতে পূর্ব জেরুজালেমকে কার্যকরভাবে ইসরায়েলের অংশ ঘোষণা করা হয় তা জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ প্রস্তাব ৪৭৮ দ্বারা বাতিল ঘোষণা করা হয়। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় পূর্ব জেরুজালেমকে অধীকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চলের অংশ হিসেবে গণ্য করে।

[বাইবেল অনুযায়ী, খ্রিষ্টপূর্ব ১১শ শতকে রাজা দাউদের (দাউদ আঃ) জেরুজালেম জয়ের পূর্বে শহরটি জেবুসিয়দের বাসস্থান ছিল। বাইবেলের বর্ণনা মতে এই শহর মজবুত নগর প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। রাজা দাউদ কর্তৃক শাসিত শহর যেটি দাউদের শহর বলে পরিচিত তা পুরনো শহরের দেয়ালের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। তাঁর পুত্র রাজা সুলায়মানের (সুলাইমান

আঃ) শহরের দেয়াল সম্প্রসারিত করেন। ৪৪০ খ্রিষ্টপূর্বের দিকে পারস্য আমলে নেহেমিয়া ব্যবিলন থেকে ফিরে আসেন ও এর পুনর্নির্মাণ করেন। ৪১-৪৪ খ্রিষ্টাব্দে জুডিয়ার রাজা আগ্রিপ্পা "তৃতীয় দেয়াল" নামক নতুন নগর প্রাচীর নির্মাণ করেন।

৭ম শতকে (৬৩৭ সালে) খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাবের শাসনামলে মুসলিমরা জেরুজালেম জয় করে। খলিফা উমর একে মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তিনি শহরের বাসিন্দাদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চুক্তিবদ্ধ হন। জেরুজালেম অবরোধের পর সফ্রোনিয়াস খলিফা উমরকে স্বাগতম জানান। কারণ জেরুজালেমের চার্চের কাছে পরিচিত বাইবেলের একটি ভবিষ্যতবাণীতে "একজন দরিদ্র কিন্তু ন্যায়পরায়ণ ও শক্তিশালী ব্যক্তি" জেরুজালেমের খ্রিষ্টানদের রক্ষক ও মিত্র হিসেবে আবির্ভূত হবেন এমন উল্লেখ ছিল। সফ্রোনিয়াস বিশ্বাস করতেন যে সাদাসিধে জীবনযাপনকারী বীর যোদ্ধা উমর এই ভবিষ্যতবাণীকে পূর্ণ করেছেন। আলেক্সান্দ্রিয়ার পেট্রিয়ার্ক ইউটিকিয়াসের লেখা, উমর চার্চ অব দ্য হলি সেপালচার পরিদর্শন করেন ও উঠোনে বসেন। নামাজের সময় হলে তিনি চার্চের বাইরে গিয়ে নামাজ আদায় করেন যাতে পরবর্তীতে কেউ তার নামাজের কারণকে ব্যবহার করে পরবর্তীকালে কেউ এই চার্চকে মসজিদে রূপান্তর না করে। তিনি এও উল্লেখ করেন যে উমর একটি আদেশনামা লিখে তা পেট্রিয়ার্ককে হস্তান্তর করে। এতে উক্ত স্থানে মুসলিমদের প্রার্থনা করতে নিষেধ করা হয় বলে ইউটিকিয়াস উল্লেখ করেন। ১০৯৯ সালে প্রথম ক্রুসেডের সময় ইউরোপীয় খ্রিষ্টান সেনাবাহিনী জেরুজালেম দখল করে এবং ১১৮৭ সালের ২ অক্টোবর সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী কর্তৃক তা বিজিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এতে তাদের কর্তৃত্ব বহাল ছিল। তিনি ইহুদিদেরকে শহরে বসবাসের অনুমতি দেন। ১২১৯ সালে দামেস্কের সুলতান মুয়াজ্জিম নগরের দেয়াল ধ্বংস করেন। ১২৪৩ সালে মিশরের সাথে চুক্তি অনুযায়ী জেরুজালেম জার্মানির দ্বিতীয় ফ্রেডেরিখের হস্তগত হয়। ১২৩৯ সালে তিনি দেয়াল পুনর্নিমাণ করেন। কিন্তু কেরাকের আমির দাউদ সেগুলোকে ধ্বংস করে দেন। ১২৪৩ সালে জেরুজালেম পুনরায় খ্রিষ্টানদের দখলে আসে এবং দেয়ালগুলো সংস্কার করা হয়। ১২৪৪ সালে খোয়ারিজমিয় তাতাররা শহরটি দখল করে এবং সুলতান মালিক আল-মুয়াত্তাম নগর প্রাচীর ভেঙে ফেলেন। ফলে শহর আবার প্রতিরক্ষাহীন হয়ে পড়ে এবং শহরের মর্যাদা হুমকির মুখে পড়ে।

বর্তমান দেয়ালগুলো ১৫৩৮ সালে উসমানীয় সাম্রাজ্যের সুলতান প্রথম

সুলাইমান কর্তৃক নির্মিত হয়। দেয়ালগুলো প্রায় ৪.৫ কিমি. (২.৮ মাইল) দীর্ঘ ও ৫ থেকে ১৫ মিটার (১৬ থেকে ৪৯ ফুট) পর্যন্ত উঁচু এবং ৩ মিটার (১০ ফুট) পুরু)। সব মিলিয়ে পুরনো শহরে মোট ৪৩টি প্রহরা টাওয়ার ও ১১ টি গেট আছে। এদের মধ্যে সাতটি বর্তমানে উন্মুক্ত। শহর ভূখণ্ডটির দৈর্ঘ ১৫০ মাইল ও প্রস্ত ১০০ মাইল। ভূমধ্যসাগর ও জর্ডান নদীর দক্ষিণ-পূর্ব কোনে এর অবস্থান। শীত, গ্রীষ্ম ও বসন্তের আমেজ তীব্রভাবে অনুভূত হয়। খ্রিস্টপূর্ব ৫ হাজার বছর আগে এখানে মানুষের বাস ছিল। জেরুজালেমকে বলা হয়ে থাকে পৃথিবীর সবচেয়ে বর্ণাঢ্য নগরী। পুরনো শহরটিকে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে তালিকাভুক্ত করার জন্য ১৯৮০ সালে জর্ডান প্রস্তাব করে। ১৯৮১ সালে এটিকে তালিকাভুক্ত করা হয়।

মুসলিম মহল্লাঃ মুসলিম মহল্লা হল চারটি মহল্লার মধ্যে সর্ববৃহৎ ও সবচেয়ে জনবহুল অংশ। এটি উত্তর পূর্ব কোণে অবস্থিত। পূর্বে সিংহ দরজা থেকে শুরু করে টেম্পল মাউন্টের উত্তর দেয়াল নিয়ে পশ্চিমে দামেস্ক পর্যন্ত এটি বিস্তৃত। ২০০৫ সালে এখানে ২২,০০০ জন বসবাস করত। অন্য তিনটি মহল্লার মত মুসলিম মহল্লাতেও ১৯২৯ এর দাঙ্গার আগ পর্যন্ত মুসলিমদের পাশাপাশি ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা বসবাস করত। বর্তমানে ৬০ টি ইহুদি পরিবার এখানে বসবাস করে এবং এখানে কয়েকটি ইয়েশিভা রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান হল আটেরেট কোহানিম।

খ্রিষ্টান মহল্লাঃ শহরের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। এটি উত্তরে নতুন গেট থেকে শুরু করে পুরনো শহরের পশ্চিম দেয়াল নিয়ে জাফা গেট সহ দক্ষিণে বিস্তৃত। এর সাথে ইহুদি ও আর্মেনীয় মহল্লার সীমানা রয়েছে। পূর্বে দামেস্ক গেটে মুসলিম মহল্লার সাথে এর সীমানা রয়েছে। এই মহল্লায় খ্রিষ্টানদের পবিত্রতম স্থান চার্চ অব দ্য হলি সেপালচার অবস্থিত।

আর্মেনীয় মহল্লাঃ চারটি অংশের মধ্যে ক্ষুদ্রতম। আর্মেনীয়রাও ধর্মে খ্রিষ্টান হলেও এটি খ্রিষ্টান মহল্লা থেকে আলাদা। ক্ষুদ্র আকৃতি ও জনসংখ্যা সত্ত্বেও এই অংশে আর্মেনীয় ও তাদের পেট্রিয়ার্কেট স্বাধীনভাবে অবস্থান করছে এবং শহরে সবল অবস্থান ধরে রেখেছে। বর্তমানে ৩,০০০ এরও বেশি আর্মেনীয় জেরুজালেমে বসবাস করে যাদের মধ্যে ৫০০ জন আর্মেনীয় মহল্লায় থাকে। ১৯৭৫ সালে আর্মেনীয় মহল্লায় একটি ধর্মতাত্ত্বিক সেমিনারি স্থাপিত হয়। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর ইসরায়েলী সরকার যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত চার্চ বা যেকোনো ধর্মীয় স্থাপনা সংস্কারের জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়।

ইহুদি মহল্লাঃ শহরের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। এটি দক্ষিণে জায়ন গেট থেকে পশ্চিমে আর্মেনীয় মহল্লা নিয়ে উত্তরে কারডো এবং পূর্বে পশ্চিম দেয়াল ও টেম্পল মাউন্ট পর্যন্ত বিস্তৃত। এই মহল্লার সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতক থেকে এখানে ইহুদিরা ধারাবাহিকভাবে বসবাস করে আসছে। ১৯৪৮ সালে ২,০০০ ইহুদিকে অবরোধ করা হয় এবং সবাইকে স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। মহল্লাটি সম্পূর্ণরূপে অধীকৃত হয় ও এর প্রাচীন সিনাগগগুলো ধ্বংস করা হয়।

১৯৬৭ সালে ছয়দিনের যুদ্ধে ইসরায়েলী ছত্রীসেনারা দখল করার আগ পর্যন্ত এটি জর্ডানের অধিকারে ছিল। কয়েকদিন পর পশ্চিম দেয়ালে প্রবেশের রাস্তা উন্মুক্ত করতে ইসরায়েলী কর্তৃপক্ষ পার্শ্ববর্তী মরক্কোন মহল্লা ধ্বংস করে ফেলার আদেশ দেয়। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যাওয়া ইহুদি মহল্লা পুনরায় নির্মাণ করা হয়। এখানে বর্তমানে ২,৩৪৮ জন বাস করে (২০০৪ সালের হিসাবমতে) এবং বহু বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখানে গড়ে উঠেছে। পুনর্নিমাণের আগে এখানে যত্নসহকারে খননকার্য চালানো হয়। হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতাত্ত্বিক নাহমান আভিগাদ এই কাজের তত্ত্বাবধান করেন। প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ জাদুঘর ও বাইরের পার্কে প্রদর্শন করা হয়। এজন্য পর্যটকদেরকে বর্তমান শহরের দুই বা তিন তলা পর্যন্ত নিচে নামতে হয়। এই মহল্লায় "কারাইটেস স্ট্রিট" রয়েছে। এখানে প্রাচীন আনান বেন ডেভিড কেনেসা অবস্থিত। পুরনো শহরে একটি ক্ষুদ্র মরোক্কান মহল্লাও ছিল। ছয় দিনের যুদ্ধ শেষ হওয়ার এক সপ্তাহ পর পশ্চিম দেয়ালে দর্শনার্থীদের বেশি সুবিধা দেয়ার জন্য এটি ধ্বংস করে ফেলা হয়। যে অংশটি ধ্বংস করা হয়নি সেটি বর্তমানে ইহুদি মহল্লার অংশ হিসেবে রয়েছে। এরপর থেকে অমুসলিমরা মাগরিবি ব্রিজ দিয়ে টেম্পল মাউন্টে যেতে পারে। এটি অমুসলিমদের জন্য একমাত্র প্রবেশ পথ।

ক্রুসেডার রাজ্য জেরুজালেমের সময় জেরুজালেমের পুরনো শহরে চারটি ফটোক ছিল। এদের প্রত্যেকটি একেক পাশে অবস্থিত ছিল। বর্তমানে অবস্থিত দেয়ালগুলো প্রথম সুলায়মান কর্তৃক নির্মিত হয় ও এর ফটক সংখ্যা এগারোটি। তবে সাতটি উন্মুক্ত রয়েছে। ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত ফটকগুলো সূর্যাস্তের আগে বন্ধ করে দেয়া হত ও সূর্যোদয়ের সময় বন্ধ করে দেয়া হত। নিম্নোক্ত চার্ট অনুযায়ী ফটকগুলো বিভিন্ন নামে পরিচিত। বিভিন্ন ঐতিহাসিক সময়কালে ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাধ্যমে নামগুলো চালু হয়

মোসাদ বিশ্বের ভয়ঙ্করতম গোয়েন্দা সংস্থা। ইসরাইলি এই সংস্থাটির দুঃসাহসিক অভিযান নিয়েই এই বই।

ইসরাইল নামক দেশটিকে যারা বিশ্ব মানচিত্র থেকে মুছে দিতে চেয়েছিলো, *মোসাদ* সে-রকম ৮/১০টি দেশকে কি নিষ্ঠুরভাবে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত করেছে তার বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে *মোসাদ* বই-এ।

ইরানের পারমাণবিক কেন্দ্র ধ্বংস, মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের সর্বত্র বিরোধ উস্কে দেয়া, তথ্যপ্রচারসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে মোসাদ অনৈতিক এবং নিষ্ঠুরতম প্রক্রিয়া গ্রহণ করে।

রাজনীতির ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক উভয় বলয়ের পরামর্শক হিসেবে কাজ করে *মোসাদ*।

মোসাদ তার দেশ ও পশ্চিমা স্বার্থে তাদের ভাষায় কথিত সন্ত্রাসী, বিপ্লবী, বিজ্ঞানী, রাষ্ট্রনায়ক, সরকার প্রধানদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। কখনো সরাসরি গুলি করে, কখনো বিষ প্রয়োগে, কখনো বা নারী লেলিয়ে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে। আর এ-সব হত্যাকাণ্ডের নির্দেশদাতা ইসরাইল সরকারের প্রধান।

ইন্টেলিজেন্স যুদ্ধকে *মোসাদ* এত 'উচ্চমার্গে' নিয়ে গেছে যে, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর লক্ষ লক্ষ সদস্য এবং গোয়েন্দাভিত্তিক কাহিনীর কোটি অনুরক্তকে তা মুগ্ধ না করে পারবে না।



আবিষ্কার
Quality Publication

MOSSAD 2
KAIKOBAD MILAN

Price : Tk. 390.00i or $ 20.00
Cover Design : A.M. Shipon
Printed in Bangladesh

ISBN : 978-984-92982-1-2

